স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী

শিলচর
১৩৬০

উৎসর্গ পত্র।



গ্রন্থলেখকের

প্রত্যক্ষদেবতা—পরমারাধ্যতম পিতৃদেব—

পরলোকগত,

কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

এবং

পরম পূজ্যপাদ—পিতৃপ্রতিম শ্বশুর—

পরলোকগত,

রাসমোহন হালদার

মহাপুরুষদ্বয়ের

উদ্দেশে

এই নগণ্য গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট

হইল।

'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক', 'প্রবন্ধ-রত্ন', 'রত্ন-হার', 'গোপীচন্দ্র', 'চিন্ময়ী', 'সাঁঝের কথা', 'দুর্ব্বা', 'ভারত-কথা', 'বনের কথা', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'প্রবন্ধ-মুকুল', 'রতন-পাঠ', 'অক্ষয়-সুধা', 'মোহন-সুধা', 'সাগর-সুধা', প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও সম্পাদক

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়

লিখিত

ভূমিকা।

বঙ্গের অন্যতম জাতীয় কবি, সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরে, ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে, সুকবি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে আমার অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশিত করিয়াছি। সেই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছিলাম, বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার প্রথমাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

'বর্ত্তমান বঙ্গের কবি-কানন হইতে একটি কলকণ্ঠ বিহগ উড়িয়া গেল। বিষাদময় জীবনের দুঃখ-কাহিনী, আমরণ মর্ম্মন্তুদ ভাষায় মর্ম্ম-ভেদী সুরে গাহিয়া গাহিয়া অবসন্ন দেহে অনাঘ্রাত ও অনাদৃত ভাবে, আমাদের এই গায়ক পক্ষীটি কোথায় লুটাইয়া পড়িল! আমাদের পল্লী-জীবনের আত্মকথা, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, হিংসা-দ্বেষ-কলুষিত গার্হস্থ্য-জীবন, বিয়োগবিধুর পল্লীবাসীর হৃদগত ভাব, মহিলার প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম—ইত্যাদি আমাদের প্রত্যেক পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ-গাথা, দগ্ধ ও নিষ্পেষিতের আর্ত্তসুরে উচ্চকণ্ঠে ঊর্দ্ধমুখে গাহিয়া গাহিয়া, আমাদের সহানুভূতি

উদ্রিক্ত করিতে করিতে এবং পরে দূরান্তর্স্থিত পল্লীজীবনের নিরাশ্রয়তার ভাব জাগাইতে জাগাইতে, কোথায় হটাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল !

'বাল্য জীবনে যে সুর কণ্ঠ হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল, সেই সুর মানব-জীবনে সম্ভাব্য যাবতীয় উত্থান পতন, অনাচার অত্যাচার, দ্বেষ হিংসার মধ্য দিয়াও সমভাবে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া—শতাব্দীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাল আমাদের কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত করিয়া—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিগত আশ্বিন মাসে চিরতরে নীরব হইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের অভাবে, বঙ্গীয় কবি-কাননের এক অংশ পরিশূন্য হইল। আমাদের দুরদৃষ্ট, কবির জীবিতকালে আমরা তাঁহার প্রতি প্রায় একেবারেই অনবহিত ছিলাম—তাঁহার জীবনান্তেও কি তাঁহার তিল-কাঞ্চনের ব্যবস্থা হইবে না ?—তাঁহার স্মৃতি উদ্দেশে, তাহার চিতা-ভস্মের উপর মঠ রচনা ত দূরের কথা' !

মাত্র পাঁচ বৎসর হইল, গোবিন্দচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। আজ, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কবির জীবনী ও কাব্যের সমালোচনা, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন—ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ যে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, কবি গোবিন্দ-চন্দ্রের জীবনী লিখিবার প্রকৃষ্ট অধিকারী ব্যক্তি। ঘটনাচক্রে—গ্রন্থ-কারের ও বঙ্গের পাঠক পাঠিকাগণের সৌভাগ্যবশতঃ হেমবাবু, কবি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পরিচয়, ক্রমে ঘনিষ্টতায় পরিণত হইয়াছিল। আমি নিজে হেমবাবুকে বিশেষভাবেই জানি—বন্ধুতাক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন পন্থী লোক। অর্থাৎ, একালের কেবল মৌখিক বা সভাসমিতির আলাপ-

পরিচয় বা প্রশংসাদিতে তাহার সাধ পূর্ণ হয় না—তিনি যাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে সেকালের গ্রাম্যভাবে আপনার করিয়া লইতে চাহেন। নিজের ভাতের থালার অর্দ্ধেক অংশ বন্ধুর মুখে তুলিয়া দিতে না পারিলে, তাঁহার আশা পূর্ণ হয় না। হেমবাবুর চরিত্রের এই বিশিষ্টতাটুকু আমি নিজে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ, তাহাও এই ভাবের অনুরাগ। হেমবাবু নিজে ধনী নহেন—আমাদেরই মত একজন সাধারণ 'শ্রমজীবী' মাত্র। তিনি সুদীর্ঘকাল সুদূর ব্রহ্মসীমান্ত হইতে, কবি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পত্রাদি ব্যবহার করিয়াছেন,—সুবিধামত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন—কবির জীবনের যাবতীয় সংগ্রাম, কবি-হৃদয়ের সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য—নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। এই কারণেই বলিতেছি—তিনি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী লিখিবার উপযুক্ত অধিকারী।

এই প্রকারের অধিকারী পুরুষ, বর্ত্তমান যুগে নিতান্তই দুর্লভ। এখনকার দিনে, মানুষের বাহ্য জীবন ও আন্তজীবন বা সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন—এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যাইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে, নামজাদা লোকের সহিত, পরিচিত হইবার সুযোগ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য ও প্রসার (Complexity) ইহার কারণ। সুতরাং, জীবন-চরিত লেখাও, ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

হেমবাবুর এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে, আমি কিছুই বলিব না—দরকার হইলে অন্য কোন সময়ে বলিব। বর্ত্তমান ভূমিকায় আমার বলিবার প্রধান কথা এই যে, সুপ্রসিদ্ধ জীবন-চরিতাখ্যায়ক বসওয়েল্, যেমন জনসন্‌কে, তাঁহার উপাস্য-দেবতা (Hero) করিয়া জনসনের জীবন-

চরিত লিখিবার জন্য অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সুদীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই গ্রন্থের লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও, সুদীর্ঘকাল কবি গোবিন্দচন্দ্রকে বুঝিবার জন্য এবং প্রয়োজন হইলে, সাধারণের নিকট তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য, যথারীতি সাধনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি যে সাধনার ফল ও তপস্যার ধন, তাহা আমি অসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক জীবন-চরিত—বরাতি-রচনা। এই সমুদয় গ্রন্থের লেখকগণ প্রায়ই মনীষী ব্যক্তি। সুতরাং, ঐ সমুদয় গ্রন্থে অনেক বড় বড় তত্ত্ব-কথা, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও উপন্যাসিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, জীবন-চরিত হিসাবে ঐ সমুদয় গ্রন্থের স্থান মোটেই উচ্চ নহে। কারণ, ঐ সমুদয় গ্রন্থে অনেকস্থলেই, আসল মানুষটি হারাইয়া যায়। লেখকের সহিত যাঁহার জীবনী, তাঁহার সহিত ভালরূপ ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকায়, এইরূপ হইয়া থাকে। বড় বড় তত্ত্বের মধ্য দিয়া, ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই মানবতার যুগে, প্রথম আবশ্যক—মানুষকে তাহার ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও জয়-পরাজয়ের মধ্যে দেখা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই গ্রন্থ, কবি গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ। কবি গোবিন্দচন্দ্রকে বাঙ্গালী জাতি, যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর, এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নানাদিক্ হইতে নানারূপ আলোচনা হইবে। সেই আলোচনার ফলে, আমরা ক্রমশঃ গোবিন্দচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য-সাধনাকে যথার্থরূপে আমাদের আপনার করিয়া লইতে পারিব।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে, কবির ব্যক্তিত্ব লইয়া আলোচনা ছিল না। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে, বহু কবির কবিতা সংগৃহীত

হইয়াছে এবং রসতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিধানের অনুবর্ত্তনে, কবিতাগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিশেষ কবিকে, ধরিবার ও দেখিবার উপায় নাই। এখন সাহিত্যে, সমাজে ও মানব-জীবনে যে যুগ চলিতেছে, তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। মানুষ, মানুষকে বুঝিতে চাহে—ইহাই এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। গোবিন্দচন্দ্র কবি—কিন্তু প্রথমে আমরা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে চাই। তাঁহার কাব্য-সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর, তাঁহার কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশ, তাঁহার কবি-হৃদয়ের বিভিন্নমুখী গতি প্রভৃতি আমরাও 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের সাহিত্য-সভা সমূহে যদি বৎসর বৎসর গোবিন্দদাসের স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়, বঙ্গের কাব্য-সমালোচকগণ ও কাব্য-রসবিদ্‌গণ যদি গোবিন্দচন্দ্রের রচনার প্রতি মনোযোগী হন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যে ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা ক্রমেই অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইব। কিন্তু কবির পরলোকগমনের অল্পদিন পরে, এই শ্রেণীর একখানি জীবন-চরিত গ্রন্থ, কবিকে ভালরূপে জানিতেন এবং পূর্ব্ব হইতে নিঃস্বার্থভাবে বিশুদ্ধ অনুরাগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন—এই প্রকারের কোন অনুরক্ত লেখক কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রচারিত না হইলে, আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনা বিশেষরূপ অসুবিধাজনক হইত।

লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এই গ্রন্থখানি রচনা ও প্রচারিত করিয়া, বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মানুষ মাত্রেরই জীবন, একটি দুরধিগম্য রহস্য! একজন লোকে, কোন মানুষের জীবন সম্বন্ধে, সব কথা বলিতে পারে না। আমরা প্রকৃতই বহুরূপী। কাজেই, যাঁহাদের জীবনের ঘটনা আমাদের বলিবার বিষয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি লোক যদি, নিজ নিজ মন্তব্য ও ধারণা

প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে ভবিষ্য-যুগের উপকার হয় এবং মানব জাতির জ্ঞানোন্নতিরও সাহায্য হইয়া থাকে। হেমবাবু যাহা জানেন এবং যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন। এখনও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পর, তাঁহারা যদি নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান গ্রন্থকারেরও উপকার—আমাদেরও সকলেরই উপকার হয়।

এই ভূমিকার উপসংহারে, একটি কথা বিশেষভাবে হৃদয়মধ্যে জাগরিত হইয়া আমাকে ব্যথিত করিতেছে। 'নব্যভারতে'র সম্পাদক, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থের ভূমিকা তাঁহার দ্বারা লেখাইয়া লইলে ঠিক হইত। আমি নিজে, হেমবাবুর সহিত কবি গোবিন্দচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা অনেকদিন হইতেই জানি। আর, গোবিন্দচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে না জানিলেও, তাঁহার স্বচ্ছ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন কবিতাগুলি নিয়মিতভাবে উপভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখও যতদূর সম্ভব, দূরে বসিয়া জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে নর-পূজার অভাব নাই—ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু এই পূজায় নিষ্কামতা কতখানি, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। কেবল নিষ্কামতা নহে, নিরপেক্ষতা কতখানি, তাহাও দেখিতে হইবে। গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন—তাঁহার কোন প্রতিপত্তিশালী উত্তরাধিকারী বা আত্মীয় নাই। সুতরাং, তাঁহার স্মৃতি-সভাই বা কে করে—আর উপযুক্ত লোকের দ্বারা জীবন-চরিত লেখার ব্যবস্থাই বা করে কে? তিনি দরিদ্র ছিলেন—অন্নাভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া

বেড়াইয়াছেন। তাহার উপর, নিতান্ত 'গ্রাম্য' লোক ছিলেন। সুতবাং, ভবিষ্যতে জীবন-চরিত লিখিতে হইবে বলিয়া যে তাহার উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সযত্নে রাখিয়া যান নাই, তাহা সুনিশ্চিত সত্য।" এই অবস্থায় কবির মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে, হেমবাবুর ন্যায় একজন দরিদ্র ব্যক্তি, দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন এবং নিজের অবস্থার অতীত অর্থব্যয় করিয়া, এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, ইহা বড় কম কথা নহে! আবার, ভূমিকা লিখিবার জন্য, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির শরণাগত হওয়া—ইহাও তাঁহাব অতি দুঃসাহসের পরিচয়!

আমি তাঁহার নিরপেক্ষতা ও নিষ্কামতার প্রশংসা করিতেছি—আশা করি, বঙ্গীয় পাঠকগণ এই গ্রন্থখানিকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা কাববেন।

রতন লাইব্রেরী—বীরভূম
ঝুলন-পূর্ণিমা, ৯ই ভাদ্র, ১৩৩০

শ্রীশিবরতন মিত্র

অবতরণিকা।

সে আজ বহু বৎসরের কথা। ১৩০৯ সনের চৈত্র মাসে একদা আমরা স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি তখন সবেমাত্র চাকরি-জীবনের শৃঙ্খল বিমুক্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীতে অপরিজ্ঞাত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

বসন্ত কাল,—বেলা দ্বিপ্রহর। রৌদ্রের তীব্র তেজে চারিদিক সন্তপ্ত। থাকিয়া থাকিয়া পদ্মার স্নিগ্ধ সলিল-সম্পৃক্ত বসন্ত সমীরণ, নিতান্ত পরমাত্মীয়ের মত, রবি-কর-ক্লিষ্ট গ্রামখানিকে ব্যজন করিতেছিল।

কবির পল্লীভবন তখন নিস্তব্ধ;—কেবল নিকটস্থ আম্রবনের অভ্যন্তর হইতে, বসন্তের সহচর একটি কোকিলের অমৃত বর্ষণে, দিগন্ত প্লাবিত হইতেছিল।

কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের এক প্রান্তে, একখানি তক্তপোষের উপর সুদীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিয়া, বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছিলেন। সেই শুভদিন আমাদের নিকট চিরস্মরণীয়,—বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। কলকণ্ঠ কোকিল কবিটি তাঁহার স্বভাব-মধুর অমিয়স্বরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। সে কি ভুলিবার? এখনো, সেদিনের কথায় প্রাণের ভিতর বেদনা জাগিয়া উঠে।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের পর হইতে, তাঁহার বিচিত্র জীবনের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়।

ইহার প্রায় সাত বৎসর পর, ব্রহ্মদেশের সীমান্তে,—নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে, একদা যখন সেনা-বিভাগের একটি দুর্গে অবস্থান করিতেছিলাম,

তখন কবির একখানি ক্ষুদ্র জীবনী-প্রবন্ধ রচনা করি। ১৩১৬ সনের চৈত্র সংখ্যা "মানসী"তে তাহা প্রকাশিত হয়।

ইতঃপূর্ব্বে কবির জীবনী অথবা কাব্য প্রসঙ্গে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। তার পর ১৩১৮ সনের আশ্বিন সংখ্যা "বীরভূমি" পত্রিকায়, গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যালোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখি। এবং সে সময় হইতেই ধীরে ধীরে কবি জীবনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিস্তৃত জীবনী রচনা করিতে আরম্ভ করি।

১৩১৯ সনের প্রথম ভাগে আমরা ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, একদা, ঢাকার উকীল এবং সাহিত্যিক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল, মহাশয়কে আমাদের রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি সময়ের অভাব সত্বেও দয়াগুণে দুইটি পরিচ্ছেদের কতক অংশ সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া, পাণ্ডুলিপিটি ফিরাইয়া দেন।

ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া, ঘটনাক্রমে বীরভূম নিবাসী সাহিত্যিক, শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে কবির জীবনী সম্বন্ধে পত্রালাপ হয়। ১৩২২ সনে ব্রহ্মদেশ হইতে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, মিত্র মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। তিনি তাহার কতক অংশ, ১৩২৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা "বীরভূমি" পত্রিকায় পত্রস্থ করেন।

১৩২২ সনে "নব্যভারত" সম্পাদক, পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়কেও জীবনী গ্রন্থখানি দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের চতুর্থ প্রবন্ধ ১৩২৪ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "সৌরভে" প্রকাশিত হয়। কবি তখন জীবিত।

তাহার জীবদ্দশায়, জীবন-কথাটি কোন সাময়িক পত্রে অথবা একেবারে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া "সৌরভ" সম্পাদক, শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে ময়মনসিংহ হইতে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,

"কোন কবি বা লেখকের জীবিত কালে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা আমি পছন্দ করি না। আপনি গোবিন্দবাবু সম্বন্ধে খুব সংগ্রহ করিতে থাকুন, এবং সময়ে তাঁহার একখানা কাব্যময় জীবনী লিখুন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

আবার ১৩২১ সনের ২৪শে ফাল্গুন লিখিলেন,—"কবিবরের জীবনী প্রকাশে আমার আপত্তি আছে। * * * জীবিত ব্যক্তির জীবনী প্রকাশ করা কখনই উচিত নহে বলিয়া মনে করি। * * * আমি তাঁহার একজন ভক্ত বন্ধু স্বরূপই ইহা ভাল মনে করি না, এবং আপনাকেও প্রকাশ করিতে উপদেশ দেই না।"

এইভাবে "সৌরভ" সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে নিরস্ত করেন; এবং তাঁহারই পরামর্শে, জীবনীখানি এতদিন অমুদ্রিত ছিল।

তারপর ১৩২৫ সনের ১৩ই আশ্বিন অকস্মাৎ কবি গোবিন্দচন্দ্র নবজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহার তিরোধানের পর, ১৩২৪ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "নব্যভারত" এবং পৌষ সংখ্যা "সৌরভ" পত্রিকায় যথাক্রমে দুইটি প্রবন্ধ লিখি। সৌরভের প্রবন্ধ ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

বর্ত্তমান গ্রন্থ, ১৩০৯ সনের সঙ্কল্পিত আকাঙ্ক্ষার পরিণতি।

এই গ্রন্থ রচনা করিতে কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কবি-জীবনের কতক কতক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম। চিঠি পত্র দ্বারা আমাদিগকে তাঁহারা যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা

অপরিশোধনীয়। এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদেব নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ—সেরপুর, ময়মনসিংহ।
,, উমাচরণ সরকার—ময়মনসিংহ—কেশববাবুর কুঠী।
,, মহেন্দ্রলোচন দত্ত—ময়মনসিংহ রাজকাছারী।
,, ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়—বেগুণবাড়ী, ময়মনসিংহ।

এতদ্ব্যতীত, "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র; "সৌরভ" সম্পাদক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার; কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী; গৌরীপুর নিবাসী সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য; ভূতপূর্ব্ব "বীরভূমি" প্রকাশক খিদিরপুর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র পাল মহাশয়গণ আমাদিগকে প্রভূত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারাও আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র। তন্মধ্যে, আমাদের অগ্রজোপম, হিতৈষী বান্ধব শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছি।

এক্ষণে, স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবনী পাঠে যদি কাহারও তৃপ্তিলাভ হয়, তবেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বড়তলা
২৪ পরগণা
১লা বৈশাখ ১৩২৯

গ্রন্থকার।

স্বভাব-কবি

গোবিন্দদাস।

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

—*Gray.*

সূচনা।

এ যুগের বঙ্গ সাহিত্য, কবিতার বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহু অপরিণত বয়স্ক যুবক, কবি-যশঃপ্রার্থী। ইহাদের এই দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষার ফলে, বঙ্গ সাহিত্যে অতি উৎকট কবিতামালার সৃষ্টি হইতেছে। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ সকল তরুণ কবির অর্থহীন কবিতা, অনেক শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রেও প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু, একদিকে যেমন তথা কথিত উদীয়মান কবিকুলের উৎকট ঝঙ্কারে সাহিত্য-কুঞ্জ মুখরিত, তেমনি অন্যদিকে বহুতর খাটি কবির জীবনী বা পরিচয়, আজিও বঙ্গ-সাহিত্যে অপরিজ্ঞাত।

যাঁহারা মৃত, তাঁহাদের অনেকেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছেন। আবার, কেহ কেহ মেঘাবৃত শারদ চন্দ্রমার ন্যায়, অপ্রকাশ ও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছেন। আশ্চর্য্য!

এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে রাজকৃষ্ণ

ন্যায়, বিহারীলাল এবং ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরচিত কয়েকখানি অমূল্য কাব্যরত্ন, বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। পর-লোকগত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসও ইঁহাদের অন্যতম। তিনিও একজন প্রতিভাশালী সুকবি ছিলেন। অথচ ইঁহারা অপরিজ্ঞাত ও উপেক্ষিত কেন ?—একথার উত্তর কে দিবে ?

কিন্তু, কালের নিরপেক্ষ বিচারে একদিন একথার মীমাংসা হইবে' যে সময়, আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা দেখিবে যে, এই সকল দুর্লভ কবির প্রতি আমরা কি অনাদরই না করিয়াছি! ইহা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক-কাহিনীর একটি মর্ম্মস্পর্শী নিদর্শন।

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কাব্য ও কবির জীবনী-আলোচনা অপরি-হার্য্য। এই বিংশশতাব্দীর নব জাগরণের দিনে, বঙ্গ-সাহিত্যে সে শুভ সূচনা দেখা যাইতেছে। কয়েকজন সুধী ও মনস্বী লেখক, কে কোথায় অপরিজ্ঞাত সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁহাদের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে গুণগ্রাহী, বিখ্যাত সাহিত্যিক, "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" রচয়িতা, পরম শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পরলোকগত সাহিত্যিক, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আজ আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, দরিদ্র স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের জীবনী আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক, স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র আজ লোকান্তরে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্য কুঞ্জের একজন কলকণ্ঠ কোকিল ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের মধুর কাব্য সুধারসে, বঙ্গ-সাহিত্যে, গীতি-কবিতার দিক্‌টা বিশেষভাবে সঞ্জীবিত।

গোবিন্দচন্দ্রের জীবন বৈচিত্র্যময়, তাঁহার কাব্যও বিচিত্র। জীবন-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত কবির ইতিহাসে, এমন সব মর্ম্মবিদারক বাস্তব ঘটনা বিজড়িত যে, তাহা না জানিলে, তাঁহার কবিতার অর্থ অনেক স্থলে উপলব্ধি করা যায় না, এবং আরো অনেক কারণে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।

যে সকল প্রতিকূল ঘটনার ভিতর দিয়া গোবিন্দ দাসের জীবন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল,—যে শিক্ষা লইয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যকুঞ্জে পদার্পণ করিয়াছিলেন,—গভীর দুর্ভাগ্যের করাল কবলে পতিত হইয়া কেমন করিয়া তিনি আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন,—অদৃষ্ট দেবতার নির্ম্মম ব্যবহারে, কি ভাবে তিনি লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন,—শত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া, কি ভাবে তাঁহার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল,—এবং নানারূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পতিত হইয়াও, কি ভাবে প্রবল দেশাত্মবোধ, আমরণ তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—সে সকল কাহিনীর আলোচনা না করিলে, তাঁহার জীবন-চিত্র অস্ফুট, অসম্পূর্ণ এবং অপ্রকৃত রহিয়া যায়।

গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। তিনি যেন জন্মিয়াই দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও মন্দভাগ্যের ভীষণ দাবানলে সমস্ত জীবন দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছেন।

কি ক্ষণে কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"হায় মা ভারতি! চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে;
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
সেই সে দরিদ্র হবে?"

কবি গোবিন্দচন্দ্র ও হেমচন্দ্র স্বয়ং এ কথার জ্বলন্ত নিদর্শন। কিন্তু আমাদের গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে কেবল কি ইহাই?—মৃত্যু-কল্প নির্ব্বাসন!

জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হওয়া আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন কবি-ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না বলিতে পারি না। গোবিন্দচন্দ্রের জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম দৈব-বিড়ম্বনা। বাঙ্গালাব কোন কবি, তাঁহাব মত লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, উৎপীড়িত এবং নির্ব্বাসিত হইয়া এত দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই।

গোবিন্দচন্দ্র, "মগেব মুলুক" নামক একখানা তীব্র বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হওয়াব সঙ্গে উক্ত কাব্যের সম্পূর্ণ যোগ রহিয়াছে। যদি তাঁহাব জীবন কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিতে হয়, তবে "মগের মুলুক" সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি বাদ দেওয়া যায় না। তাঁহাব কাব্য সমালোচনা কালে সমালোচককে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, তাঁহার হৃদয়বিদাবক কবিতা, "আমাব বাড়ী" "নির্ব্বাসিতের আবেদন", "ভাওয়াল" এবং "কালীয় দমন" প্রভৃতিব প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এই কবিতাগুলি যে কবির জীবনেব সর্ব্বপ্রধান জ্বালাময় ইতিহাস, তাহা সমালোচক কখনও ভুলিতে পারিবেন না। যদি এই কথা বলিতে পারা যায়, তবে জীবন-কাহিনী লিখিতে বসিয়া কোন কোন ঘটনা, চক্ষু-লজ্জার খাতিরে বাদ দিলে অন্যায় হইবে। যাহা সত্য, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই। মিথ্যার কৃত্রিম আবরণে সত্য কখনও কোন দিন গুপ্ত থাকিতে পারে না।

গোবিন্দ দাসকে যখন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বাদ দেওয়া চলে না, তখন তাঁহার দুঃখময় জীবনের প্রকৃত কথা লিখিতে অনেক অপ্রীতিকর

প্রসঙ্গের উল্লেখ অপরিহার্য্য। এতদ্‌সম্পর্কে অযথা কাহাকেও মর্ম্মপীড়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

তাঁহার জন্য আমাদের আক্ষেপ হয় এই যে, তিনি জীবনে দুঃখ পাইয়া গিয়াছেন অনেক। বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতি-কবিতার দিকটা যিনি উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুঃখের কাহিনীটা উহ্য রাখিয়া গেলে, তাঁহার প্রকৃত চরিত্র একেবারেই ফুটিয়া উঠে না। এরূপ করিতে যাওয়া আর একদেশদর্শিতা একই কথা!

গোবিন্দচন্দ্রের তিরোধানের পূর্ব্বে, তাঁহার জীবনের কয়েকটি কথা জানিতে ইচ্ছা করিয়া, আমরা ব্রহ্মদেশ হইতে কবিকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। ১৩১৮ সনের ৭ই ভাদ্র প্রত্যুত্তরে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন;—

"আমার জীবনে বিশেষত্ব কিছুই নাই। সংসারে অনন্ত অসংখ্য অকর্ম্মণ্য জীবন কালসাগরে বহিয়া চলিয়াছে। কে তাহার খোঁজ লয়? তাহার উদ্দেশ্য কি ভগবান জানেন; কিন্তু তেমন নিরুদ্দেশ্য জীবন-কাহিনী শুনিতে কেহ আগ্রহ করেনা। তবে আমার * * * ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বাঙ্গালার একটা মস্ত সাগর-জীবনের যোগ আছে, * * *। আমার জীবন-কাহিনী অতি সামান্য হইলেও লোকে শুনিলে শুনিতে পারে * * *। সাগর-সঙ্গম তীর্থ নহে কি? বালীর কথা ছাড়িয়া দিয়া রাবণের দিগ্বিজয় পড়িলে অসম্পূর্ণ রহে না কি?"

—অপ্রকাশিত পত্র।

নিভৃত পল্লীর এক প্রান্তে,—দীনের কুটীরে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং নীরবে জ্বালাময় কর্ম্ম-জীবন সমাপন করিয়া অনাদৃত, উপেক্ষিত ভাবে কোলাহল মুখরিত নগরীর নির্জ্জন উপকণ্ঠে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

আমরা গোবিন্দচন্দ্রের শোক-জর্জ্জরিত, উৎপীড়িত, নিবন্ন কবি-জীবনের অনেক কাহিনীই জানি এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ, এজন্যই তাঁহার কাব্যময় জীবনের ঘটনাগুলি এবং চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

আশা করি হৃদয়বান পাঠক পাঠিকাগণ, উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমাদের শত অক্ষমতা ও ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

তিনি অপরিজ্ঞাত কবিদিগের অন্যতম ছিলেন। যে দেশে কবি গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য "সারদা মঙ্গল," এমন কি, কবি স্বয়ং, সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নিকট অপরিজ্ঞাত, সে দেশে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস অপরিচিত থাকিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তথাপি ইহার একটা কারণ আছে ; সে কথা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

কিন্তু উপেক্ষিত হইলেও, বঙ্গসাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্র অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দদাসকে উপলব্ধি করিবার এখনও ঠিক্ সময় আসিয়াছে কি না বলা যায় না। তবে, এমন দিন আসিবে যেদিন বাঙ্গালীর ভবিষ্যদ্বংশীয়ের নিকট তাঁহার সরস-মধুর গীতি কবিতা অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সেদিন কতদূর কে বলিবে? আমরা আবারও বলি যে, স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

"কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর!"



প্রথম পরিচ্ছেদ।

কবির জন্ম ও বাসভূমি,—বাল্যজীবন,—বিদ্যাশিক্ষা।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অধীন একটি ক্ষুদ্রগ্রামে ভোলানাথ দাস নামে শূদ্রবংশ সম্ভূত জনৈক গৃহস্থের বাস ছিল। দারুণ ঋণের জ্বালায় দেশে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ভোলানাথ, ঢাকা জেলারই অন্তর্গত ভাওয়াল,—জয়দেবপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইনিই পরলোকগত স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের পিতামহ।

সে আজ প্রায় এক শতাব্দীর কথা। জয়দেবপুর তখন ভীষণ অরণ্য সঙ্কুল। শুনা যায় যে, রাত্রিতে ব্যাঘ্রভয়ে লোকে গৃহের বাহিরে যাইতে সাহস করিত না। এমন কি, সময় সময় ব্যাঘ্র, গৃহে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য লইয়া প্রস্থান করিত। দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তৎকালে জয়দেবপুরে একটা অতিকায় ব্যাঘ্রিণীর উপদ্রব বাড়িয়াছিল। ঐ ব্যাঘ্রিণী, দ্বার ভগ্ন করতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়া নরশোণিতের অদম্য পিপাসা নিবৃত্তি করিত। ভগ্ন প্রাচীর অথবা অন্য কোন স্থান দিয়া গৃহে প্রবেশ করিত না,—দ্বার ঠেলিয়া গৃহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইত। এজন্য চলিত কথায় উহার নাম ছিল "দুয়ারী বাঘিণী।" এই ব্যাঘ্রভয়ে

লোকে অতি উচ্চ মঞ্চে শয়ন করিত এবং রজনীতে কেহ গৃহের বাহিরে যাইতে সাহস করিত না। *

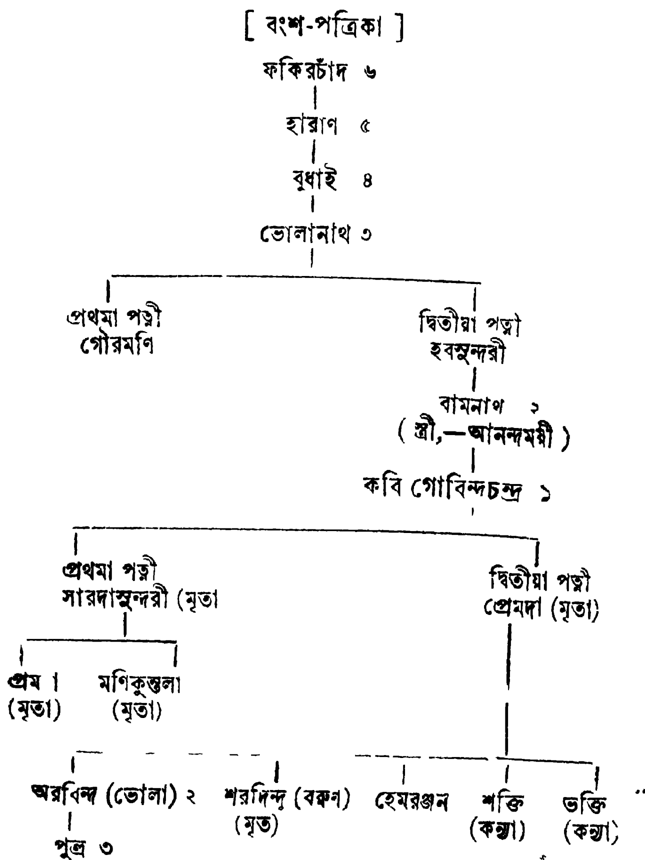
এহেন অরণ্যে আসিয়া দরিদ্র ভোলানাথ স্বেচ্ছায় বসতি স্থাপন করিলেন। সে সময় কোন বিদেশী লোক জয়দেবপুরে বসতি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে জমিদার 'বিনা সেলামী'তে ও 'বিনা জমায়' অথবা অতি নামমাত্র 'জমায়' জমি প্রদান করিতেন, এবং আগন্তুকের অবস্থা বুঝিয়া, গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যয়ভার পর্য্যন্ত বহন করিতেন। জয়দেবপুর তখন অরণ্যময়, সুতরাং এই উপায়ে জনতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া কালে জমিদারগণ সফলকাম হইয়াছিলেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার বংশ-পত্রিকা নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। তথাপি পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল জন্মিতে পারে, এজন্য তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

---

* জয়দেবপুরের নাম, পূর্ব্বে "পীরাবাড়ী" বলিয়া প্রচলিত ছিল। ভাওয়াল রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়দেব রায় এখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানের 'জয়দেবপুর' নাম রাখেন।



কবির জন্মভূমি জয়দেবপুর এবং সমস্ত ভাওয়াল প্রদেশ অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। দিকে দিকে বন-বিহঙ্গের কল-কাকলী পরিপূর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় বনানী; স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর

সমন্বিত শৈলরাজী। * এই সকল বনভূমি অতি দীর্ঘ গজারী প্রভৃতি নানাবিধ বনস্পতি পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রতোয়া চিলাই নদী দ্রুতবেগে প্রবাহিতা হইতেছে।

ভাওয়ালের একদিকে যেমন পার্ব্বত্য প্রদেশের রমণীয় শোভা, অপর দিকে তেমনি কোথায়ও শ্যামায়মান শস্যক্ষেত্রের নয়নাভিরাম দৃশ্য, কোথায়ও বা স্নিগ্ধ পবনান্দোলিত, কমল কুমুদ জলপুষ্প সুশোভিত, নানা জাতীয় জলচর বিহঙ্গম মুখরিত, নাতি বৃহৎ সাগর তুল্য জলাভূমি বা 'বিল'। জলাভূমির তীরে তীরে কোথায়ও শরবন এবং ঘন শষ্প বিদ্যমান। তাহাতে জলচর পক্ষীগণ নিশা যাপন করে। আবার কোথায়ও বা তৃণাচ্ছাদিত পথহীন, জনহীন প্রান্তর। সে দৃশ্যে পথিকের মন উদাস হইয়া যায়।

কবি গোবিন্দদাসের হৃদয়ে ভাওয়ালের এই অপরূপ দৃশ্য "স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী" রূপে প্রতীয়মান। তাঁহার কবি-জনোচিত নয়নে ভাওয়ালের "মোহন রূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ" রূপে চির উদ্ভাসিত। তাঁহার কাছে ভাওয়াল যেন স্বর্গের নন্দন কানন,—যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র,—যেন অলকার রত্নাগার।

প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সম্পদ-সম্ভার পরিপূর্ণ স্থান দর্শন করিয়া পর্য্যটকের হৃদয় স্বতঃই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কবি-হৃদয়ের ত কথাই নাই! ভাওয়ালের এহেন অপূর্ব্ব বনভূমিতে কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেন প্রকৃতির বরপুত্র।

আশৈশব জন্মভূমির প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁহার সমগ্র কাব্যে ভাওয়ালের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তিনি পরিক্লান্ত হন

---

* চলিত কথায় ক্ষুদ্র শৈলরাজী "টিলা" নামে অভিহিত।

নাই। জন্মভূমির বন্দনায় কবির কণ্ঠ গগনচারী সুকণ্ঠ বিহঙ্গের ন্যায় সাবলীল।

"শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।"

ভাওয়াল গোবিন্দদাসের প্রাণতুল্য প্রিয়। কবি তাহার স্তুতি উপলক্ষে স্বাভাবিক কলকণ্ঠে দিক্‌দিগন্ত প্লাবিত করিয়া গাহিয়াছিলেন ;—

"জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
সে আমার যাগযজ্ঞ, সে আমার ধ্যান!
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ!"

ভাওয়ালের মত নয়ন-বিমোহন স্থান, স্বভাব-কবির উপযুক্ত জন্মভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গোবিন্দচন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃদেব ৺রামনাথ দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। শৈশবে পিতৃহীন কবির সংসারে তখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী এবং মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। কবির কনিষ্ঠ সহোদর জগচ্চন্দ্র দাস (জগদ্বন্ধু দাস) তখন সূতিকাগারে। পিতার মৃত্যুর পর, সংসারে উপার্জ্জনক্ষম কেহ না থাকায়, দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, দয়ালু রাজা কালীনারায়ণ রায়, দরিদ্র পরিবারের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মাসিক চারিটি মুদ্রা সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর, এই বৃত্তির পরিবর্ত্তে কতক নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন।

উদার-হৃদয় রাজা কালীনারায়ণ রায়, ভগবানের মূর্ত্তিমান অনুগ্রহরূপে এই নিরন্ন কবি পরিবারের প্রাণ বাঁচাইলেন। বাসস্থান পবিবর্ত্তন করিয়াও রামনাথ দাস দারিদ্র্যের নাগ-পাশ-মুক্ত হইতে পারেন নাই।

রাজা কালীনারায়ণ দয়ার অবতার ছিলেন। ভাওয়াল রাজবংশে বাজা কালীনারায়ণ তাঁহার বহুবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। রাজা কালীনারায়ণ সাহায্য না করিলে বঙ্গসাহিত্যে এই কবির বীণাধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত কি না কে জানে? বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে কালীনারায়ণের এই অপার করুণার কথা চিরস্মরণীয় হইয়া বহিবে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শোক ও দুঃখের উদ্দাম দানবী লীলায় তাঁহার জীবন-নাটকের প্রতি অঙ্ক পরিপূর্ণ। দুস্থ, নিরন্ন কবি যে আমাদের দেশে কেহই ছিলেন না বা এখনও নাই, তাহা নহে। কিন্তু, দাস-কবির মত জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত গভীর বেদনা, শোক ও সন্তাপ পাইয়া আসিয়াছেন কয়জন বলিতে পারি না।

তাঁহাব বিদ্যাশিক্ষা অতি সামান্য। অষ্টম বৎসর বয়সে গোবিন্দ-চন্দ্রের অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হয়। তাঁহার পিতার জ্ঞাতি সম্পর্কান্বিত এক নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কবি-গৃহের অনতিদূরে অবস্থান করিতেন। অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তিনি এবং তাঁহার পত্নী, বালক গোবিন্দচন্দ্রকে পুত্র তুল্য স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের স্নেহাতিশয্যে পিতৃহীন গোবিন্দচন্দ্র এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে, দিবসের অধিকাংশ সময় জ্যেষ্ঠতাতের আলয়ে কর্ত্তন করিতেন। উক্ত নিঃসন্তান দম্পতির নিরানন্দ গৃহপ্রাঙ্গণ একদিন বালক গোবিন্দচন্দ্রের কোলাহলে সজীবতা আনয়ন করিত।

এই গৃহেই গোবিন্দচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা সূচিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের শ্যালক নন্দরাম ঘোষ তথায় বাস করিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর এত সুন্দর ছিল যে, তৎকালে তিনি জয়দেবপুরে একমাত্র হস্তাক্ষরের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই নন্দরাম ঘোষ মহাশয়ই গোবিন্দচন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথম ক, খ, লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কিন্তু শুনা যায় যে, কবি বিদ্যাশিক্ষায় অতি অল্প সময়ই অতিবাহিত করিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময় হয় গোচারণ, নতুবা অন্য কোন ক্রীড়ায় লিপ্ত থাকিতেন। *

ইহার কিছুদিন পর, রাজদুহিতা কৃপাময়ী দেবীর সহিত রাজবাড়ীতে, কদলীপত্রে লিখিতে অভ্যাস করেন। তখন কালীনাথ মিত্র নামে এক ব্যক্তি কৃপাময়ী দেবীর শিক্ষক ছিলেন। কবির নিকট শুনিয়াছি যে, কৃপাময়ী দেবী অনেক সময় তাঁহাকে হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছেন। রাজবাড়ীতে অল্পদিন বিদ্যাশিক্ষার পর, কালীনাথ মিত্র পরলোক গমন করিলে, জয়দেবপুর বাজারের মঙ্গল পাল এবং রতন সরকার নামক দোকানদারগণের কর্ম্মচারীদের নিকট লিখিতে অভ্যাস করেন। এখানে 'বর্ণমালা' এবং 'ধারাপাত' সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের একজন সহপাঠীর নাম ছিল বসন্তকুমার দে। কালে, বসন্তকুমার কবির দলের একজন বিখ্যাত সরকার হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু ও রজনীকান্ত নামে গোবিন্দচন্দ্রের আরো দুইজন সহাধ্যায়ী ছিলেন।

---

* গোবিন্দচন্দ্র একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—

"নন্দরাম ঘোষের নিকট আমি লিখিতাম, আর জ্যেঠা মহাশয়ের গরুর চাকর (রাখাল) 'দাগা' চাড়ালের সঙ্গে গিয়া গরু রাখিতাম। গরু চরাইতে আমি বড় আনন্দ অনুভব করিতাম।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

পরবর্ত্তী জীবনে, কবি উক্ত শৈশব সহচরদিগকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই, "প্রেম ও ফুল" কাব্যে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"বসন্ত প্রাণের ভাই, দু'বছর দেখা নাই
আজি যে দেখিতে তোরে কত আকিঞ্চন।
কোথা সত্যভামা, বিন্দু, প্রীতির পবিত্র ইন্দু
দেখিলে সিন্ধুর মত উথলিত মন।
কোথা ভাই দীনবন্ধু, রজনী এখন ?"

তার কতকদিন পব, রাজা কালীনারায়ণের সখের কবির দলেব সরকার রামদয়ালের নিকট লেখাপড়া করিয়াছিলেন। রামদয়ালেব নিকট হইতে বিদায় লইয়া লেখাপড়াও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ দিনের জন্য স্থগিত রহিল।

সে সময় জয়দেবপুরে কোন বিদ্যালয় ছিল না। রাজকুমাব রাজেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হইলে, রাজা কালী-নাবায়ণ, রাজকুমারের শিক্ষার নিমিত্ত জয়দেবপুরে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন। রাজবাড়ীর নূতন চণ্ডীমণ্ডপে স্কুল বসিত। একদিন গোবিন্দচন্দ্র স্কুলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয় একখানা শ্লেটে খড়ি দিয়া "অ" খুব বড় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বালকেরা সমস্বরে পড়িতেছে "স্বরে অ"। এই প্রণালীতে বালকেরা বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতেছে। বালকগণের এইরূপ সমস্বরে বর্ণ পাঠ শ্রবণ করিয়া দাস-কবির স্কুলে পড়িবার কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। বাড়ী আসিয়া পিতামহী ও জননীকে মনের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পিতামহী সংসারের দুর্দ্দশার কথা বুঝাইয়া বলিলেন যে, পুস্তকের মূল্য ও স্কুলের বেতন দেওয়া অসম্ভব। স্কুলের বেতন আধ আনা এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "শিশু শিক্ষা" প্রথমভাগ এক আনা। এই দেড় আনার

জন্য কবি দুই ঘণ্টা কাঁদিয়া আকুল হইলেন, এবং পড়িবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। এমন সময়, তাঁহার পিতার গুরুপুত্র এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যম মাতুল,প্যারীমোহন গোস্বামী তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং রাজবাড়ীতে যাইয়া তাঁহার ভগিনী রাণী সত্যভামা দেবীকে আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন।

অতঃপর রাণী সত্যভামা দেবীর কৃপায় গোবিন্দচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম হইয়া উঠিল। এমন কি, রাণীর অনুগ্রহে গোবিন্দচন্দ্র তদবধি রাজকুমারের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজবাড়ীতেই তিনি আহার এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের নিকট শয়ন করিতেন, এবং রাজমাতা সত্যভামা দেবীর দয়ায়, কবি, রাজার নব স্থাপিত স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজমাতাই তাঁহার পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিলেন। এইরূপে জয়দেবপুরের রাজভবনেই তাঁহার শৈশব কাল অতিবাহিত হইল। *

গণিত শাস্ত্রে তিনি নিতান্ত অপটু ছিলেন। এজন্য শিক্ষকের নিকট

---

* "রাজপরিবারের সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। রাণী সত্যভামা দেবী আমাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন এবং কৃপাময়ী কনিষ্ঠ সহোদরের মত আমাকে ভাল বাসিতেন। স্কুলে যাওয়ার সময় বেলা অধিক হইলে, রাজকুমারকে যখন রাণী খাওয়াইয়া দিতেন,তখন আমার হাতেও এক এক গ্রাস ভাত মাখিয়া দিতেন। রাণীকে মা এবং কৃপাময়ী দেবীকে ভগিনী বলিয়াই জানি। শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবীর স্বামী বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাজ-পরিবারের এই সকল স্নেহ ও মমতার কথা এখনও স্মরণ করিতে আমার শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়।

—গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পত্র।

পরবর্ত্তী কালে "প্রেম ও ফুলের" কবি রাজদুহিতা কৃপাময়ী দেবীকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

অনেক শাস্তি পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মুখেই শ্রবণ করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, সেই সময় বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর দেখিয়া ফল নির্দ্ধারণ করা হইত। গণিতে অকৃতকার্য্য হইয়াও তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং যথা সময়ে সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন।

ছাত্রবৃত্তি স্কুলে অধ্যয়ন কালেই, গোবিন্দচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ১৩।১৪ বৎসর। তৎকালে জয়দেবপুরের স্কুলে "বিদ্যোৎসাহিনী" নামে সভা হইত। সেই সভায় সকল বালককেই রচনা পাঠ করিতে হইত। গোবিন্দচন্দ্রও কবিতা লিখিয়া পাঠ করিতেন।

রাজা কালীনারায়ণ, ভাওয়ালের প্রজাগণের উন্নতিকল্পে, জয়দেবপুরে "প্রজাহিতৈষিণী সভা" স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালের সর্ব্ববিধ হিত-চেষ্টাই সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি বৎসর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে শুভ পুণ্যাহের সময়, সভার অধিবেশন হইত।

উক্ত সভায় নানাবিধ দেশহিতকরী প্রস্তাবের আলোচনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধনকল্পে বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করা হইত। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, দাস মহাশয় একটি কবিতা রচনা করিয়া সেই সভায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিতাটি অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

"আজিও কি মনে আছে ভোলনি ভগিনি !
দুইজনে এক সাথে, লিখেছি কলার পাতে,
হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি !
কেবল তোমার স্নেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে
কৃপাময়ি করুণার তুমি নির্ঝরিণী।"

বিদ্যোৎসাহী রাজা কালীনারায়ণ, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা শ্রবণে তরুণ কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বের পরিচয় পাইলেন; এবং প্রফুল্লচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দাস কবিকে ঢাকার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য মাসিক পাঁচটি করিয়া মুদ্রা, বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই সাহায্য প্রাপ্তির পর গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া আর অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। গণিতে অপটু ছিলেন বলিয়া প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে বৃত্তি পাইলেন না। সেই মনঃকষ্টে এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি কারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়নের ফলে কবি যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন।

অতঃপর বাড়ী আসিয়া কিছুদিন বসিয়া থাকিলেন। ইতোমধ্যে, ভাওয়ালের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজা কালীনারায়ণ, গোবিন্দচন্দ্রকে উক্ত স্কুলের হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

কয়েক মাস কার্য্য করিবার পর, দাস-কবি স্ব ইচ্ছায় পণ্ডিতি পরিত্যাগ করিয়া, তৎকালে নব স্থাপিত ঢাকার চিকিৎসা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। রাণী সত্যভামা দেবী তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।

কিন্তু, অচিরেই কবির চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। অতি অল্প সময় মাত্র অধ্যয়ন করিয়া, শব ব্যবচ্ছেদের ভয়ে কবি, "মেডিকেল স্কুল" পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র নিতান্ত অব্যবস্থিত প্রকৃতির লোক ছিলেন; এজন্য সারাটা জীবন তিনি কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী জীবনে ইহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষা-জীবন অসম্পূর্ণ ভাবে, অস্থির গতিতে পরিসমাপ্ত হইল। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে

নাই। তিনি ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। বোধ হয় এজন্যই, তাঁহাকে, আমরা একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবিরূপে পাইয়াছি।

গোবিন্দদাসের সঙ্গে কাহার তুলনা হয় আমরা জানি না। কবি বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্র সেন, দীনেশচরণ, নিত্যকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত,—তাঁহাদের গীতি-কবিতায় ইংরেজীর আদর্শ প্রতিফলিত। কাজেই ইহাঁদের সহিত তাঁহার তুলনা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরেজী না জানিয়াও তিনি, তাঁহার বহু কবিতায় অত্যন্ত সুসঙ্গত এবং যথাযথ ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল কবিতা পাঠে গোবিন্দচন্দ্রকে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ মনে করা কঠিন। তিনি একবার লিখিলেন ;—

"সে জানে না ভ্রাতৃভাব
সে জানে না 'ফিরি লাভ'
পর পুরুষের ছায়া দেখে ভয় পায়!
যায়না বাগান পার্টি,
ভেরি আগ্লি,—ভেরি ডার্টি
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়।
কোণে ব'সে ভালবাসে শীলতা কোথায়?"

ইংরেজী শব্দের দ্বারা আর একবার যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনুপ্রাসের ভঙ্গিমা কি সুন্দর করিয়া গড়িয়াছিলেন!

"বাজ্‌ছে কেমন বিজয় ব্যাণ্ড্, মৃত্যু কর্‌ছে শ্যাক হ্যাণ্ড্
কেমন গ্রাণ্ড্ অভ্যর্থনা অকূল জলধির!
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।"

তাঁহার সমগ্র কাব্যে এ প্রকার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বিদ্যালয়ের সম্পর্কে না আসিয়াও যে শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, অনেক সময়, অনেকের অজ্ঞতা এবং শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ঢাকিয়া ফেলিবার একটি অমোঘ অস্ত্র।

প্রকৃত শিক্ষা নিজের চেষ্টার উপরই নির্ভর করে। এই হিসাবে এবং গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে, শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দেওয়া যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র প্রতিভাবান্ ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অন্তর্নিহিত ছিল। সর্ব্বোপরি, তাঁহার হৃদয়ে একটা স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। সেই প্রতিভা ও স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তিই, তাঁহার কবি জীবনের বিজয়-মুকুট।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— :০: ——

কবির দুর্ভাগ্যের সূচনা।

ভাওয়াল-রাজ স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী, ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই চৈত্র, "বান্ধব" সম্পাদক এবং "প্রভাত-চিন্তা", "নিভৃত-চিন্তা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে সর্ব্বপ্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন। রাজকুমার রাজেন্দ্র-নারায়ণের বয়স তখন অনুমান অষ্টাদশ বৎসর মাত্র।

তৎকালে, পূর্ব্ববঙ্গে "বান্ধব" এবং পশ্চিমবঙ্গে 'বঙ্গদর্শন," পাশা পাশি দুইটি উজ্জ্বল শুক্রগ্রহের মত, বঙ্গ সাহিত্য গগনে ফুটিয়া, তাহাদের স্নিগ্ধ আলোকে, জ্ঞানপিপাসুদের পথ প্রদর্শন করিতেছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন না করিয়াও, নিজের অদম্য অধ্যবসায় বলে কালীপ্রসন্ন, গভীর বিদ্যাবত্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মীতা, এককালে শ্রোতৃমণ্ডলীর মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিত। বঙ্গভাষার উপর কালীপ্রসন্নের অসাধারণ অধিকার ছিল।

ঘোষ মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আগ্রহাতিশয্যে একদা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, ঢাকার "বান্ধব কুটীরে" তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম এবং তাঁহার প্রতিভা-মণ্ডিত-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ও মধুর কথোপকথন

শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ চক্ষুর দৃষ্টি প্রকৃতই দর্শকের হৃদয় আকৃষ্ট করিত। বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার দান, কয়েকখানি গ্রন্থ অপূর্ব্ব চিন্তাশীলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ঘোষ মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার কথা জানিতে পারিয়া ভাওয়ালের বৃদ্ধ রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী, তাঁহাকে কর্ম্ম-কর্ত্তা-রূপে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের যথোপযোগী শিক্ষা ও রাজ্য শাসন সম্পর্কে পারদর্শিতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে, কুমারকে ঘোষ মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন।

যাহাতে কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ, রাজ্য পরিচালনায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য রাজকার্য্যের কতক কতক ভার কুমারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ রাজা কালীনারায়ণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার চক্ষুরোগ চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আগমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর চক্ষুরোগ আরোগ্য হইলে, নানা তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হয়েন। রাজা কালীনারায়ণ, তাঁহার অনুপস্থিতির সময় রাজ্যভার, পুত্র রাজেন্দ্র-নারায়ণ এবং প্রধান কর্ম্মচারী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি পুনরায় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু আর দীর্ঘ দিন জীবিত রহিলেন না। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ৩রা আষাঢ় অকস্মাৎ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে, কুমার রাজেন্দ্র-নারায়ণ ভাওয়ালের রাজা হইলেন।

রাজা কালীনারায়ণের অনুপস্থিতির সময় কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদ শূন্য হওয়ায়, কবি গোবিন্দচন্দ্র সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয় যুবক। সুপ্রসিদ্ধ

সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন ভাওয়ালের সর্ব্বপ্রধান রাজ-কর্ম্মচারী।

অশুভক্ষণে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্রের দেখা হইয়াছিল। দুইজনেই বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। গদ্য সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে প্রচণ্ড সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, আর গোবিন্দচন্দ্র গীতি-কবিতার দিক্ দিয়া পূর্ণিমার শশধর। হায়। ইহা নিতান্তই পরিতাপ ও ক্ষোভের কথা যে, এই দুইজন প্রতিভা-বান্ সাহিত্যিকের সম্মিলন, মধুময় হইতে পারে নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিতে বসিয়া আমাদিগকে অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে। সত্যের অপলাপ করা কাহারও সাধ্য নাই। কালের বিচারে একদিন না একদিন তাহা প্রকাশিত হইবেই। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে যাইয়া আমাদের এই একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় যে, আমরা নিরপেক্ষ।

যুবক রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার পিতার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন না। বৃদ্ধ রাজার অনুপস্থিতি কালে, রাজ্যের গুরুভার স্কন্ধে পতিত হইলেও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, রাজকার্য্যে মনোযোগ দেওয়া বৃথা মনে করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি, নিজে কোন রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন না। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের উপর রাজ্য সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিয়া তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সমস্ত কার্য্যই নিজে পরিচালনা করিতেন। রাজা তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। কোন প্রজার রাজ দর্শনের অধিকার ছিল না। প্রজামণ্ডলীর কোন আবশ্যক হইলে, ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে হইত।

বাস্তবিক, সে সময় ভাওয়ালের বড় দুর্দ্দিন। রাজার অমনোযোগে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হইতে লাগিল। ভাওয়ালের দরিদ্র প্রজাগণের ভাগ্যাকাশ তখন তমসাচ্ছন্ন হইতেছিল। তদুপরি সমগ্র দেশ জুড়িয়া দুর্ভিক্ষের ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল।

তখন ভাওয়ালের রাজ-সভা, একদল স্তাবক সম্প্রদায়ের কোলাহলে মুখরিত হইতেছিল। তাঁহারা ব্যক্তি-বিশেষের অযথা নিন্দা অথবা প্রশংসা করিয়া রাজ্যের সর্ব্বনাশ সংঘটনের সহায়তা করিতেন। যখন রাজ্যের এইরূপ দুরবস্থা, কবি গোবিন্দচন্দ্র তখন রাজার পার্শ্বচর কর্ম্মচারী।

ভাওয়াল রাজ্যের এইরূপ আসন্ন বিপদাশঙ্কায়, রাজাকে অবিচলিত দেখিয়া দাস মহাশয়, নিয়ত তাঁহার নিকট অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের অবনতি দর্শনে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে কিন্তু, এই অনুযোগের ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইল।* ঘোষ মহাশয় যথা সময়ে এই সংবাদ শুনিলেন। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে গোবিন্দচন্দ্রের রাজাকে পরামর্শদান ঘোষ মহাশয়ের প্রীতিপ্রদ হইল না। তিনি স্বীয়

---

* এ সম্বন্ধে দাস মহাশয় আমাদিগকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"নিজের কাজ নিজেই করা কর্ত্তব্য, অন্ততঃ সর্ব্বোপরি সময় সময় তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন একান্ত আবশ্যক। সহস্র সহস্র লোকের সুখ, দুঃখ ও ন্যায় অন্যায়ের বিচার ভার বিধাতা যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কত বড় দায়িত্ব একথা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতাম। কাহারও প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে, বিষয় সম্পত্তির ভারার্পণ করা যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, ইহাও তাঁহাকে সর্ব্বদা বলিতাম। ক্রমে একথা কালীপ্রসন্নের কানে গিয়া পৌঁছিল। * * * আমাকে কিরূপে রাজার নিকট হইতে তাড়াইয়া, তাহার অনুগত ও বাধ্যলোক রাজার নিকটে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, এখন তাহার সেই চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার কোন ত্রুটী না পাইলেও অন্য কারণে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।" —অপ্রকাশিত পত্র।

প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। আর কে'ই বা তা না করে? কিন্তু রাজা যেমন উদাসীন ছিলেন, তেমনি রহিলেন।

অলক্ষ্যে বসিয়া অদৃষ্ট দেবতা হাসিতেছিলেন।

গোবিন্দদাসের তখন নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্য; তাই অন্য এক আনুসঙ্গিক কারণে তিনি রাজগৃহের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের দুঃখ এ ভাবেই অবসান হইল না। ফলতঃ, এখানেই বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। পরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া যে তরু জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে কবি, প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ রাজা কালীনারায়ণ, ১২৮৪ সনে তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেলে একটি ঘটনা ঘটে। সে সময় ময়মনসিংহ—মুক্তাগাছার তদানীন্তন ভূম্যাধিকারিণী ৺ভুবনময়ী দেবীর দত্তক পুত্র, দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়, জয়দেবপুর রাজভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সম্পত্তি হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়া রাজা কালীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা কালীনারায়ণ, তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়ায়, তিনি ভাওয়াল-রাজ-পরিবারে বাস করিতেছিলেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রকিশোর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে খুবই প্রণয় জন্মিয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন বলিয়া দেবেন্দ্রকিশোর তাঁহাকে সময় সময় অনুযোগ করিতেন।

ইতোমধ্যে একদা রাজা কালীনারায়ণ রায়ের আত্মীয়, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) ও শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং জনৈক ব্যাঙ্গা খানসামা * একত্র মিলিয়া মদ্যপান করতঃ, উন্মত্ত অবস্থায় রাত্রিতে,

* রাজা কালীনারায়ণ রায় তিন বিবাহ করেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই প্রথমা রাণীর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া রাণী জয়মণি দেবী অনপত্যা অবস্থায় পরলোক

জনৈক গ্রামবাসী বেচু শিকদারের বাড়ীতে, কুঅভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়া গৃহ প্রাচীরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকে এবং গৃহদ্বার খুলিয়া দিতে বলে। গৃহস্বামী বাড়ী উপস্থিত ছিলেন না। এই অবস্থায় অত্যন্ত ভীতা হইয়া বেচুর স্ত্রী চীৎকার করিতে থাকেন। ইত্যবসরে, বেচুর জনৈক ভৃত্য, অত্যাচারীদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলে, উহারা নিরাশ্রয় ভৃত্যকে প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

বেচু শিকদার বাড়ী আসিয়া আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন এবং রাজবাড়ীতে যাইয়া দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত করেন। দেবেন্দ্রকিশোর, বেচু শিকদারকে রাজার নিকট অভিযোগ করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে পরদিন রাজ দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইল। রাজাজ্ঞায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বিচার করিয়া কেবলমাত্র ব্যাঙ্গা খান্‌সামার পাঁচটি মুদ্রা অর্থদণ্ড করিলেন। শ্যামাচরণদ্বয় বেকসুর খালাস পাইল। এই বিচারে সমগ্র প্রজামণ্ডলী বিস্মিত হইল। বেচু শিকদার যখন দেবেন্দ্রকিশোরের নিকট বিচার-ফল জানাইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, কবি গোবিন্দচন্দ্র তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। বেচুর ক্রন্দনে, দাস-কবির হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি এই মোকর্দ্দমার পুনবিচারের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।

যথা সময়ে, গোবিন্দচন্দ্র নিভৃতে রাজাকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া সুবিচার করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ইহাতে রাজা একেবারেই সম্মত হইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া দাস মহাশয়, রাজাকে পুনর্বিচার করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোবিন্দদাস

গমন করেন। তৃতীয়া রাণী শ্রীযুক্তা সত্যভামা দেবী। বড় শ্যামাচরণ দ্বিতীয়া রাণীর এবং ছোট শ্যামাচরণ তৃতীয়া রাণীর ভগিনী পুত্র। ব্যাঙ্গা খান্‌সামা রাজভৃত্য হইলেও, রাজা কালীনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। ইহারা তিন জনেই এখন পরলোকে।

তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতার সহিত প্রজামণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইলেন।

তিনি ভাওয়ালের জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া, সকলকে বুঝাইয়া, এক দলভুক্ত করিলেন এবং উহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, রাজা যদি ন্যায় বিচার না করেন, তবে সমগ্র প্রজামণ্ডলীই বিচার ভার গ্রহণ করিয়া অপরাধীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবে।* এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, একদিন জয়দেবপুরবাসী সর্ব্বসাধারণকে লইয়া তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা এইরূপ জনসমাগম দর্শন ও প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ভীত ও বিচলিত হইলেন এবং যথার্থরূপে পুনর্বিচার করিতে সম্মত হইলেন। ব্যাঙ্গা খান্‌সামা ইহা জানিতে

---

* গোবিন্দচন্দ্র একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—

"যথাসময়ে আমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাজাকে আমি অনেক বলিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই ফল হইল না। তখন রাজাকে বাধ্য করিয়া বিচার করাইবার জন্য আমার জিদ্ হইল। আমি জয়দেবপুরের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল প্রভৃতি সর্ব্ব জাতির ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহা-দিগকে বুঝাইতে লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটনা হইয়াছে, অপরাধীরা যদি তাহার জন্য উপযুক্তরূপে দণ্ডিত না হয়, তবে কাল তোমাদের বাড়ীতে যে সেই কাণ্ড করিবে না তাহার বিশ্বাস কি? ভবিষ্যতে নিজের মান ইজ্জত রক্ষার জন্য, বেচুর বাড়ীর এই ঘটনার উপযুক্ত প্রতিকার করার জন্য, সকলেরই প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সভা সমিতি করিয়া জয়দেবপুরবাসী সকলকে একথা বুঝাইয়া এক দলভুক্ত করিলাম এবং সকলকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলাম যে, রাজা যদি পুনরায় ইহার ন্যায়বিচার না করেন, তবে আমরা নিজে ইহার বিচার ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্গা ও শ্যামাচরণদ্বয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিব এবং ভবিষ্যতে আর কোন ভাওয়ালবাসী প্রজা যেন রাজবাড়ী বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহার জন্যও বিহিত উপায় অবলম্বন করিব।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

পারিয়া কলিকাতায় রাজা কালীনারায়ণের নিকট পলাইয়া গেল। তখন প্রজামণ্ডলীর অভিপ্রায়ে, রাজা কালীনারায়ণের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া ব্যাঙ্গাকে আনয়ন করা হইল। রাজা কালীনারায়ণ, ব্যাঙ্গাকে প্রেরণ করিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে লিখিলেন যে, শারীরিক শাস্তি ব্যতীত আর যে কোন শাস্তি উহাকে প্রদান করা হয়।

যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হইল। এবার বিচারক রাজা স্বয়ং এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। পুনর্বিচারে শ্যামাচরণদ্বয় চিরদিনের জন্য কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন। বড় শ্যামাচরণ মফস্বল ডিহি কাছারীর নায়েব, এবং ছোট শ্যামাচরণ সদরের নাজীর ছিলেন। ব্যাঙ্গার ৫০০৲ মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল এবং যতদিন তাহার সচ্চরিত্রতা প্রমাণিত না হয় ততদিন সে, দক্ষিণে টঙ্গি নদী, পশ্চিমে তুরগ নদী, পূর্ব্বে ও উত্তরে চিলাই নদী, এই চতুঃসীমার মধ্যে, ছাতা মাথায়, জুতা পায় দিয়া বাহির হইতে পারিবে না; এইরূপ দণ্ডাদেশ হইল।

বিচার ফল নিতান্ত মন্দ হয় নাই। আমাদের অনুমান হয়, প্রথম অপরাধীর পক্ষে এই শাস্তিই যথেষ্ট। কিন্তু শুনা যায় যে, বিচার সময়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ও স্বয়ং রাজেন্দ্রনারায়ণ, শ্যামাচরণদ্বয়ের এবং ব্যাঙ্গার, অন্যায়রূপে পক্ষ সমর্থন করেন। জনসাধারণ নাকি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

বিচার ফলে কবি গোবিন্দচন্দ্রের হৃদয় বেদনা দূরীভূত হইল না। নির্ভীক-হৃদয়, দেশভক্ত, তেজস্বী কবি, গুরুতররূপে অপমানিত একজন প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া, অকৃতকার্য্য হইলেন। অপরাধিগণেব যথোপযুক্ত শাস্তি হইল না, এই বিশ্বাস গোবিন্দ দাসের মনে লাগিয়া রহিল। বেচুর অপমানে, কবি-হৃদয়ের অন্তস্তলে, যে দারুণ বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কি-জানি-কেন দূরীভূত হইল না। সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মসম্মানে

তীব্র আঘাত লাগিয়াছিল। ফলে, ভগ্ন-হৃদয়ে, সেই বিচার সভায়—সেই মুহূর্ত্তে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে গোবিন্দ দাস রাজগৃহের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

যেখানে অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন হয় সেখানে আর চাকরি করিবেন না বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি আর জয়দেবপুরে চাকরি করেন নাই। ১২৮৪ সনে ভাওয়ালের রাজগৃহের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। এতদুপলক্ষে নিতান্ত নির্ভীক-হৃদয়ে কবি লিখিলেন,—

"যাই প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার!
ভুলেছ কি গত কথা? আছে কি মা মনে?
সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি! তোমার তরে অকাতর মনে?
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সেদিন হায় করি চূর চূর,
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোণার মুকুর!

---

* "সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে রাজার চাকরি ইস্তাফা দিলাম। * * আমার জিম্মায় রাজার যে সকল কাগজপত্র, টাকা-কড়ি, নোট ইত্যাদি ছিল, তাহা ঐ প্রকাশ্য সভায় বুঝাইয়া দিয়া, রাজার নিকট বাক্সের চাবি দিলাম। এই হইতে জয়দেবপুরের চাকরি আমার ক্ষান্ত হইল। * * প্রকারান্তরে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মনস্কামনা পূর্ণ হইল: সে তাহার অনুগত লোক, রাজার নিকট আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।"

—গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পত্র।

কিন্তু—
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা!
যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসি! মনে রে'খ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্ব্বরের ঠাঁই।"

কবিতাটি রচনার বহু পরে, ১২৯২ সনে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি গোবিন্দ চলিয়া গেলেন পর, ভাওয়ালের রাজসভার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিল না। পরন্তু, বৃদ্ধ রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যু হইলে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া ধনী-জন-সুলভ বিলাসিতায়, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর লিপ্ত হইলেন এবং ইহার ফলে রাজ কার্য্যে তাঁহার শৈথিল্য এবং অমনোযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ্য-প্রাপ্তির প্রায় একপক্ষ কাল গত হইলে তিনি একখানা দলিল-সম্পাদন পূর্ব্বক, ঘোষ মহাশয়কে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিলেন। *

---

* এই ঘটনার বহু বৎসর পর, ১৩০৮ সনের ১৩ই বৈশাখ, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করিলে, তদীয় বিধবা রাণী বিলাসমণি দেবী, ঢাকার দ্বিতীয় সবজজ আদালতে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নামে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাবট্টি হাজার টাকার দাবীতে এক অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"বাদিনীর স্বামী * * * শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই
* বিবাদীর অনুকূলে এক আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া দেন, এবং
* বিবাদীকে কর্ম্মচারিগণের নিকাশ গ্রহণ, খরচ বহাল বাজেয়াপ্ত ও হুজুরী

সুতরাং, প্রধান কার্য্য-কারক হইয়াও কার্য্যতঃ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এ রাজার অভিপ্রায় অনুসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে দেশভক্ত কবি গোবিন্দচন্দ্র, নিরন্ন অবস্থায় বহুকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ভাওয়ালের এই ঘোর দুর্দ্দিনের ঘূর্ণাবর্ত্তে, "প্রজাহিতৈষিণী-সভা"র অপঘাত মৃত্যু হইল। যে একটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল।

গোবিন্দচন্দ্র স্বকীয় তেজস্বিতার প্রাবল্যে অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ ভাওয়াল রাজ-গৃহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি নিতান্ত বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্বন্ধ ছিন্ন না করিলেও হয়ত, একদিন তিনি রাজগৃহ হইতে বিচ্যুত হইতেন। কে বলিবে, তাহা ঘটিত কি না?

মফস্বলী, সমস্ত কর্ম্মচারী বহাল ও বরতরফ করার ক্ষমতা ও অন্যান্য ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন। এবং বিবাদী ক্রমে শাসন সমরক্ষণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভাব এবং ষ্টেটের আয় ব্যয় ও তহবিলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করেন। * * এই প্রকারে স্বামী মহাশয় ক্রমে বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কার্য্য ও ষ্টেটের আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং বিবাদীর প্রতি অচল বিশ্বাস স্থাপন করেন। এবং বাদিনীর স্বামী অসার যৌবনীয় আমোদ প্রমোদে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট এবং * * পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত থাকেন, এবং তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে তিনি যে খাজাঞ্চিখানার হিসাব দস্তখত করিতেন তাহা হইতে * * ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।"

—রাণী বিলাসমণি দেবীর মুদ্রিত অভিযোগের প্রতিলিপি।

রাজা কালীনারায়ণ রায়ের অনুপস্থিতিকালে সংঘটিত ঘটনাসূত্রে তিনি যতটা বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা স্থির-হৃদয়ের পরিচায়ক নহে। তাহার জীবনের যন্ত্রণার অনেকটা তিনি নিজেই যেন ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ভাওয়াল রাজগৃহের সংস্রব ভগ্ন না করিলে, তাঁহার জীবন-স্রোত বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইত সন্দেহ নাই; আমরণ দরিদ্রতা তাহাকে অভিভূত বা আচ্ছন্ন করিতে পারিত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কবিতা রচনার উন্মেষ,—কন্যাশোক,—ভীষণ দারিদ্র্য,—
প্রবাসে গোবিন্দদাস।

কৈশোর কাল হইতেই গোবিন্দচন্দ্র কবিতা রচনা করিতেন। তিনি একটা স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। কবির পর্ণ-কুটীরে আমরা একবার তাঁহাকে কবিতা লিখিবার সময় দেখিয়াছি। সে সময়ের অবস্থা ঠিক বর্ণনা করা কঠিন। তাঁহার সৌম্য বদনমণ্ডলে একটা অপূর্ব্ব চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে, বোধ হয় যেন পৃথিবীর সম্পর্ক-শূন্য হইয়া তিনি কোন্ অজ্ঞাত চিন্তারাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছেন। আর অবিশ্রান্ত ভাবে তাঁহার লেখনী চলিতেছে,—কোন বাধা নাই, বিরাম নাই। নিকটে শিশুরা কোলাহল করিতেছে; সেদিকে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। যেন একটি ধ্যানমগ্ন যোগী, আপনার কঠোর যোগ সাধনে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। তখন তাঁহার বয়স ১৩ কি ১৪ বৎসর মাত্র।

গোবিন্দচন্দ্র কৈশোরে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাইবার উপায় নাই।

বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে তাঁহার প্রথম পুষ্পাঞ্জলী "প্রসূন" নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকের কথা জানিতে পারা যায়। "প্রসূন" প্রকাশিত হইলে তিনি কবি নামে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই কবিতা-পুস্তকখানিও অধুনা বিলুপ্ত। তখন গোবিন্দচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক, সবেমাত্র বিবাহ্ করিয়াছেন। প্রসূনের বিস্তারিত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই এবং দরিদ্র কবি-বিরচিত ক্ষুদ্র কাব্যখানি মুদ্রিত করিতে কে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাও বলা কঠিন। আমাদের কিন্তু অনুমান হয় যে, দানশীল রাজা কালীনারায়ণ রায়ই কবির প্রথম রচনা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

কবির পঞ্চদশ হইতে ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কোন কবিতাই আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই সময়ের ভিতর, তদানীন্তন কোন সাময়িক পত্রে তিনি লিখিতেন কি না, তাহাও জানা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

১২৮৫ সন হইতে গোবিন্দচন্দ্রের রচনা যে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার নিদর্শন আছে।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় ১২৮৫ সনের বৈশাখ মাস হইতে "বীণা" নাম্নী "নানাবিষয়িণী কবিতা-প্রসবিনী মাসিক পত্রিকা" প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরের কার্ত্তিক সংখ্যায় "একদিন" নামক কবির একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। জানি না, ইহাই মাসিক পত্রিকার অঙ্কে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা কি না?

উক্ত কবিতার বর্ণনায় ভাব ও মাধুর্য্য এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা ভারতচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোথায়ও কষ্ট-কল্পনা নাই— যেন নদীস্রোতের মত অবাধে চলিয়াছে। কবিতাটির আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একদিন।

একদিন

বিকালে বাগানে গিয়া, মৃগশিশু কোলে নিয়া,
প্রেয়সী তমালতলে রহিয়াছে বসিয়া ;
সুচিকণ কেশগুলি, সমীরণে দুলি দুলি,
অর্দ্ধ-অনাবৃত-বক্ষে পড়িতেছে খসিয়া।
আদরে ধরিয়া বুকে, লাগাইয়া মুখে মুখে,
হরিণ-শিশুর সহ গলাগলি করিয়া,
অনন্ত-অমৃত-রাশি, হাসিছে গোলাপী হাসি—
সোণামুখে,—প্রিয়তমা মন লয় হরিয়া।
প্রেয়সীর রঙ্গ দেখি, ভাবিলাম "হলো এ কি ?'
হাসি করতালি দিয়া, মুখে কথা সরে না !
নিরখি পুলক মম, জিজ্ঞাসিল,—"প্রিয়তম।
কেন আজি এত হাসি—গালে যেন ধরে না ?"
কহিলাম,—"প্রাণেশ্বরি ! লোণা জলে ভয় করি,
সাগরে থাকিতে নারি, গেল শশী বিমানে,
তা'তে আরো সর্ব্বনাশ, পোড়া রাহু করে গ্রাস,
এত যে বিপদ হবে, আগে বল কে জানে ?
শিবের ললাটদেশ, আশ্রয় করিল শেষ,
সেখানেও বিষ-বহ্নি ! তাও গেল ছাড়িয়া ;
অতি গোপনীয় স্থলে, আসিল ঘোমটা তলে
তব সেই মুখশশী !—প্রাণ নেয় কাড়িয়া !"

শ্রী :—

গোবিন্দচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রথমবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল সারদাসুন্দরী। তিনি জয়দেবপুরে বিবাহ করেন। তখন পর্য্যন্ত কবির সংসার, অশান্তির দাবানলে এবং মৃত্যুর উদ্দাম দানবী-লীলায় ছিন্নভিন্ন হয় নাই।

গোবিন্দচন্দ্র অত্যন্ত পত্নী-প্রেমিক ছিলেন। তিনি তাঁহার অমর-লেখনী দ্বারা পত্নী সারদাসুন্দরীকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত— 'প্রেম ও ফুল" এবং "কুঙ্কুম" পত্নী-প্রেমের স্মৃতিস্তম্ভ! শুনা যায়, সারদার অদর্শনে তিনি একান্তই অধীর হইয়া পড়িতেন। পত্নীর উদ্দেশে তিনি এককালে কত প্রেম-সঙ্গীতই না গাহিয়া গিয়াছেন!

সারদার পিত্রালয়, কবি-ভবনের অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল। মধ্যে একটি দীর্ঘিকার ব্যবধান। সারদা পিত্রালয়ে গেলে প্রিয়া বিরহে কবি আকুল হইয়া উঠিতেন। দীর্ঘিকার এপার হইতে কবি তাঁহার প্রিয়া-সন্দর্শন আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। কবি-প্রিয়াও ততোধিকা ছিলেন।

১৩২০ সনে একবার আমরা দাস-কবির সঙ্গে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি জয়দেবপুর দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সময়, তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাস্তুভিটা, সারদার পিতৃভবন এবং এই দুইএর ব্যবধানে যে দীর্ঘিকা আছে, তাহা দেখাইয়াছিলেন। সারদার পিত্রালয়ের সম্মুখে, দীর্ঘিকার দিকে কতকগুলি সারি সারি এরণ্ড বৃক্ষ ছিল। কবির মুখে শুনিয়াছিলাম যে, সারদা পিত্রালয়ে গেলে, কবি তাঁহার গুরুজনদিগের লজ্জায় পত্নীর সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ পাইতেন না। তখন দীর্ঘিকার এপার হইতে সারদার পিত্রালয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। যদি তাঁহার প্রিয়া মুখখানি একবার দেখিতে পান!- পত্নী সারদাও তাঁহাকে দেখিবার আশায় সেই এরণ্ড বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অবসন্ন

মত বৃক্ষান্তরাল হইতে ওপারে চাহিয়া থাকিতেন। এই ভাবে নয়নে নয়নে কবি-দম্পতি প্রেমালাপ করিতেন। পত্নী-বিয়োগান্তে কবি তাঁহার "কুঙ্কুমে" একথার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।—

"যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসনা ভত,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,
তবে কি "ভেরণ" গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে ?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার !"

উক্ত দীর্ঘিকার কথা কবির আরো অনেক কবিতায় আছে ৺রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত ১২৮৬ সনের "বীণা" পত্রিকায় কবির "ইহা কিছু নয়" নামক একটি কবিতায়ও ইহার উল্লেখ আছে।

"শারদ মধ্যাহ্ন, মাঝে শ্যামল পুকুর,
এপারে ওপারে কথা নহে বহু দূর !
দক্ষিণের মৃদু বায়ু ধীরে দিল আনি
শ্রবণে প্রতপ্ত সুরা—'জানি তবে জানি !' "

রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা' এখন দুষ্প্রাপ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকৃষ্ট কবিতাটিও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কারণ পরবর্ত্তি কালে কবির কোন কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি আর প্রকাশিত হয় নাই।

যাহা বলিতেছিলাম। সারদাসুন্দরীর গর্ভে কবির, প্রমদা ও মণি-কুন্তলা নামে দুইটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১২৮৪ সনের ১০ই ফাল্গুন প্রথম সন্তান প্রমদা ভূমিষ্ঠ হয়। প্রমদা মাত্র এক বৎসর জীবিতা ছিল। ১২৮৬ সনের ২৫শে বৈশাখ প্রমদা দাস-কবিকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করে। দ্বিতীয়া কন্যা মণিকুন্তলা প্রমদার মৃত্যুর পর ১২৮৬ সনেই জন্মগ্রহণ করে। তিনি তখনও বিদেশে বহির্গত হ'ন নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতা এবং অন্যতমা অভিভাবিকা—পিতামহী পরলোকগমন করেন। কবির মাতুলালয় ধীরাশ্রম গ্রামে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। পিতামহীর মৃত্যুর পর অন্য অভিভাবক কেহ না থাকায় কবি, স্ত্রীকন্যাসহ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেন।

রাজবাড়ীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র এমন দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিলেন যে, দিনান্তে একসন্ধ্যা আহারের সংস্থান ছিল না। তখন ভাওয়ালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। স্ত্রীকন্যাসহ অতি কষ্টে তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সে সময়কার শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি কাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন;—

"প্রিয়ে দুখিনি আমার!
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত,
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার!
শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর!"

কবির, শ্বশুরের অবস্থাও দারিদ্র্যদশাপন্ন ছিল। সুতরাং কর্ম্মহীন জীবন নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। অবশেষে অনন্যোপায় কবি, অন্ন সংস্থানের নিমিত্ত বিদেশযাত্রা করাই সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু আজকাল করিয়া দীর্ঘদিনেও গৃহত্যাগ করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ভগিনীপতি বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই (কৃপাময়ী দেবী মহোদয়ার স্বামী) তাঁহাকে বিদেশযাত্রার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু স্ত্রীকন্যা পরিত্যাগ করিয়া কখনও বিদেশে বহির্গত হন নাই; এজন্য বিষয়টি কবির নিকট নিতান্ত ক্লেশদায়ক বোধ হইতে লাগিল।

বিশেষতঃ, পত্নী সারদাসুন্দরীর বিচ্ছেদের ভয়ে কবি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া সঙ্কল্প অনুসারে ১২৮৬ সনের ৯ই পৌষ অনশনক্লিষ্ট, নিঃসহায় কবি, জয়দেবপুর হইতে পদব্রজে রওনা হইয়া বহুকষ্টে পঞ্চম দিনে ময়মনসিংহ উপস্থিত হইলেন। তখনও ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ হয় নাই। একে মানসিক সন্তাপ, তদুপরি অর্দ্ধাশন ও দীর্ঘ পর্য্যটনে কবি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়, ময়মনসিংহ নগরের একপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্রের তীরে "দেবনিবাস" নামক মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

ইঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। ভাওয়ালে অবস্থানকালীন দেবেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্রের গভীর প্রণয় জন্মে। ময়মনসিংহে উপনীত হইয়া কবি, ইঁহারই ভবনে উপস্থিত হইলেন। অনভ্যস্ত ভ্রমণে গোবিন্দচন্দ্রের পদযুগল অতীব স্ফীত হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন; পদ স্ফীতির যাতনা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল। সেই প্রবাস-জীবনের বান্ধব, উদার-হৃদয় দেবেন্দ্রকিশোরের যত্নে দুইদিন পর কবি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

তারপর কবি, যে উদ্দেশ্যে বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন, তদ্বিবরণ দেবেন্দ্রকিশোরের নিকট বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রকিশোর, কবিকে সরস্বতী পূজা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ময়মনসিংহের বিখ্যাত সারস্বত উৎসব দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। সে সময়, প্রতি বৎসর ময়মনসিংহে সরস্বতী পূজার সময় বিরাট উৎসব হইত। উৎসবে প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ, সংগীত, বক্তৃতা, শিল্পপ্রদর্শনী, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠান হইত।

সে সময় ময়মনসিংহে প্রবলবেগে সাহিত্যচর্চ্চা চলিতেছিল। তৎকালে ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারীরাও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনেকেই সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। শিক্ষা ও সাহিত্যে ময়মনসিংহ কোন দিনই পশ্চাৎপদ নহেন।

তৎকালে ময়মনসিংহে অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে সময়কার সাহিত্যিকগণের মধ্যে দীনেশচরণ বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, কালীনারায়ণ সান্যাল, অমরচন্দ্র দত্ত, জানকীনাথ ঘটক, অনাথবন্ধু গুহ, ব্রজনাথ বিশ্বাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১২৮৪ সনের বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে সারস্বত উৎসব স্থাপিত হয়। কালীকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় সাহিত্যানুরাগী যুবকগণ ইহার অনুষ্ঠাতা ছিলেন। প্রথম বৎসর উৎসবে 'হেলেনা' কাব্য প্রণেতা আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'বাণীবন্দনা" পাঠ করেন। ২য় বৎসরের উৎসবে "কুল-কলঙ্কিনী" "মানসবিকাশ" "মহাপ্রস্থান" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুকবি দীনেশচরণ বসু "মহামায়ার চিত্রপট" কবিতার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। দীনেশচরণ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি, সেকালের বিখ্যাত সাময়িক পত্র, "আর্য্যদর্শন", "বান্ধব" প্রভৃতির লেখক ছিলেন। ময়মনসিংহের সাহিত্যাকাশে দীনেশচরণ, একদা উজ্জ্বল শুক্রগ্রহের মত প্রকটিত হইয়াছিলেন।

১২৮৬ সনের সারস্বত উৎসবে দেবেন্দ্রকিশোরের অনুরোধে কবি গোবিন্দচন্দ্র, "বাণী-আরাধনা" শীর্ষক কবিতা রচনা করেন এবং দেবেন্দ্রকিশোর তাহা উৎসবের অধিবেশনে আবৃত্তি করেন। উক্ত কবিতা শ্রবণে সমাগত জনসঙ্ঘ কবির প্রতি অতিশয় মোহিত হইয়াছিলেন।

সারস্বত অধিবেশনে পঠিত গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা যে ফল উৎপাদন

করিয়াছিল, সে কথা আমরা পরে লিখিতেছি। ইতঃমধ্যে আমরা তাঁহার কবি-জীবনের একটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করিব। ১২৮৬ সনে ইহা সংঘটিত হয়। "বান্ধব" তখন পূর্ব্ববঙ্গের একখানা অতি উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্র। সেই পত্রিকায় "পরশুরামের শোণিত তর্পণ" শীর্ষক গোবিন্দচন্দ্রের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির একটি রহস্যজনক ইতিহাস আছে।

গোবিন্দচন্দ্র যখন জয়দেবপুরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন "বান্ধব" পত্রিকার জন্য একটি কবিতা রচনা করিয়া সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে অর্পণ করেন। ঘোষ মহাশয় তাহা মনোনীত করিলেন না। এই প্রসঙ্গে দাস-কবি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন ;—

"কালীপ্রসন্ন, কবিতাটি আমাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'আমার বান্ধবে ম্যাজিষ্ট্রেট্ রমেশচন্দ্র দত্ত, ডেপুটী নবীনচন্দ্র সেন, 'গ্রীক ও হিন্দু'র গ্রন্থকার প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় লোকে লিখিয়া থাকেন ; সেই বান্ধবে তাঁহাদের লেখার সঙ্গে কি তোমার কবিতা প্রকাশিত হইতে পারে ?' আমি ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে মরিয়া গেলাম, এবং মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম—আমি "বান্ধবে" লিখিতে পারি এমন শক্তি কি তুমি আমায় দিবে না? আমার জিদ্ হইল "বান্ধবে" লিখিব,—অন্ততঃ একটি কবিতা হইলেও "বান্ধবে" লিখিব। বলা বাহুল্য, ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

গোবিন্দচন্দ্র যখন ১২৮৬ সনে ময়মনসিংহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন "পরশুরামের শোণিত তর্পণ" কবিতাটি "বান্ধবের" অন্যতম লেখক, "নবপ্রবন্ধ" প্রভৃতির গ্রন্থকার, ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বারা, "বান্ধবে" প্রকাশ করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন

ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উকীল ব্রজনাথ, সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন যে, কবিতাটি তাঁহার জনৈক পরিচিত ব্যক্তির রচনা। যথাসময়ে কবিতাটি "বান্ধবে" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে, কৃপাময়ী দেবীর স্বামী, বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ভগিনীপতি) নিকট কবিতাটি গোবিন্দচন্দ্রের রচিত বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের নিকট ১২৮৬ সনের "বান্ধব" আছে, তাঁহারা উক্ত কবিতাটি অন্বেষণ করিয়া সমগ্র দেখিতে পারেন।

কবিতাটির কতক অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠক পাঠিকাগণ দেখিবেন যে, এই কবিতাটির ভাষা কেমন গৌরবময়ী ও বিশুদ্ধ। ইহাতে প্রাদেশিকতা (Provincialism) নাই। যাঁহারা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সন্দর্ভ সকল পাঠ করিয়াছেন ও তাঁহার বক্তৃতা এবং কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তিনি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন। শব্দ-সম্পদে তাঁহার ভাষা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। সাধারণ কথোপকথনেও তিনি শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার "বান্ধবে" যে সকল কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাদের ভাষা সর্ব্বত্রই পরিমার্জ্জিত ছিল। যাঁহারা পুরাতন "বান্ধবের" সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা একথা অবগত আছেন। গোবিন্দদাসের এই কবিতাটি পাঠ করিয়া অনুমান হয় যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার ভাষায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের যে সকল কবিতায় প্রাদেশিকতার আধিক্য, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সেই সকল কবিতা "বান্ধবে" পত্রস্থ করিতেন কি না সন্দেহ। নিম্নে গোবিন্দচন্দ্রের অলঙ্কারময়ী ভাষার নমুনা দেখুন ;—

সাগরের যেন নীল জলরাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
কমলার চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা,
প্রভাতী-মঙ্গল পাখীরা গাইল,
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল,
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল,
কিরণ কিরীট ভূষা।
"অদূরে হিমাদ্রি ভারত প্রাচীর,
অনন্ত আয়ত মূরতি গম্ভীর,
চেয়ে আছে যেন তুলি উর্দ্ধে শির,
সভয়ে ভূধর রাজ!
পারে না চাহিতে নিম্নে ধরাতলে,
পঞ্চরক্ত হ্রদ গর্জ্জিয়া উছলে,
সফেন-তরঙ্গ ছুটে মহাবলে,
ভীষণ ব্যাপার আজ!
প্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশ মিহির,
মহা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর,
অঞ্জলি পূরিয়ে, লইয়ে রুধির
দাঁড়ায়ে হ্রদের তীরে,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত,
ডাকিছে গম্ভীরে—পৃথিবী স্তম্ভিত,
শত মেঘমন্দ্রে নভ বিকম্পিত,
সমীর বহিছে ধীরে!"

এই কবিতা রচনার সময় গোবিন্দচন্দ্র চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক। কবিতাটির, বিষয়ের গুরুত্বের সঙ্গে ভাষার গাম্ভীর্য্য অতিশয় নিপুণতার সহিত তরুণ কবির লেখনীর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহা জয়দেবপুরে অবস্থান কালে অর্থাৎ বিদেশে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন।

এ জাতীয় গম্ভীর, মেঘ মন্দ্র ভাষায় বিরচিত এবং বিরাট দৃশ্য-জ্ঞাপক কবিতার পার্শ্বে, কবি গোবিন্দচন্দ্রের চটুল, সরল, এবং প্রাদেশিকতা পরিপূর্ণ চিত্র, ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। গোবিন্দদাস ভাষাজ্ঞানে পণ্ডিত, মনোহর শব্দ চয়নে নিপুণ ছিলেন। সর্ব্বোপরি সরল, মধুর অথচ অপূর্ব্ব ভাবরাশি কবিতায় সন্নিবেশিত করিতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। গুরু গম্ভীর কবিতার পার্শ্বে একটি চটুল অথচ মধুর চিত্র দর্শনীয়!

'আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা!
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারাদিনই খেলিস্ খালি,
মাটীর বেনুন মাটীর ভাত, হাত ধুইয়ে ফেলা!
পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে
"বৌ বৌ বৌ" খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেলা!
আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা।
আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা
"না ভাই! তুমি দুষ্টু বড়,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোম্‌টা খুলে উদ্‌লো করে ফেলা।"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসমে কারে এই এক নূতন খেলা!

* * *

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা!

"না ভাই! তুমি দুষ্ট, বড়,

একটি বলে আরটি কর,

ফাকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা।"

চুপ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে এই এক নূতন খেলা।'

ময়মনসিংহের "সারস্বত উৎসবে" পঠিত গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার প্রসঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই কবিতা পরে স্থানীয় সুবিখ্যাত "ভারত-মিহির" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘটক মহাশয় "ভারত মিহিরের" প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহের যত্নে এবং উৎসাহে তৎকালে, দুর্গাপুর হইতে "কৌমুদী" ও "আর্য্য-প্রদীপ" নামে দুইখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। তিনি একজন সাহিত্যসেবী এবং প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণ "অশ্বতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা "ভারত মিহির" পত্রিকায় দাস-কবির কবিতা পাঠ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি কবির অনুসন্ধান করেন। এবং কবির নিরন্ন অবস্থার কথা অবগত হইয়া, সুসঙ্গের কবি রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর দ্বারা, গোবিন্দচন্দ্রের নিকট পত্র লিখাইয়া, তাঁহাকে দুর্গাপুর যাইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র তখন কর্ম্মপ্রার্থী; সুতরাং এই সূত্রে সুসঙ্গ যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

সুসঙ্গ যাইবেন কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ বেশ। জন্মভূমি জয়দেবপুর হইতে জীর্ণবেশে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং তখনো ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেছিলেন। অর্থাভাবে পরিধেয় বসনের তখনকার অবস্থায়, কবিকে নিতান্ত কাঙ্গালের মত দেখাইত। কবির মুখে শুনিয়াছি যে, দেবেন্দ্র-

কিশোর দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে "একটি পিরাণ, একটি আলপাকার কোট ও পরিধেয় ধুতি চাদর" ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

অতঃপর, ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে দাস-কবি দেড়দিন পর, সুসঙ্গের রাজধানী দুর্গাপুর উপস্থিত হইলেন। ১২৮৬ সনের মাঘ মাসে কবি সুসঙ্গে গমন করেন।

কবির আগমনে মহারাজা কমলকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ-চিকিৎসক কৃষ্ণগোবিন্দের বাসায় তাঁহার শয়ন ও বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজভবন হইতে তাঁহাকে আহার্য্য সরবরাহ করা হইত। কিছুদিন গত হইলে, মহারাজা তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে তাঁহার খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বতন খাজাঞ্চি তখন রোগশয্যায় এবং অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। অবশেষে গোবিন্দচন্দ্র উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। ভৈরবচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক ভদ্রলোক তখন সুসঙ্গরাজের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের এই সর্ব্বপ্রথম বিদেশে আগমন। কিন্তু, কি অসীম কষ্টে যে, তিনি স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহার আভাস "চাকরি করিতে যাই" নামক কবির প্রাণস্পর্শী সুদীর্ঘ কবিতা পাঠে উপলব্ধি হয়।

এই দুঃখময় সংসারে অন্ন-সংস্থান একটি মহাগুরুতর সমস্যা। মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকতা বাঁচিয়া থাকা। দারুণ উদরের জ্বালায় কত গৃহে হাহাকার,—নয়নে জলধারা, দম্পতির বিচ্ছেদ, কে তাহার অনুসন্ধান করে?

জীবনের এইরূপ যন্ত্রণাময় অবস্থায় পতিত হইয়া প্রবাস গমনোন্মুখ কবি লিখিলেন "চাকরি করিতে যাই।" ইহাতে দরিদ্র কবির তৎকালীন অবস্থান্তরের চিত্র বিকশিত হইয়াছে। তিনি লিখিলেন,—

" 'যেওনা যামিনি আজি'—হয়োনা প্রভাত,
কি বলিব মাথা মুণ্ড ছাই ভস্ম আর,
হৃদয়ে দারিদ্র্য দুঃখ শক্তি শেলাঘাত,
করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার।
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন,
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরমমূল করি বিধুনন,
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত।
উঠিলে ভাস্কর খুলি পূর্ব্বাসার দ্বার
গ্রাসিবে জীবন 'অন্ন চিন্তা চমৎকার!' "

তারপর, নিরন্ন জীবন-কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কবিতার উপসংহারে কবি তাঁহার স্ত্রীর কাছে বিদায় মুহূর্ত্তে কি বলিয়াছিলেন, তাহা অনুভবনীয় বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার
অনলে কুসুম ভস্ম দেখিব না আর।

* * *

কত কষ্ট দিয়াছি যে জীবনে তোমার
যাই প্রিয়ে, সে সকল করিও না মনে,
জানি আমি এ জীবনে ক্ষমা নাই তার
চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে।
যাইরে অবোধ শিশো!—হে করুণাময়,
দীনবন্ধো! বাঁচাইয়ো এ দীন সন্তান,
স্বর্গের করুণা তব চির সুধাময়,
রাখে যেন অভাগিনী দুঃখিনীর প্রাণ!

এমন আত্মীয় নাই একজন আর
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার !"

তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন বলিয়াই ভাওয়াল-রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণসমা প্রেয়সী ও শিশু কন্যাকে অনায়াসে ছাড়িয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব এইখানেই বিকশিত হইল।

প্রবাসে বহির্গত হইয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

"পৃথিবি !
কতদিন, কত দণ্ড মাস পক্ষ বার,
ভ্রমি নিত্য অবিরত, বৎসর করিলে গত
আপনার কক্ষপূর্ণ করিলে তোমার !
কত শত্রু অহরহ, কত গ্রহ উপগ্রহ
শত্রুতা করিয়াছিল সংখ্যা নাহি তার।
তুমি তাহা তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাত পানে,
চলিয়াছ আপনার পথে অনিবার।
নিত্য বুকে উল্কাপাত, নিত্য বুকে বজ্রাঘাত
পুড়েছে ভেঙ্গেছে বুক বটে শতবার,
তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি তোমার !

* * * *

আমিও তোমার মত, জীবন করিব গত
ভ্রমিব সংসার মাঝে অবলম্বহীন,
তোমারি মতন হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায়
আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন !

বিপদেরে তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাত পানে
সাধিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাঁচি যতদিন
হোক্ না সংসার শূন্য অবলম্বহীন ?”

প্রকৃতই উপরোক্ত আদর্শে গোবিন্দদাস আজীবন অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং এই আদর্শ হইতে জীবনে কখনও বিচ্যুত হন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

কর্ম্মজীবনের প্রভাত।

শীতকালে গোবিন্দচন্দ্র সুসঙ্গে আগমন করিলেন। সে সময় তথাকার জলবায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ। নূতন স্থানে আসিয়া কবিজনোচিত মনোরম প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে তাঁহার চিত্তও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুসঙ্গ দুর্গাপুরে রমণীয় পার্ব্বত্য দৃশ্য প্রকটিত। সে দৃশ্যে ভাবুকের মন বিমোহিত করে। চারিদিকে গভীর শৈল-বনানি সকল, কত যুগ যুগান্তকাল ব্যাপিয়া যেন নির্ণিমেষ নয়নে দুর্গাপুরের দিকে চাহিয়া জাগ্রত প্রহরীর মত তাহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আবার, স্থানে স্থানে নির্ঝরিণীর মৃদু-মধুর জলকলরবে এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গমের কলকাকলীতে অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

দূরে দূরে তুঙ্গশীর্ষ গাঢ় নীল গারো গিরি, যেন ধ্যাননিরত মহাযোগীর মত, অনন্ত গগনের গায় মিশিয়া, অনন্তকাল মহাযোগে নিমগ্ন রহিয়াছে।

দুর্গাপুরের পশ্চিম পার্শ্বদেশ দিয়া, গিরিনদী সোমেশ্বরী কলধ্বনি করিতে করিতে খরবেগে প্রবাহিতা হইতেছে। দুর্গাপুর স্বভাব-কবির অতি যোগ্যস্থান হইলেও, মন্দভাগ্যের আকর্ষণে কবি গোবিন্দচন্দ্র তথায় দীর্ঘদিন তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

সুসঙ্গের নৈসর্গিক দৃশ্য যেমন নয়নাভিরাম, তথাকার রাজন্যবর্গের অন্তঃপ্রকৃতিও ততোধিক মনোমুগ্ধকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের হৃদয় যেন বন্যকুসুমের সুরভি ও সুষমা দিয়া মণ্ডিত। একালের অনেক সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী লোকের হৃদয়ে মানবোচিত নানা সদ্‌গুণ একাধারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুসঙ্গের ভূম্যধিকারিগণের প্রসঙ্গে, কবি গোবিন্দচন্দ্র আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন ;—

"বড় মানুষের এমন বিনয় নম্রতা, এমন সরল শিষ্টাচার, অভ্যাগতের প্রতি এমন আদর অভ্যর্থনা বড় শোভনীয় ও লোভনীয়। ৩০।৩৪ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজা জমিদার বংশ প্রায় সকলেই সূর্য্যবংশীয় ছিলেন ; বিনয় নম্রতায় তাঁহাদের সম্মান 'দহ' পড়িত। কিন্তু সুসঙ্গের মহারাজারা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে বিষয় সম্পত্তির সহিত সৌজন্য ও সহৃদয়তা উত্তরাধিকার লাভ করিয়া আসিতেছেন।"

কবি গোবিন্দচন্দ্র সুসঙ্গে আসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইলেও, প্রাণের ভিতর অনাবিল শান্তি পাইলেন না। প্রিয়তমা পত্নী সারদাসুন্দরীর প্রেম-স্মৃতি, তাঁহাকে অবিরত দগ্ধ করিতে লাগিল। সুসঙ্গে বসিয়া সে কথা তিনি কবিতায় লিখিলেন ;—

"এ দূর পর্ব্বত-দেশে, এ বিজন বনবাসে,
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে,
আকুল হৃদয়ে দেখি—শশী অস্ত যায়।"

প্রেম-বেদনায় প্রপীড়িত কবি আবার লিখিলেন ;—

"আজ— এই যে পর্ব্বততলে এই গারো দেশে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে!

আসিয়াছি দেশ ছাড়ি, তথাপি তিষ্ঠিতে নারি,
সেই মোহ—সেই মূর্চ্ছা স্বপন আবেশে!"

এভাবে কতক দিন গত হইলে তাঁহার অন্তরে বিরহের অনলরাশি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি নির্ব্বাসিত যক্ষের মত মেঘের কাছে প্রেম নিবেদন না করিয়া, প্রাণের অপরিমেয় দুঃখে নিজের উপর অভিমান করিয়া চন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া লিখিলেন,—

"সুবিশাল গারো গিরি অই যে উত্তরে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভর দিয়া, উঠিয়াছে দাড়াইয়া,
উন্নত-ললাট গিয়া ঠেকেছে অম্বরে,
উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে ঊর্দ্ধমুখে,
কতই সান্ত্বনা পাই, প্রাণ যেন ভরে।

* * *

পর্ব্বত পার্থিব প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন,
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন!
এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তারি—দেশ তারি,
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন।
নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়া বন্ধ,
রমণীর রূপ গন্ধ করে না গ্রহণ!
অই পর্ব্বতের মত, প্রেম তৃষ্ণা অবিরত
শশাঙ্ক! আমারো প্রাণে জাগিছে এখন।"

অশান্তির আগুন বুকে বহিয়া, বিরহবিধুর কবি গোবিন্দচন্দ্র, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোমেশ্বরী নদীর নির্জ্জন তীরে একাকী বসিয়া, বিষণ্ণ হৃদয়ে, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

কবির সম্মুখে গিরিনদী সোমেশ্বরী প্রবাহিতা, দূরে আকাশের গায়

নীল গারো গিরি মিশিয়া রহিয়াছে! পশ্চিম দিগন্তে বিলুপ্তপ্রায় তপনের শেষ রশ্মিরেখা ক্রমেই মিলাইয়া যাইতেছে! ঊর্দ্ধে সুনীল গগন কবির দুঃখে ব্যথিত হইয়া মলিন হইতেছে! আর, সোমেশ্বরী তাহার মৃদু মৃদু জল-ভঙ্গরবে কবির হৃদয়-বেদনা লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছে! সন্ধ্যার পবন, কবির চিন্তা-দগ্ধ-ললাটে স্নিগ্ধ চুম্বন দিয়া যাইতেছে! কিন্তু হায়! ইহাতেও কবির অশ্রু সম্বরণ হয় নাই। সোমেশ্বরীর প্রাণারাম কল্লোল-গানে গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণের পিপাসা মিটে নাই।

তাই, তিনি স্বীয় দুঃখের কাহিনী করুণ ভাষায় বর্ণনা করিলেন ;—

"এই যে পর্ব্বত পাদ ধৌত সোমেশ্বরী,
বহিতেছে মৃদুমন্দ কল কল করি!
বসিয়া ইহার তীরে, ভাসিতেছি অশ্রু নীরে,
সেই সন্ধ্যা এই, সেই আসন্ন-শর্ব্বরী,
সরল শশাঙ্ক সেই শিশু কোলে করি!
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এ অসভ্য গারো দেশে,
দূর দেশান্তরে হায় রহিয়াছি পড়ি,

* * *

কই সে শ্যামল সন্ধ্যা বাসন্তী শর্ব্বরী?
সেই আমি আছি, সন্ধ্যা তেমনই আছে,
তেমনি কৌমুদীময়ী নিশি অমলিন,
তেমনি শশাঙ্ক হাসে, তারা বেড়া নীলাকাশে.
কৌমুদী উছলে' পড়ে নদীর পুলিন,
তবু নাই সে মাধুরী, চখে দেখা প্রাণ চুরি,
নয়নে রাখিয়া সেই নয়ন মলিন!
সেই একদিন আর এই একদিন।"

সময় চলিয়া যায়, কাহারও সুখ-দুঃখে ভ্রূক্ষেপ করে না, কেহ বাধাও দিতে পারে না। মানুষের কি সম্পদে কি বিপদে সময় অটল ও অবিচলিত ভাবে বহিয়া যাইতেছে।

শীতকাল চলিয়া গেল। মদন-সহচর বসন্তও দুর্গাপুরের বনে বনে তাহার ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের উন্মাদ-লীলা সাঙ্গ করিয়া অন্তর্হিত হইল। নিদাঘও যায় যায়। এ সময় সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

তখন দুর্গাপুরে জ্বরের প্রাদুর্ভাব। দেখিতে দেখিতে দারুণ জ্বর আসিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। এবং তাঁহার সর্ব্ব শরীরে কতকগুলি স্ফোটক দেখা দিল। ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া কবি নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে বিদেশে আসিয়া নিয়তির যুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র পরাস্ত হইলেন।

দুর্গাপুরের মত দুর্গম প্রবাসে স্বভাবতঃই আগন্তুকের মানসিক বিপর্যায় ঘটে। কবি গোবিন্দদাসেরও সেই দশা ঘটিল। বহুদিন দেশত্যাগ না করিলেও, জীবনে এই প্রথম বিদেশে বহির্গত হইয়া প্রেমময়ী পত্নী ও শিশু কন্যার বিরহ, তাঁহাকে আকুল করিল। তদুপরি দৈহিক অসুস্থতায় তাঁহার চিত্ত-সন্তাপ দ্বিগুণীকৃত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন কত দীর্ঘকাল তিনি প্রবাসী। হয়ত বা আর প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হইবে না। তৎকালীন মনের ভাব তিনি এই ভাবে প্রকাশ করিলেন ;—

"এই সেই শীতকাল, কে জানে কোথায়
ভগ্ন আশা ভগ্ন প্রাণে, চলিয়াছি কোন্ খানে,
কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায়!
আমিই জানি না, আমি চলেছি কোথায়?

ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক দেশে দেশে,
দেখি না সে মানময়ী সোনার নলিন!
সেই একদিন আর এই একদিন।"

সুসঙ্গে আর কিছুতেই তাঁহার মন তিষ্ঠিল না। মহারাজা তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অস্থির হইলেন। তিনি একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন;—"কিছুতেই আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। মনে হইতে লাগিল, আর কিছুদিন এখানে থাকিলে মারা যাইব।"

ইতোমধ্যে তিনি ময়মনসিংহের উকীল ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট অসুস্থ অবস্থার কথা পত্র লিখিয়া জানাইলেন। পত্রোত্তরে বিশ্বাস মহাশয়, তাঁহাকে তন্মুহূর্ত্তে সুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি মহারাজার নিকট তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কথা নিবেদন করিয়া, কার্য্য হইতে অবসর প্রার্থনা করিলেন। অগত্যা মহারাজা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে গোবিন্দচন্দ্রকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

বর্ষাকালে, নৌকা-পথে গোবিন্দদাস সুসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তখন সোমেশ্বরীর বিভিন্ন মূর্ত্তি,—পূর্ণ যুবতীর মত সর্ব্বাঙ্গে রূপ রাশি উথলিয়া পড়িতেছিল। বর্ষার দুর্দ্দমনীয় জলপ্রবাহ দুই তীর প্লাবিত করিয়া অধীরে ছুটিয়াছিল এবং সোমেশ্বরীর সুমধুর জল-কল-স্বরে আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছিল। নদীবক্ষে নৌকায় বসিয়া সুসঙ্গের শেষ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কবি গোবিন্দচন্দ্র বিদায় হইলেন। তাঁহার বেদনা-নিপীড়িত কবি-হৃদয় হইতে যেন একটা গুরুতর বোঝা নামিয়া গেল। নিঃসঙ্গ কঠোর প্রবাস-যন্ত্রণা তিনি বিস্মৃত হইলেন।

সুসঙ্গ-প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র একবার আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন;—

"সুসঙ্গ দুর্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। নদী ও পর্ব্বতে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, প্রকৃতি কি পরম রমণীয় শোভাই ঢালিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত। নদী বহিয়া, পর্ব্বত ভাসাইয়া, আকাশ পাতাল ডুবাইয়া যেন সে শোভার বন্যা ছুটিয়া চলে। আমি, সেই রুগ্নদেহেও অনেক সময় তাহাতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতাম। সেই অনাদি অনন্তের আদ্যন্ত অন্বেষণে, কি এক বিপুল বিশাল উদাস আত্মহারা আনন্দে, আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতাম। আমার ক্ষুদ্র প্রাণে, সে ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ডোবা ভাবের স্থান কুলাইত না।"

গোবিন্দচন্দ্র সুসঙ্গে অবস্থানকালীন বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি অদ্যাপি অমুদ্রিত, এবং কতকগুলি ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণায়" প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে "গুরুগোবিন্দ সিংহ" অন্যতম, এবং উৎকৃষ্ট কবিতামালার পর্য্যায়ভুক্ত সন্দেহ নাই।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর পরিত্যাগ করিয়াও গোবিন্দচন্দ্র জীবনের আর একটা গুরুতর ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহার অব্যবস্থিতচিত্ততার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার জীবনের কাহিনী আলোচনা করিয়া, অনেক সময় আমাদের মনে হয় যেন তিনি জীবনের দুঃখকে কতক পরিমাণে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

মন সংযত করিয়া সুসঙ্গে অবস্থান করিলে, তিনি হয়ত পরবর্ত্তী জীবনের নানাবিধ যাতনার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্নকষ্টও বিদূরিত হইত।

১২৮৭ সনের আষাঢ় মাসে, গোবিন্দচন্দ্র সুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ আগমন করেন। স্থান পরিবর্ত্তনে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইল। তিনি অচিরে রোগমুক্ত হইলেন।

কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়া থাকিলে অন্নের সংস্থান হয় না, কাজেই

আবার চাকরির চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার হিতৈষী বান্ধব, উকীল ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়, মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর সঙ্গে কবির পরিচয় করাইয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্র, একজন বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কবি গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সাহস অপরিসীম এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ছিল। তৎকালে, ময়মনসিংহে তাঁহার তুল্য তেজস্বী এবং প্রতিভাবান জমিদার আর কেহ ছিলেন না। তিনি গভীর জ্ঞানী ছিলেন। কোন স্কুলে অধ্যয়ন না করিয়া তিনি, নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখিয়া, অধ্যবসায় বলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ময়মনসিংহে ওকালতী করিতেন। ময়মনসিংহের ব্যবহারজীবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রত্যেক সভা সমিতি এবং দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দিতেন। ময়মনসিংহের যে কোন শুভ কার্য্যে তিনি অনুষ্ঠাতা হইতেন। কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহের জমিদারবর্গেরও নেতা ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার ভবনে ময়মনসিংহের শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইত। বিদেশ হইতে কোন প্রসিদ্ধ লোক ময়মনসিংহে আগমন করিলে, তিনি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিতেন।

তিনি অতি হৃদয়বান লোক ছিলেন। দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিত না। তিনি উপাধি-ব্যাধি-প্রপীড়িত ছিলেন না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি "কেশব মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার অতি উদার মত ছিল। তিনি জাতিবর্ণ

নির্ব্বিশেষে গুণের সমাদর করিতেন। তাঁহার অন্তরে জাতিগত বিদ্বেষ ছিল না।

কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সহিত পরিচিত হইলে তিনি কবিকে সস্নেহে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাবলী পাঠ করিয়া কবির গুণমুগ্ধ হইলেন। উকীল ব্রজনাথ বিশ্বাসের নিকট কবির নিরন্ন অবস্থার কাহিনী শুনিয়া, তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল এবং একটি চাকরি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কবির সঙ্গে পরিচয়ের প্রায় এক সপ্তাহ পর, তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য উকীল ব্রজনাথ বিশ্বাসকে এক পত্র লিখিলেন। জমিদার কেশবচন্দ্র তখন ভৈরববাজার রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে জানাইলেন যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সঙ্গে ভৈরববাজার রওনা হইতে হইবে। যথাসময়ে আসিয়া দাস-কবি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে বজরা বাঁধা ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কবি, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নদীপথে ভৈরববাজার যাত্রা করিলেন।

শ্রাবণ মাস,—বর্ষা শেষ হয় নাই। উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে বর্ষার ব্রহ্মপুত্র ভীষণ গর্জ্জনে, উদ্দাম দানবের ন্যায় ছুটিতেছিল। কোথায়ও ভীষণ আবর্ত্ত, কোথায়ও প্রবল জলস্রোত। নদীর সেই প্রচণ্ড প্রবাহের মুখে জমিদার কেশবচন্দ্রের বজরা উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিল।

শুক্লপক্ষ। নীলাকাশে চন্দ্র ব্রহ্মপুত্রের দিকে চাহিয়া নিথর হইয়া বসিয়াছিল। গলিত রজতের ন্যায়, ব্রহ্মপুত্রের জলস্রোত, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। চারিদিকে জ্যোৎস্নার অমৃতলহরী আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছিল। মাঝে মাঝে ছিন্ন মেঘখণ্ডগুলি বায়ুতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চন্দ্রমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিতেছিল, এবং প্রকৃতিসুন্দরীকে ক্ষণ-

তরে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় দেখাইতেছিল। আলো আঁধারের এই অভিনয় এবং জলপথের এই অপূর্ব্ব নৈশবিহার, কবি-হৃদয়কে একেবারে আকুল করিয়া দিল। নৈশপ্রকৃতির সেই মনোহর দৃশ্যে, কবি তন্ময় হইয়া রহিলেন।

জমিদার কেশবচন্দ্র বজ্‌রার ছাদে বসিয়া, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে দাবা খেলিতে লাগিলেন এবং দাস-কবিকে মাঝে মাঝে ভাওয়ালের রাজ্যসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই রাত্রি নদীবক্ষে অতিবাহিত হইল। পরদিন তাঁহারা 'বাজিত-পুর' অতিক্রম করিয়া 'বড়হাওর' নামক এক প্রকাণ্ড 'বিলে' আসিয়া পড়িলেন। বর্ষাকালে সেই 'বিলের' শোভা অপরূপ, অনন্ত নীল সাগরের ন্যায় তাহার নীলজল দূরে দূরে দিগ্বলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মৃদু পবন হিল্লোলে বিলের জলরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে। সন্ধ্যাকালে 'বিলের' দৃশ্য আরো রমণীয়—নানা স্থানে সবুজ শস্যক্ষেত্রের উপর সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া সবুজ ঢেউ খেলাইয়া যায়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে সেই দৃশ্য দ্বিগুণতর হইয়া উঠে। সচন্দ্র আকাশের ছায়া শস্য-ক্ষেত্রের অবকাশের ভিতর দিয়া জলে নিপতিত হয়। দেখিতে দেখিতে আকাশের চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি ঢেউয়ে ঢেউয়ে সহস্র খণ্ড হইয়া জলতলে জ্বলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মধুর, জলসিক্ত, স্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে দর্শকে মন-প্রাণ এক অজ্ঞাত স্বপ্নময় রাজ্যে প্রয়াণ করে।

সেই অসীম সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া নৌকাপথে কবি গোবিন্দদাস "বরষার বিল" রচনা করেন। কবির মুখে শুনিয়াছি যে, সেই 'বিলের' দৃশ্য অবলম্বনে কবিতা রচনা করিতে তাঁহাকে জমিদার কেশবচন্দ্র অনুরোধ করিয়াছিলেন। "বরষার বিল" পরবর্ত্তী কালে "প্রেম ও ফুলে" সন্নি-

বেশিত হইয়াছে। কবির অপূর্ব্ব বর্ণনা শক্তির কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেমন সরল ভাষা, তেমনি বর্ণনার নৈপুণ্য। একটি উদাহরণই যথেষ্ট ;—

"বরষার বিল,—

এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ
অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল ;
পানা, জল, ঘাস, গাছে, কত কি মাধুরী আছে
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল!
ডাকে জলচর পাখী, দাম দলে থাকি থাকি
এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল ?
সুনীল লহরী তুলি, নাচাইছে দুলি দুলি
সন্ধ্যার শীতল অই মলয় অনিল,
নূতন সলিলে ভরা বরষার বিল।
সন্ধ্যার ললাটে হাসে অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ এক
রজত সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক!
ঘাসের ছায়ার গায়, কুমুদী হারায়ে যায়—
সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক!
কি সুন্দর লুকোচুরি, জানে এ কুমুদী ছুঁড়ী
সগে সগে থেকে ধরা দেয় না বারেক!
শুয়ে থাকে সন্ধ্যা রে'তে, কৌমুদী কুমুদ পাতে—
ঝোপে ঝাপে, ধানক্ষেতে ঠিক নাই এক!
এ সামান্য বিছানায়, ও কম কিরণ কায়
নয়ন ভুলিয়া থাকে দেখিলে বারেক!
দেখিনি এমন শোভা—দেখেছি অনেক!"

জমিদার কেশবচন্দ্রের সমভিব্যাহারে কবি গোবিন্দচন্দ্র ভৈরববাজার উপস্থিত হইলেন। প্রায় তিনমাস কাল তথায় অবস্থানের পর, আশ্বিন মাসে পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জমিদার কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহের একজন ভূম্যধিকারিণী রামসুন্দরী দেবীর জমিদারী "ইজারা পত্তন" লইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১২৮৭ সনের ১লা আশ্বিন কেশবচন্দ্র দাস-কবিকে সেই জমিদারীর কার্য্যকারকরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি "জমা সেরেস্তায়" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পর ১২৮৮ সনের শ্রাবণ মাসে তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং তিনি "মুন্সী" পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যকালে তাঁহাকে ময়মনসিংহে অবস্থান করিতে হয়। আহারের ব্যয়ভার জমিদার বহন করিতেন। প্রায় তিন বৎসর তিনি কেশব চন্দ্রের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি অধুনাবিলুপ্ত "বীণার" জীর্ণপত্রপুটে আবদ্ধ রহিয়া বিস্মৃতির গর্ভে মিলাইয়া যাইতেছে। তৎকালে বিরচিত "ফুলুরী বেগুণ", "ছানা" প্রভৃতি কবিতা এখন আর সহজে পাইবার উপায় নাই।

কেশবচন্দ্রের কার্য্যকালে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু, প্রবাসে অবস্থানের দরুণ পত্নী সারদাসুন্দরী ও কন্যা মণিকুন্তলার বিরহ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। পরের চাকরি করিতে যাইয়া ঘন ঘন পত্নীর সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

জমিদার কেশবচন্দ্র অত্যন্ত শিকারপ্রিয় এবং নিজে একজন ভাল শিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সে আসাম প্রদেশে হাতীর খেদা ছিল। তিনি হাতী, বাঘ, বন্যমহিষ, হরিণ এবং কোড়া প্রভৃতি জলচর পক্ষী শিকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্তের জমিদারীর অন্তর্গত সোনাথালী মল্লিকবাড়ী পাহাড় নামক স্থান আছে। তাহা গভীর অরণ্যময় এবং নানাজাতীয় বন্যজন্তু সমাকীর্ণ। ঐ স্থান ময়মনসিংহ নগর হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। জমিদার কেশবচন্দ্র প্রতি বৎসর ঐ স্থানে শিকার করিতে যাইতেন। ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সনে জমিদার কেশবচন্দ্র তথায় কবি গোবিন্দদাস সমভিব্যাহারে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ১২৮৮ সনে কেশববাবুর চেষ্টায়, কবি গোবিন্দচন্দ্র বন্দুকের গুলিতে একটি ক্ষুদ্র হরিণ শিশুকে বধ করেন। তখন মৃত শাবকটিকে দেখিয়া তাহার মাতা অদূরে অরণ্যপ্রান্তে অতি অস্থির ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। তদ্দর্শনে কবির হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হয়। উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি চিরদিনের জন্য মাংসাহার পরিত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্বে কবি গোবিন্দচন্দ্র মাংস ভক্ষণের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। জমিদার কেশবচন্দ্রের শিকারলব্ধ অপর্য্যাপ্ত মাংসপ্রাপ্তি ইহার কারণ বলিয়া অনুমান হয়।

তাঁহার রচিত কবিতাবলীর মধ্যে "শিকার" নামধেয় একটি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৯৪ সনের "নবজীবন" পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হয়। শিকারে সংশ্লিষ্ট থাকিবার ফলে ঐ কবিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু রচনার উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম।

আমরা কবিতাটির প্রসঙ্গে দুই চারিটি কথা না লিখিয়া পারিলাম না। কারণ "শিকার" কবিতাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে জাতীয় স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত সামান্য রূপকচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে। আমরা কবিতার মর্ম্মার্থ নিম্নে লিখিলাম।

মানুষ অন্যায় রূপে জগতে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া একদিন হাতীর পিঠে চড়িয়া গভীর দুরতিক্রম্য বনের ভিতর

প্রবেশ করিল। সে বনের অধিরাজ ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ব্যাঘ্র। সে মনের সুখে ও স্বচ্ছন্দে অনন্ত কাননে বহুকাল একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। বনভূমি রাজার যোগ্য সাম্রাজ্য। প্রকৃতিদেবীই রাজার ঐশ্বর্য্যের সরবরাহ করিতেন। উচ্চ পাহাড় তাহার সিংহাসন, লতাকুঞ্জ তাহার শয়ন-মন্দির ছিল। বন্য বিহঙ্গেরা সুকণ্ঠে দিগন্ত পরিপূরিত করিয়া রাজার চিত্ত বিনোদন করিত। সমীরণ তাহার ক্লান্তি অপনোদন করিত।

রাজার অসীম প্রতাপ; তাহার গভীর গর্জ্জনে বনপ্রদেশ বিকম্পিত হইত এবং তাহার ভীষণ নখর ও বজ্রসম দন্তচয় অস্ত্রের কাজ করিত। দুর্জ্জয় সাহসে, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, ব্যাঘ্র প্রকৃতই কাননের অধীশ্বররূপে বিরাজিত ছিল।

মানুষ বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বরাহ, ভল্লুক, বন্যমহিষ প্রভৃতি রাজার সেনাসমূহকে একে একে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিনাশ করিল। অবশেষে রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।

শার্দ্দূলরাজ মানবের আহ্বানে বিচলিত ও ভীত না হইয়া সদর্পে প্রত্যুত্তর করিল,—"ওহে ক্ষুদ্র মনুষ্য! তুমি কি মনে কর, আমি তোমার আগ্নেয়াস্ত্র ভয় করি? প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান যে আত্মসম্মান ও জাতীয় মান এবং স্বাধীনতা, তাহা কখনই আমার প্রাণ থাকিতে তোমার গ্রহণ করিবার সাধ্য নাই জানিবে। পশুর অধম বিশ্বাসঘাতক হস্তী তোমার বশ্যতা স্বীকার না করিলে এবং পিঠে করিয়া না আনিলে, এই দুর্গম কাননে তোমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে প্রবেশ করা একান্ত অসাধ্য ব্যাপার ছিল সন্দেহ নাই। তুমি কখনই মনে ভাবিও না যে, হস্তী তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে বলিয়া এই বনস্থলী বীরশূন্য হইয়াছে। এস, তোমার বীরত্ব প্রদর্শন কর! তোমার আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া

দেখ, এই বজ্রকঠোর বক্ষে কত বল ধরে। তোমার অহঙ্কার আমার স্বাধীন হৃদয়ে অসহনীয়। আমার ভীষণ নখরাঘাতে তোমার বুক চিরিয়া আকণ্ঠ রক্ত পান করিব।"

একথা শুনিয়া মানুষ আর কালবিলম্ব না করিয়া, ব্যাঘ্রের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার বিনিময়ে সে প্রাণত্যাগ করিল।

কবিতার উপসংহারে গোবিন্দচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—

"এ কি এ মুহূর্ত্তে হায়, দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ণ বক্ষে মৃতের আকার,
বীরেন্দ্র শার্দ্দূলরাজ, এত যে অযত্নে আজ,
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার?
হা হৃদয় কি অজ্ঞান, এই আত্ম বলিদান,
এই আত্মবধ চিত্র দেখি পুনর্ব্বার,
সমাহিত স্মৃতি-রোগ জাগা'লে আবার!"

কবিতাটির নাম "শিকার" হইলেও ইহার মেরুদণ্ডে প্রবল দেশাত্ম-বোধ বিদ্যমান। কবি গোবিন্দদাসের শিকার-সম্পর্কীয় আর কোন কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না।

গোবিন্দদাস একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন বলিয়া জমিদার কেশবচন্দ্র তাঁহাকে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতেন, এবং এইজন্যই শিকার করিতে যাইয়াও কবিকে সঙ্গে লইতেন। নতুবা তিনি সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জমিদারের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। কবি বলিয়া গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে 'কেশব মহারাজ' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহার করিতেন।

জমিদার কেশবচন্দ্রের চাকরি করিবার সময় ১২৮৮ সনে গোবিন্দচন্দ্র "মণিকুন্তলা" শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। ইহাতে কবির প্রবাস-জীবনের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না,—কবিতাটি এতদূর অনুভূতি উদ্দীপক। দুই বৎসরের শিশু-কন্যা মণি কুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন ;—

"সাধে কিবে ফুল-শিশু আছি তোরে ভুলিয়া ?
কোলে কোলে, বুকে বুকে,
রাখিতাম কত সুখে,
গলা ধরা হাত তোর কি করিয়া খুলিয়া,—
কি পোড়া অদৃষ্ট ফলে,
ঠেলে ফেলে ভূমিতলে
হৃদয়ের মণি তোরে, আসিয়াছি চলিয়া,
কি করিয়া ফুল-শিশু আছি তোরে ভুলিয়া !"

কথাগুলির মধ্যে পিতৃহৃদয়ের এমন একটা আন্তরিকতা এবং কোমলতা আছে, যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মনের অনুভূতি এখানে অবলম্বন। পিতার হৃদয়-বেদনা এমন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কয়জন কবি বর্ণনা করিয়াছেন ?

তারপর কবি মণিকে বলিতেছেন,—

"ভুলিনু যদিও—তবু ওরে মণিকুন্তলা,
অধিক যতনে তোরে
রাখিবেক বুকে ক'রে,
আদরে জননী তোর অভাগিনী অবলা।

*   *   *

তুই বিনে কেহ নাই,—অনাথিনী সরলা।
পামর পাষণ্ড অতি
ছাড়িয়া গিয়াছে পতি,
দিবানিশি বিষাদিনী অশ্রুমুখী অবলা;
মা বলে ডাকিস্ আহা বাঁচাইতে সবলা!"

* * *

কবির পত্নী-প্রীতি ও সন্তান-বাৎসল্য কি অপরিমেয়!

১২৮৯ সনের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত তিনি ময়মনসিংহে জমিদার কেশবচন্দ্রের চাকরি করেন। কেশবচন্দ্র দরিদ্র কবিকে দয়াগুণে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু নানা কারণে বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্র কবিকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমরা আর বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাও গোবিন্দচন্দ্রের স্বকৃত-কর্ম্মফল। তাঁহার সমগ্র কর্ম্মজীবনটা নিষ্ফলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের জমিদারীর বর্ত্তমান প্রধান কার্য্যকারক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ সরকার মহাশয় কবি-প্রসঙ্গে আমাদিগকে ১৩২৫ সনের ৭ই চৈত্র লিখিয়াছিলেন;—

"কবির অন্য কোন বিবরণ আমার জানা নাই। লোকটি অতি চাপা স্বভাবের ছিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিচয় অনেকদিন জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই,—কেবল চাপা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা জানি না। কোনস্থলেও প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি নিতান্ত উন্মনস্ক ও উড়া উড়া ভাবের লোক ছিলেন। কেশববাবুর মত দয়ালু লোকের নিকট তিনটি বৎসর কার্য্য করিতে পারেন নাই।"

অতঃপর কবি ১২৮৯ সনের ভাদ্র মাসে ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া

জন্মভূমি জয়দেবপুরে চলিয়া আসিলেন। ঠিক এই সময় তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। "কস্তুরী"তে এই "বিদায়" শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। তারিখ দেখা যায় "৮ই ভাদ্র ১২৮৯ সন, ব্রহ্মপুত্র নদ।"

কবিতা রচনার কালদৃষ্টে এইরূপ অনুমান হয় যে, ময়মনসিংহ পরিত্যাগের পর নদীবক্ষে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এই সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর জানিতে পারি নাই। জানিবার কোন উপায়ও নাই। কবিতায় এই ভাবে আরম্ভ ,—

"চলিলাম প্রাণময়ি! চলিলাম আজি,
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়,
এই ভাসাইনু তরী, জানি না বাঁচি কি মরি,
জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায়!
যাই যে নাহি সে খেদ—নাহি দুঃখ তায়,
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাহি করি মনে,
কেবল রহিল দুঃখ, অই পূর্ণ-চন্দ্র মুখ—
পূরেনি আকাঙ্খা যারে নিরখি নয়নে,
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এত যারে ভালবেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,—
একটি মুহূর্ত্ত হায়, দেখিতে নারিনু তায়,
এই বিদায়ের কালে, চারু চন্দ্রাননে,
ভরিল না চিত্ত তাব একটি চুম্বনে!"

"বিদায়" কবিতা কি উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস জানা যায় না। কবি যাইতেছিলেন জন্মভূমির দিকে, অথচ লিখিলেন "বিদায়"। কি উদ্দেশ্যে, কি অবস্থায়, "বিদায়" রচিত হইয়াছিল, তাহার কারণ কে বলিবে? কবি লিখিয়াছিলেন ;—

"চলিলাম প্রাণময়ি! ছাড়িয়া তোমায়,
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরণিখানি দ্রুত ভেসে যায়।
দুর্নিবার স্রোতজলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিনু কোথায়?

* * *

যাই তবে প্রাণময়ি! বিদায়, বিদায়।"

ভাদ্র মাসে জন্মভূমি জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসিয়া অতি অল্পদিনই তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মোকর্দ্দমার জন্য কলিকাতায় ছিলেন। বহু দিনের বাঞ্ছিত, কলিকাতা দর্শন-আকাঙ্খা কবি-হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। কলিকাতা গিয়া দেবেন্দ্রকিশোরের নিকট থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তখন ঢাকা হইতে গোয়ালন্দ, ষ্টিমারে যাতায়াত করিতে হইত।

কবি গোবিন্দচন্দ্র নিঃসঙ্গ অবস্থায় "সুরমা" নামক একখানি জাহাজে গোয়ালন্দ অভিমুখে রওনা হইলেন। মধ্যপথে, কবি যে জাহাজে যাইতেছিলেন, তাহার সহিত অপর একখানা জাহাজের সংঘর্ষ হইল। ফলে দুইখানি জাহাজই আহত হইয়াছিল। কবি গোবিন্দচন্দ্র যে জাহাজে ছিলেন উহা ডুবিবার উপক্রম হইল। কিন্তু ঘটনা স্থানে নদী অপ্রসর ছিল বলিয়া শীঘ্র জাহাজখানিকে তীরে সংলগ্ন করা হইল এবং তিন চারি ঘণ্টার চেষ্টায় জাহাজখানি কোন মতে গোয়ালন্দ উপস্থিত হইল। জগদীশ্বরের কৃপায় সে যাত্রা কবি অপঘাত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন।

যথাসময়ে গোয়ালন্দ হইতে রেলগাড়ী যোগে কবি কলিকাতা

উপস্থিত হইলেন। তথায় নিমতলা, রমানাথ লাহার ষ্ট্রীটে দেবেন্দ্রকিশোর বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এবং প্রায় চারি মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া কলিকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া লইলেন।

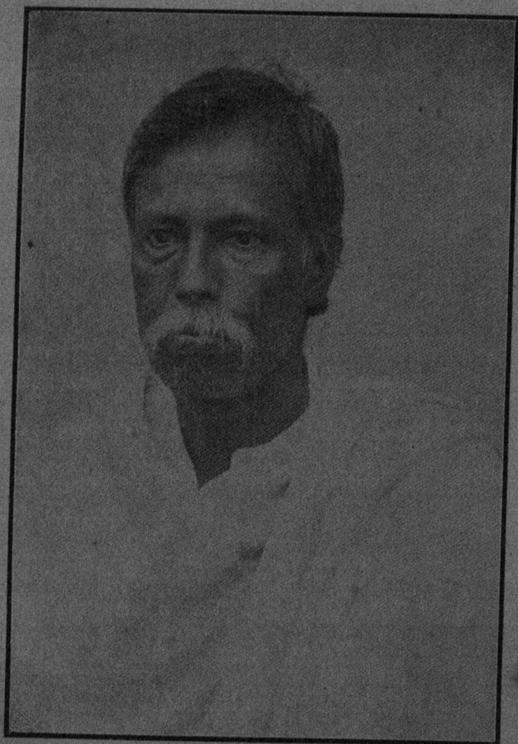
অতঃপর ১২৮৯ সনের মাঘ মাসে কবি গোবিন্দদাস দেবেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখন সবেমাত্র ময়মনসিংহে একটি নূতন প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে "সিটি স্কুল" নামে আর একটি বিদ্যালয় ছিল। ময়মনসিংহে ফিরিয়া গোবিন্দচন্দ্র এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু দীর্ঘকাল এই স্কুল জীবিত রহিল না। "সিটি স্কুলের" সহিত এই স্কুলের প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। পরে উভয় স্কুল মিলিত হইয়া এক "সিটি স্কুলই" বর্ত্তমান রহিল। নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকগণও অপসৃত হইলেন। সুতরাং, কবি গোবিন্দচন্দ্রকেও পণ্ডিতের পদ ত্যাগ করিতে হইল।

উপরোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের জন্য ময়মনসিংহ "সাহিত্য সমিতির" অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে তিনি দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের ভবন "দেব নিবাসে" অবস্থান করিতেন। তখন "আর্য্যদর্শন"-সম্পাদক, ও "গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত" প্রণেতা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ময়মনসিংহে ছিলেন এবং তিনিই "সাহিত্য সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। কবি এই কার্য্যে অতি অল্পদিন অবস্থান করেন।

পুনঃ পুনঃ ময়মনসিংহে যাতায়াতের দরুণ এবং কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থান করিয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র তথায় বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন।



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার।

এবং কালক্রমে বহু বন্ধুও লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলাই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এবং তথাকার জনগণ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিতেন। ময়মনসিংহে তিনি এককালে এতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তথায় তিনি "সারস্বত কবি" বলিয়া অভিহিত হইতেন। জীবিত-কালে তিনি এক ময়মনসিংহেই যাহা কিছু সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। তথাকার বন্ধুদিগেব মধ্যে "সৌরভ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভবনে প্রায়ই অবস্থান করিতেন। কেদারবাবু ময়মনসিংহে একজন সুনামধন্য পুরুষ। তিনি একজন দেশভক্ত, কর্ম্মী, এবং নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী। তিনি নানা দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ও নেতা। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য এবং সহৃদয়তা বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক। কবি গাবিন্দচন্দ্রকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। এককালে মজুমদার মহাশয়, কবি গোবিন্দচন্দ্রকে নানারূপে সাহায্য কবিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর পব তিনি, "স্মৃতির আরতি" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া, গোবিন্দ-দাসের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছেন। "বাসন্তী," "খোকার দপ্তর" প্রণেতা ৺মনোমোহন সেনও দাস-কবির বন্ধু ছিলেন। আরো কত কত বন্ধু অদ্যাপি জীবিত আছেন,—কিন্তু সে সব কথা বলিবার এ স্থান নয়।

দাস মহাশয়ের শিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবনে একটা আশ্চর্য্য অসম্পূর্ণতার চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার শিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবনের গতির ভিতর দিয়া একটা অপ্রতিহত চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। অদৃষ্টের এই অনিবার্য্য চাঞ্চল্য তাঁহার দুঃখময় জীবনের এক মূলীভূত কারণ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অদৃষ্টের দুর্দ্দমনীয় আসুরিক শক্তি, জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিলেও তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তিকে একটুকুও পরিম্লান করিতে পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—— :০: ——

কর্ম্মজীবনের মধ্যাহ্ন,—স্ত্রীনাশ,—ভ্রাতৃবিয়োগ,—
"প্রেম ও ফুল" রচনা।

মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী ৺দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর কথা আমরা ইতোপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি,—তিনি ১২৯০ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহে একটি "সোডা ওয়াটারের" কল স্থাপিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি কবি গোবিন্দচন্দ্রকে, ভাল দেখিয়া একটি কল ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। কথা ছিল, দাস মহাশয় নিজে একটি কল দেখিয়া, তাহার মূল্যের কথা পত্র দ্বারা দেবেন্দ্রকিশোরকে জানাইলে তিনি ডাকযোগে টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

তদনুসারে কবি গোবিন্দদাস কলিকাতায় পুনরাগমন করিলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিশ্রুতি মত দেবেন্দ্রকিশোরকে পত্র দ্বারা সকল কথা জানাইলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রকিশোর শীঘ্রই টাকা পাঠাইবেন বলিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে লিখিলেন, অথচ টাকাও পাঠাইলেন না, কিম্বা কবিকে ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইতেও লিখিলেন না। দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। কলিকাতা

আসিয়া দাস-কবি কৃষ্ণকিশোর কর নামক দেবেন্দ্রকিশোরের পরিচিত জনৈক "মহাজনের" আলয়ে বড়বাজারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না, —নানাস্থানে ভ্রমণ এবং কবিতা রচনা। উক্ত কৃষ্ণকিশোর করের আলয়ে তিনি আহার করিতেন। সেই "মহাজনের" বাসায়, "সতী-দেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য" নামক একখানি চিত্র ছিল। একদিন আহারাদির পর শয়ন করিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন,—কখনও স্বদেশের কথা, কখনও স্বীয় নিরন্ন জীবনের কথা,—ইত্যাদি নানা কথা কবির মনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। চিন্তার সময় চক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে গৃহের প্রাচীরে মহাদেবের সেই চিত্রপট বিলম্বিত দেখিলেন। তখন কি জানি কেন, অন্যান্য সকল চিন্তার ধারা মিলাইয়া গেল,—শুধু সেই চিত্রখানি আসিয়া কবির কল্পনা উদ্বোধিত করিয়া দিল। তিনি দিবাভাগে সচরাচর নিদ্রা যাইতেন না। তাঁহার শয্যার পার্শ্বে লেখনী থাকিত। মহাদেবের সেই চিত্রখানি তাঁহার কবি-কল্পনাকে এইরূপ জাগাইয়া তুলিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি "সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য" শীর্ষক কবিতা রচনা করিয়া ফেলিলেন।

১২৯০ বঙ্গাব্দে "নব্যভারত" প্রচারিত হয়। কবিতাটি রচনার পর গোবিন্দদাস তাহা "নব্যভারত" সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন এবং যথাসময়ে "নব্যভারতে" তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

"নব্যভারত" সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়, গোবিন্দ-চন্দ্রের কবিতার প্রাপ্তিসংবাদ সহ কবির সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইয়াছিলেন এবং কখন আসিলে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে তাহা জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

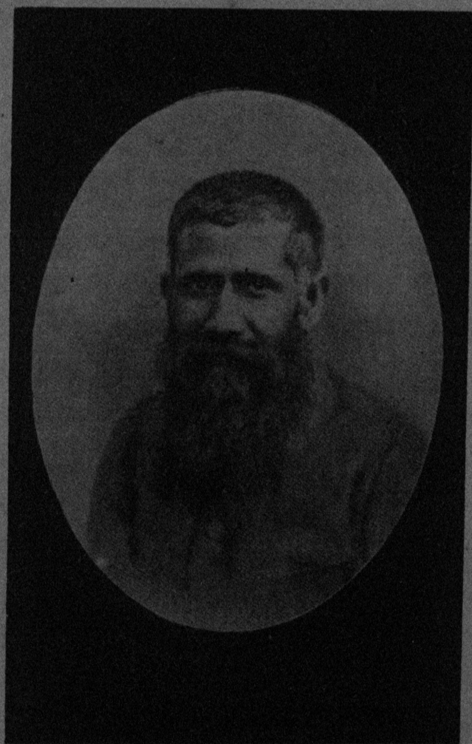
দাস মহাশয় যে গৃহে অবস্থান করিতেন, তাহা অতিশয় কদর্য্য

ছিল,—অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন। বিশেষতঃ, বর্ষাকালে তথায় যাইবার রাস্তা এরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিত যে, পদব্রজে গমনাগমন একরূপ দুরূহ ব্যাপার ছিল,—গাড়ী চলাচল করা ত দূরের কথা। যাহারা "মহাজন" নামধারী ব্যক্তিগণের বিপণি এবং তাহাদের বাসগৃহ দেখিয়াছেন তাহাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অপরিচ্ছন্ন থাকাটাই যেন তাহাদের অভ্যাস। ঘরের একদিকে জীর্ণ তক্তপোষের উপব ময়লা বিছানা, কচিৎ কাহারও শিয়রে হয়ত একখানি ছিন্ন পত্র বটতলার রামায়ণ, অথবা দাশু রায়ের পাঁচালী। বিছানা এবং তক্তপোষে ছারপোকাব রম্য নিকেতন। ঘরেব এক পার্শ্বে হুকা, তাহার নিকটে ধূমপানের সাজ-সরঞ্জাম। ঘরের ভিতরে চারিদিকে নিষ্ঠীবনের চিহ্ন এবং তামাকের ছাই প্রভৃতি আবর্জ্জনা। ইহা ছাড়া এমন সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা, অনাবশ্যকীয়, যথা—গুড়ের খালি হাঁড়ি, ছেঁড়া জুতা, একখানা খড়ম, অথবা একটা ভাঙ্গা ছাতা। এক কোণে একটা দড়ি টাঙ্গানো, তাহার উপর কতকগুলি ময়লা কাপড় স্তূপীকৃত। এই প্রকার একখানা গৃহে কবি গোবিন্দচন্দ্র রাজধানী কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন।

তদবস্থায় দাস-কবি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়কে আসিতে না লিখিয়া, তিনি স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন বলিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। এদিকে দাস-কবি একেবারে রিক্তহস্ত,—কপর্দ্দকবিহীন। তাঁহার পরিধেয় বসনের তখন জীর্ণ অবস্থা। এমন কি, একখানি গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া কৃষ্ণকিশোর কর মহাশয়ের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়া আবশ্যকীয় পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন, এবং পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বেলা আট নয় ঘটিকার সময় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তদীয় ভবন

ছিল,—অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন। বিশেষতঃ, বর্ষাকালে তথায় যাইবার রাস্তা এরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিত যে, পদব্রজে গমনাগমন একরূপ দুরূহ ব্যাপার ছিল,—গাড়ী চলাচল করা ত দূরের কথা! যাঁহারা "মহাজন" নামধারী ব্যক্তিগণের বিপণি এবং তাহাদের বাসগৃহ দেখিয়াছেন তাহাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অপরিচ্ছন্ন থাকাটাই যেন তাহাদের অভ্যাস। ঘরের একদিকে জীর্ণ তক্তপোষের উপর ময়লা বিছানা, কচিৎ কাহারও শিয়রে হয়ত একখানি ছিন্ন পত্র বটতলার রামায়ণ, অথবা দাশু রায়ের পাঁচালী। বিছানা এবং তক্তপোষে ছারপোকার রম্য নিকেতন। ঘরের এক পার্শ্বে হুকা, তাহার নিকটে ধূমপানের সাজ-সরঞ্জাম। ঘরের ভিতরে চারিদিকে নিষ্ঠীবনের চিহ্ন এবং তামাকের ছাই প্রভৃতি আবর্জ্জনা। ইহা ছাড়া এমন সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা, অনাবশ্যকীয়, যথা—গুড়ের খালি হাঁড়ি, ছেঁড়া জুতা, একখানা খড়ম, অথবা একটা ভাঙ্গা ছাতা। এক কোণে একটা দড়ি টাঙ্গানো, তাহার উপর কতকগুলি ময়লা কাপড় স্তূপীকৃত। এই প্রকার একখানা গৃহে কবি গোবিন্দচন্দ্র রাজধানী কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন।

তদবস্থায় দাস-কবি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়কে আসিতে না লিখিয়া, তিনি স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন বলিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। এদিকে দাস-কবি একেবারে রিক্তহস্ত,—কপর্দ্দকবিহীন। তাঁহার পরিধেয় বসনের তখন জীর্ণ অবস্থা। এমন কি, একখানি গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া কৃষ্ণকিশোর কর মহাশয়ের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়া আবশ্যকীয় পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন, এবং পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বেলা আট নয় ঘটিকায় নয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তদীয় ভবন



শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

'আনন্দ আশ্রমে" উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং আরো কয়েকজন ভদ্রলোক "নব্যভারত" সম্পাদকের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। এবং সমবেত ভদ্রলোকগণ তখন নানা কথা আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে "নব্যভারত" সম্পাদক মহাশয়, আগন্তুক ভদ্রলোকদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"দেবী বাবু খুব বড় এক থালা জলখাবার আনাইলে আমরা সকলে একসঙ্গে সেই সুরসাল তৃপ্তিকর খাদ্যগুলি উদরস্থ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। দেবী বাবু ও বিজয় বাবুর সহিত এই প্রথম আলাপ পরিচয় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়া বাসায় ফিরিলাম।"

এ কাহিনী আমরা গোবিন্দচন্দ্রের নিজ মুখে শুনিয়াছি। গোবিন্দচন্দ্র আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রথম তিনি "নব্যভারত" সম্পাদকের নিকট কবিতা পাঠান, এবং পরে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু কবির মৃত্যুর পর দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, কবি গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে "আনন্দ আশ্রমে" যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন, পরে "নব্যভারতে" কবিতা লেখেন। এ কথার কোন্‌টি ঠিক্, বলা যায় না। বহুদিনের কথা,—দুইজনের মধ্যে একজনের ভুল হইয়া থাকিবে। তবে গোবিন্দচন্দ্রের কথাটা আমাদের নিকট প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়।

"নব্যভারত" সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয়, কালক্রমে বন্ধুত্ব সৃজন করিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরকে সহোদরের

ন্যায় জ্ঞান করিতেন। দেবীপ্রসন্নের সুযোগ্য পুত্র, পরলোকগত ব্যারিষ্টার প্রভাতকুসুম, কবি গোবিন্দচন্দ্রকে খুল্লতাতের মত শ্রদ্ধা করিতেন। "আনন্দ-আশ্রম," গোবিন্দচন্দ্রের নিকট অবারিত ছিল। দেবীপ্রসন্নের পরিবারস্থ মহিলারা পর্য্যন্ত কবি গোবিন্দদাসকে আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুতঃই উভয়ের প্রণয় এতদূর ঘনীভূত হইয়াছিল যে, দেখিলে, পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত বলিয়া মনে হইত।

"নব্যভারত" সম্পাদক দেব-হৃদয় দেবীপ্রসন্নের নিকট হইতে কবি গোবিন্দচন্দ্র অনেক সময় অর্থ সাহায্য, বিপদে সৎপরামর্শ এবং অসময়ে নানাপ্রকার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের বিরচিত গীতিকাব্য কয়খানি এককালে "নব্যভারত" প্রেস হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল। এমন কি, গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার টাকাটা পর্য্যন্ত দাস-কবিকে এক সঙ্গে দিতে হয় নাই,—বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে দরিদ্র কবি ক্রমে ক্রমে তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্নের সাহায্য না পাইলে গোবিন্দচন্দ্রের পক্ষে কাব্যগ্রন্থগুলি মুদ্রিত করা কষ্টসাধ্য হইত।

গোবিন্দচন্দ্র কলিকাতা উপনীত হইলে "আনন্দ আশ্রমে"ই অবস্থান করিতেন। নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি "আনন্দ আশ্রমে"ই আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া দেবীপ্রসন্নের নিকট তিনি একদিনের তরেও অনাদৃত হ'ন নাই।

দেবীপ্রসন্ন পূত-চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় উদার ছিল। স্নেহ মমতা, দয়া করুণায় তাঁহার হৃদয় ত্রিদিবের অমৃত নির্ঝরিণী স্বরূপ ছিল। বিপন্নকে অন্নদানে তিনি কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষায় ও জ্ঞানে তিনি বরণীয় ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অনেক, কিন্তু তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি "নব্যভারত"। "নব্য-

ভারত”ই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। তাঁহার “নব্যভারত” দেশের মহদুপকার সাধন করিয়াছে। বঙ্কিমবাবুর “বঙ্গদর্শন” তাঁহার জীবদ্দশায়ই বিদায় গ্রহণ করে;—কালীপ্রসন্ন বাবুর “বান্ধব”ও সম্পাদকের জীবনকালেই বিলুপ্ত হয়। “নবজীবন”, “সাধনা,” “প্রদীপ” প্রভৃতি কত কাগজের নাম করিব ? কর্ণধার সকল বর্ত্তমানেই ইহারা ডুবিয়া যায়! কিন্তু দেবীপ্রসন্নের একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও সুগভীর সাধনা বলে “নব্য-ভারত” এতটা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে। কতবার “নব্যভারত” নিভে নিভে হইয়াছে, কিন্তু শুধু দেবীপ্রসন্নের ঐকান্তিক চেষ্টায় “নব্য-ভারতে”র অপঘাত মৃত্যু হয় নাই। ঋণ করিয়া তিনি “নব্যভারত” চালাইয়া গিয়াছেন,—অনেক গ্রাহকেরা তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেও, তিনি কখনও তাহাদের আশা ভঙ্গ করেন নাই। কেবল করজোড়ে, বিনীতভাবে গ্রাহকদের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের অনুকম্পা চাহিয়াছেন। তবু “নব্যভারত”কে বিলুপ্ত করেন নাই। তিনি আজ পরপারে, তথাপি তাঁহার আশীর্ব্বাদে “নব্যভারত” আজিও জীবিত রহিয়াছে। তাঁহার সুযোগ্যা বিদুষী পুত্রবধূ আজিও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। দেবীপ্রসন্নের কথা লিখিয়া ফুরায় না।

কবি গোবিন্দদাস “নব্যভারত” সম্পাদকের প্রতি চির-কৃতজ্ঞ ছিলেন। দেবীপ্রসন্নের কথা কহিতে কহিতে তাঁহার প্রতি কবির শ্রদ্ধা. উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাঁহার বিরচিত “চন্দন” গীতিকাব্যখানি তিনি দেবীপ্রসন্নকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। উহার একস্থানে লিখিয়া-ছেন ;—

“তুমি হে শিবের মত, কাল-কূট-কণ্ঠগত
নির্ভীক, নির্ম্মুক্ত চিত্ত মহা মৃত্যুঞ্জয়,

নিঃসহায়, নির্ব্বাসিত, উৎপীড়িত উপেক্ষিত,
সকলে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয়।”

কথা প্রসঙ্গে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা বলিতেছিলাম। গোবিন্দচন্দ্র ছয় মাস কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া এতটা দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন না। দেবেন্দ্র-কিশোবের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রত্যুত্তব না পাইয়া তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন; অবশেষে আব কোন উপায়ান্তব না দেখিয়া ময়মনসিংহ প্রত্যাগমনের সংকল্প করিলেন।

১২৯০ বঙ্গাব্দেব পৌষ মাসে কবি গোবিন্দচন্দ্র কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন কবেন। অর্থাভাবে তিনি উক্ত কৃষ্ণকিশোর কব মহাজনেব নিকট হইতে পাথেয় বাবদ কিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ কবিয়াছিলেন।

সেবপুরেব ভূম্যধিকাবী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) সেবপুব হইতে “চারুবার্ত্তা” নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচাব করিয়াছিলেন। ১২৯১ সনে “চারুবার্ত্তা’ কিছুকালের জন্য সেরপুর হইতে ময়মনসিংহে উঠিয়া আসে এবং তথা হইতে পরিচালিত হইতে থাকে। “অরূপা”, “লহরী” প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন “চারুবার্ত্তা” কাগজের সম্পাদক। সেরপুরবাসী জনৈক উকীলের পরামর্শে তিনি তৎকালে “চারুবার্ত্তা’ ব কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ১২৯৬ সনের কার্ত্তিক মাসে “চারুবার্ত্তা” পুনরায় সেরপুরে চলিয়া যায়। ১৩০০ সনে সের-পুরের “চারুবার্ত্তা”র প্রচার বন্ধ হয়। সে সময় তিনি দেবেন্দ্রকিশোব আচার্য্য চৌধুরীর ময়মনসিংহস্থ ভবন “দেব নিবাসে” থাকিতেন। ১২৯১ সনেই তিনি “চারুবার্ত্তা”র অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তখন তিনি মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনতা কালে মৃত্যুর দানবী লীলায়
২৯শে বৈশাখ মাসিক ২০৲। গেল। ১২৯২ বঙ্গাব্দ কবির পক্ষে
নিযুক্ত হইলেন। সময় কবি-হৃদয়ে যে দারুণ শোকের

কিন্তু, প্রবাসে পরাধীন জীবন বর্ণনীয়। এই বৎসর তিনি পত্নীহারা
বলিয়া বিবেচিত হইত। গো'কের কাছেই হৃদয়োচ্ছেদক। কিন্তু দাস-
বীতশ্রদ্ধ হইলেও, বাধ্য হইয়া মন কন্যা মণিকুন্তলা ছাড়া আর কেহ না
পরবশতা স্বীকার করিয়াছিলে হৃদয়ে গভীরতর রূপে আঘাত করিয়া
গোবিন্দচন্দ্রের ধারণা ছিল
প্রবাসে বসিয়া ১২৯১ সনে বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ, রাত্রি প্রায় আট

"জীবনের ধমা পত্নী সারদাসুন্দরী মরজগতের সমস্ত প্রেম-
দয়া মায় কোলে লুটাইয়া পড়িলেন।
এ জীবতিন দিন পূর্ব্বে জয়দেবপুর হইতে প্রেরিত
অপূর্ণ পরাগন্ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন।
সোদবের প্রাণ পুণ একখানি 'টেলিগ্রামে' স্ত্রীর কঠিন
শুষ্ক শত সাহারায় এক বিন্দু জগসিংহ জয়া
মানবে দেবের দয়া ভোগে যে কেমন,
জানি না সে জননীব স্নেহ সুবিমল।
জায়ার যন্ত্রণাময় প্রেম জালামুখী,
এ জীবনে এ জনমে কবিল না সুখী!"

বাণীর প্রকৃত সাধক, স্বাধীনতার উপাসক, সরস্বতীর পাদপদ্মে মধুপানোন্মত্ত ভ্রমর, কবি গোবিন্দচন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রাক্তণ সংস্কারলব্ধ যে প্রজ্ঞা নিহিত ছিল, দারিদ্র্য এবং পরাধীনতার ঘন মেঘান্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন হইলেও, ক্ষণপ্রভার তীব্র জালাময় জ্যোতির মত প্রায়শঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। প্রিয়-জন-বিচ্ছিন্ন অসুখী কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস,

…বনের গৌরব কাহিনী লিখিতে ব্যস্ত।

নিঃসহায়, নির্ব্বাসিত,

আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে থাকে।

সকলে উদার বক্ষে দিতেছ

কথা প্রসঙ্গে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি
বনে আমার,
গোবিন্দচন্দ্র ছয় মাস কাল কলিকাতায় অব
মোর আশা,
সময়ের মধ্যেও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে
বিদায়
কিশোরের নিকট হইতে কোন প্রকার …
…াব পিপাসা!
একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন; অবশেষে আর
দর্শন
দেখিয়া ময়মনসিংহ প্রত্যাগমনের সংকল্প করিলেন।
কাতর,
১২৯০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কবি গোবিন্দ
প্রস্রবণ,
ময়মনসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অর্থাভাবে তিনি
কর,
কর মহাজনের নিকট হইতে পাথেয় বাবদ কিঞ্চি
…াচ্ছাদন
ছিলেন।
…ংক্রমণ!
সেরপুরের ভূম্যধিকারী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী
…মলমিয়র,
ইংরেজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) সেরপুর হইতে…

…চিতোরের দগ্ধ চিন্তাস্থল,
প্রচা…
…আরাবল্লি পর্ব্বতের উন্নত শিখর,
সুপবিত্র কাগারের পুলিন শ্যামল!
পতিত প্রাণের ওই একই সান্ত্বনা,
স্মৃতির সহস্র কণ্ঠে গভীর চিৎকার,
মৃত প্রাণে ঢালে কি যে ঘোর উদ্দীপনা,
ভূতপূর্ব্ব দেবভাগ্য জাগায় আমার!'

* * *

এই সময় হইতেই কবি-হৃদয়ে দেশাত্মবোধের অগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিতে আরম্ভ হয়।

চারুবার্ত্তা কাগজের কার্য্যাধ্যক্ষতা কালে মৃত্যুর দানবী লীলায় কবির একখানি পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া গেল। ১২৯২ বঙ্গাব্দ কবির পক্ষে মহা সাংঘাতিক বৎসর। সে সময় কবি-হৃদয়ে যে দারুণ শোকের আঘাত লাগে তাহা বিশেষভাবে বর্ণনীয়। এই বৎসর তিনি পত্নীহারা হইলেন। পত্নীবিয়োগ প্রত্যেকের কাছেই হৃদয়োচ্ছেদক। কিন্তু দাস-কবির সংসারে তখন একমাত্র কন্যা মণিকুন্তলা ছাড়া আর কেহ না থাকায়, এই শোক তাঁহার হৃদয়ে গভীরতর রূপে আঘাত করিয়া গেল।

সেই দারুণ ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ, রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় কবির প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরী মরজগতের সমস্ত প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া মরণের কোলে লুটাইয়া পড়িলেন।

পত্নীবিয়োগের দুই তিন দিন পূর্ব্বে জয়দেবপুর হইতে প্রেরিত একখানি পত্রে স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন।

পত্র পাওয়ার দুই দিন পর একখানি 'টেলিগ্রামে' স্ত্রীর কঠিন পীড়ার কথা জানিতে পারিলেন। তখন ময়মনসিংহ জয়দেবপুরে রেল-পথ উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু যাত্রী লইয়া 'ট্রেন' চলিতে আরম্ভ করে নাই। তথাপি ষ্টেশন-মাষ্টারের দয়ায়, তার পরদিন 'গার্ডের' গাড়ীতে বসিয়া তিনি অপরাহ্নে প্রায় তিন চারি ঘটিকার সময় জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। সারদাসুন্দরী তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন। বাড়ী আসিবার পথে 'চিলাই' নদীর তীরে এক জলন্ত শ্মশান দেখিয়া কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

পরমাত্মীয়ের ঘোরতর অসুস্থতার সংবাদ জানিতে পারিয়া যে প্রবাস হইতে আপন গৃহাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে থাকে, সে যদি পথিমধ্যে প্রজ্বলিত শ্মশানভূমি দেখিতে পায়, তবে তাহার হৃদয় মনের

অবস্থা তখন যে কি শোচনীয় আকার ধারণ করে, তাহা বর্ণনা করা অত্যুক্তি। বিপন্ন কবিরও তখন সেই অবস্থা।

কবি তখন দগ্ধ হৃদয়ে দ্রুতবেগে গৃহপানে ছুটিয়াছেন। অবশেষে গৃহে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রাণসমা প্রেয়সী মৃত্যুশয্যায় শয়ান;—সারদাসুন্দরী তখন মুমূর্ষু,—অচৈতন্য। চক্ষে তাঁহার পলক নাই, কেবল মৃদু মৃদু নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছিল। সারদাসুন্দরীর পার্থিব দেহের ইন্দ্রিয়নিচয় তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার প্রাণের প্রাণ জীবনাধিক স্বামীর হৃদয়বিদারক অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে আর কোনই সাধ্য ছিল না। পরপারে বিদায়ের মুহূর্ত্ত পরমাত্মীয়ের নিকট কি অসীম যন্ত্রণাময়, তাহা কবি তখন সম্যক উপলব্ধি করিতে-ছিলেন।

কবি গোবিন্দদাস গৃহে আসিয়া স্ত্রীর দেখা পাইলেন সত্য, কিন্তু অন্তিম সময়ে তাঁহার একটি কথাও আর শুনিতে পাইলেন না। এই ভাবে অবস্থানের পর রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় পত্নী সারদাসুন্দরী, তরুণ বয়সে মরজগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। দাস-কবি বিপত্নীক হইলেন।

তখন পত্নী-শোকবিহ্বল কবি গভীর মর্ম্মবেদনায় অতীব কাতর হইয়া পড়িলেন। বিরহী চক্রবাকের করুণ ক্রন্দনের ন্যায় তাঁহার আর্ত্তনাদ তখন শুধু ঊর্দ্ধে দেবতার চরণে পৌঁছিতেছিল। কবির অবস্থা তখন অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক।

মৃত্যুর কালীমামাখা রজনী ক্রমশঃই গভীর হইতে লাগিল এবং কবির প্রশান্ত আনন ও প্রশান্ত হৃদয়ের উপর কে যেন বিষাদের একখানা ঘোর মসীবর্ণ যবনিকা টানিয়া দিয়া গেল। অদূরে নৈশ বাতাস হু হু করিয়া বহিতে লাগিল এবং শোকের দীর্ঘনিশ্বাসে গৃহপ্রাঙ্গণ উজাড়

করিয়া তুলিল। নৈশাকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর খণ্ড চন্দ্র, ম্লানমুখে বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তারাকুল আকুল নয়নে মনোবেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া শোক প্রকাশ করিতেছিল। অদূরে চিলাইর জল কলস্বরে বিষাদের সকরুণ স্বর মৃদু মৃদু ধ্বনিয়া উঠিতেছিল। আরো দূরে গজারী বনে কবির দুঃখে নিশীথে হাহাকার জাগিয়া উঠিতেছিল।

সারদাসুন্দরীর মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে। সে সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক। শুনা যায় যে, তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের মুখে কখনও জনশ্রুতির কোন কথাই শুনি নাই। কে বলিবে তিনি স্ব-ইচ্ছায় সেই কাহিনীটা আমাদের কাছে চাপা দিয়া গিয়াছিলেন কি না? পূর্ব্ববঙ্গে জনশ্রুতিটি অত্যন্ত প্রবল। কাহারও কাহারও মতে গোবিন্দচন্দ্রের জ্বালাময়ী কবিতা সকল ঐ ঘটনা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা অসত্য কি না, বলা দুষ্কর।

কবির মৃত্যুর পর কোন সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায়, সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর কাহিনী সকরুণ ভাষায় জনপ্রবাদ অবলম্বনে গল্পচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকেই সেই প্রাণস্পর্শী, হৃদয়-বিদারক কাহিনীর কথা অবগত আছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন, কবি-বিরচিত "প্রেম ও ফুলে"র "আত্ম-হত্যা" কবিতার ইহা হইতেই উৎপত্তি।

বহু বৎসর পর ১৩১২ সনে তিনি "কি কঠিন" নামক একটি কবিতা লিখেন। "বৈজয়ন্তী" কাব্যে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার একস্থানে আছে;—

"মুহূর্ত্ত করেছি ভুল অতি সূক্ষ্ম—এক চুল!
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার!

যদিও বুঝিয়া আজ, শুধু ঘৃণা শুধু লাজ,
দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ সার,"

ইহারও মূলে সেই জনশ্রুতি আছে কি না তাহাও বিবেচনার কথা বটে।

সারদাসুন্দরীর বিদায়ে বাঙ্গালার গীতি-কবিতার একটা দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার তিরোধানের পর কবি গোবিন্দচন্দ্র যে এক হৃদয়ভেদী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। সেই কবিতার প্রতিছত্র তিনি প্রাণের বেদনা দিয়া অপূর্ব্ব করুণ ভাষায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। এমন পাষাণ হৃদয় কেহ আছে কি না জানি না, যে এই কবিতা পাঠে তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত না হয়। একদা কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় আমাদিগের নিকট এই কবিতা প্রসঙ্গে দাস-কবির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে "সারদাসুন্দরী" শীর্ষক কবিতাটি বঙ্গ-সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট সম্পদ। কবিতার এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে ; —

"আজ —
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর,
তোমার অধিক শোভা, ততোধিক মনোলোভা,
শোয়ায়ে দিয়াছি চাঁদ চিতার উপর !"

তারপর যখন চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন কবি বলিতেছেন,—

"বল হরি হরি !
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—বল হরি, হরি !"

"রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদাসুন্দরী,
বল চন্দ্র বল তারা—"বল হরি হরি!"
পশু পক্ষী তরুলতা, যে তোমরা আছ যথা,
অচল অশনি সিন্ধু বিঘোরা শর্ব্বরী,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে "বল হরি হরি।"
অপ্সর কিন্নর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব "বল হরি হরি!"

"সারদাসুন্দরী" কবিতা, কবি গোবিন্দদাসের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। মানব মনের প্রকৃত দুঃখ,—প্রিয়তমা পত্নী-বিচ্ছেদের অদম্য শোক, ভাষায় মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্রিমতার অলঙ্কারে এ কবিতা ভূষিত হয় নাই। জল-প্রপাতের মত ইহা অবাধে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সারদাসুন্দরীর বিয়োগের পর, তিনি বহু কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত কবিতা হইলেও, তাহাতে দগ্ধ হৃদয় শান্তি লাভ করে, তাপিত প্রাণ শীতল হয়।

পত্নী-শোক-কাতর গোবিন্দদাস স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর কয়েকখানি কাগজে চারি ছত্র কবিতা মুদ্রিত করিয়া, সারদাসুন্দরীর প্রিয়-পাঠ্য পুস্তক সকলের বহিরাবরণে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এস্থলে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

[স্মৃতি-চিহ্ন।]

জন্ম	মৃত্যু
সন বঙ্গাব্দ।	সন ১০৯২ বঙ্গাব্দ।
তারিখ	তারিখ ১২ই অগ্রহায়ণ।

বয়স ২৫ বৎসর মাস।

——:০:——

স্বর্গগতা

সারদাসুন্দরী দাসীর

গ্রন্থাবলী।

——:০:——

প্রাণময়ী প্রিয়পত্নী সারদাসুন্দরী,
গিয়াছে ত্রিদিব ধামে ধরা পরিহরি'
এই তার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ সমুদয়,
প্রীতির—স্মৃতির চিহ্ন—হীরা মণিময়।

জয়দেবপুর
ঢাকা
১২৯২ সন

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কথায় বলে, বিপদ কখনও একা আসে না। বাস্তবিকই মানুষের দুঃসময়ে, পর পর নানাবিধ দুঃখ কষ্ট আসিয়া উৎপীড়ন করিতে থাকে। একটির পর একটি করিয়া নানা যাতনায় মানুষ পিষ্ট হয়।

কবি গোবিন্দদাস অব্যাহতি পাইলেন না। তাঁহার পত্নী-বিয়োগ-

ব্যথা কথঞ্চিৎ অপনোদিত হইতে না হইতেই ১২৯৩ সনের ৩০শে শ্রাবণ তাঁহার একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্র দাস নিদারুণ যক্ষ্মারোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

জগচ্চন্দ্র, ময়মনসিংহে "সাহিত্য সমিতির" তত্ত্বাবধারকের কার্য্য করিতেন। তিনি অসহায় গোবিন্দচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

যক্ষ্মারোগের প্রারম্ভে জগচ্চন্দ্রের চিকিৎসা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নাই, কারণ এই দুরারোগ্য ব্যাধির কোন প্রতিকার আশা করা বিড়ম্বনা। রোগের প্রবল অবস্থায় যখন জগচ্চন্দ্রের রক্ত বমন হইতে থাকে, তখন চিকিৎসায় বিফলকাম হইয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাকে জয়দেবপুরে—গৃহে আনয়ন করেন। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে অতি অল্প দিনের মধ্যেই জগচ্চন্দ্রের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়।

ভ্রাতৃবিয়োগের পর কবি গোবিন্দচন্দ্র কবিতায় বিলাপ করিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রাণের অবর্ণনীয় দুঃখরাশি কবিতার উৎসমুখে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়াছিল।

১২৯৩ সনের ৫ই ফাল্গুন, কবি গোবিন্দচন্দ্র "কে আছে আমার" শীর্ষক হৃদয়োচ্ছেদক কবিতা লিখিলেন। পরিজনহারা, পত্নীবিয়োগ-বিধুর কবির তপ্ত নিশ্বাস উক্ত কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। কবি লিখিয়াছিলেন ;—

"মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে,
তুমি কিরে জগবন্ধু—জীবনের ভাই ?
তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হতে প্রিয়তম,
পূজনীয় দেবীসমা আমি যারে চাই ?

দেখিলে বালিকা মেয়ে, মিছা কোলে করি যেয়ে,
প্রাণের প্রমদা বলে মিছা চুমা খাই !"

এই প্রকার করুণ সংগীতে গোবিন্দচন্দ্রের বিরচিত তৎকালীন গীতি কবিতাগুলি পরিপূরিত। তাঁহার প্রত্যেক প্রাণস্পর্শী কবিতার ভিতর দিয়া জীবনের দুর্ঘটনাগুলি স্বভাব-কবির সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতায় অলীক অসম্ভব কল্পনার ছায়ামাত্র নাই। জীবনের সত্যগুলি, কবিতার ভিতর সর্ব্বত্রই সুসঙ্গত ভাবে পবিস্ফুটিত হইয়াছে।

শোকের ঝড় কবির জীবনের উপর দিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভ্রাতা জগচ্চন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁহার "বড় পিসি ঠাকুরাণী" দেহত্যাগ করেন। তিনি বিধবা এবং অপুত্রক ছিলেন। কবির সংসারে থাকিয়া তিনি, কবি ও কবিভ্রাতাকে সন্তানেব মত স্নেহ করিতেন। জগচ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি শোকে অতীব অধীর হইয়া দিবানিশি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন, এবং তিন মাসের মধ্যেই কবির সংসার চিরতরে পরিত্যাগ করেন। তার কিছুদিন পর, কবির "জেঠাইমা" মরিলেন। কবির জননী পূর্ব্বেই গত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল আমাদের অজ্ঞাত।

এই ভাবে একটির পর একটি করিয়া শোকের তীব্র আগুনে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ভস্মীভূত হইলেন না। খাঁটি সোণার মত শত বিপদের মধ্যেও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ঈদৃশ দুঃসময়ে পতিত হইয়া সাহিত্য-সেবায় মনঃসংযোগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রকৃত অনুরাগ ভিন্ন তাহা সম্ভবেনা। একদিকে যন্ত্রণাময় জীবন, অপরদিকে সাহিত্য-সেবা। কবি তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। জীবনের যন্ত্রণাও বড় সামান্ত নহে। প্রাণসমা

পত্নী গেলেন ; ভ্রাতাও অকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ; কন্যা প্রমদা পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিল। তারপর, একে একে অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন কবিকে শোক-সমুদ্রে ডুবাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এখন বাকী রহিল কেবল জীবনের শেষ অবলম্বন কন্যা মণিকুন্তলা। তাহাকে লইয়া কবি সংসারের অকূল পাথারে ভাসিলেন। তখন মণির বয়স সাত বৎসর মাত্র।

এবংবিধ শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে যে-কোন কার্য্যই সুনির্ব্বাহ করা অসম্ভব। কবি গোবিন্দচন্দ্রেরও তাহাই হইল। পদে পদে তাঁহার কার্য্যের অমনোযোগিতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল ; এমন কি, 'চারুবার্ত্তা' যন্ত্রালয়ের সমূহ ক্ষতি হইল। ইহা দেখিয়া তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হরচন্দ্রবাবুর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১২৯৩ সনের ৮ই ভাদ্র তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে অপসৃত (সস্‌পেণ্ড) করা হয়।

সেই বৎসর সেরপুরের ভূম্যধিকারী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, কার্য্য-ব্যপদেশে ময়মনসিংহ নগরে আগমন করেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া দেখা করেন। নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তিতে কবি যে তখন বিব্রত, তাহা জানিতে পারিয়া ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কবি গোবিন্দ-চন্দ্রের দুঃখ দূর করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। বিধাতা কৃপা করিলেন। আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া এবং পরে ৺দেবেন্দ্রকিশোরের বিশেষ অনু-রোধে চৌধুরী মহাশয়, কবিকে ১২৯৩ সনের ৯ই কার্ত্তিক ঐ বেতনে কৃষি বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার নিতান্তই অনিচ্ছা ছিল, তথাপি জীবনোপায়ের জন্য সেরপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। বলা বাহুল্য

যে, ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ৺দেবেন্দ্রকিশোরের গভীর প্রণয় ছিল।

৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অকৃত্রিম সাহিত্যিক এবং বহু গুণের আধার ছিলেন। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত সেরপুরের চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, তাঁহার সাহায্য ও বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ধর্ম্মমতে তিনি অতিশয় উদার প্রকৃতির ছিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তিনি নিয়মিত ভাবে উপাসনা করিতেন। একদিনের জন্যও সে নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

ইনি ও পূর্ব্ববর্ণিত কেশববাবু উভয়ে অনেক বিষয়ে প্রায় সমতুল্য লোক ছিলেন। হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্থানীয় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি "সেরপুরের বিবরণ", "বংশানুচরিত" ও সেরপুর জমিদারীর একখানি বহুমূল্য চার্ট বা বংশ-তালিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "সেরপুর গেজেটিয়ার" প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে।

হরচন্দ্র চৌধুরী লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও কমলার কৃপাকটাক্ষ হইতে বঞ্চিত হন নাই। সাহিত্য-সেবায় তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। এককালে অক্ষয় সরকারের "নবজীবনে" তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর তদীয় পিতার কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিবেন বলিয়া অনেকেই আশা করেন। রায় বাহাদুর নিজেও সাহিত্যের আলোচনা করেন এবং বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদিও রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার বহু সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে

৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অন্যতম। তিনি ও আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহের উন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন।

হরচন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত দানশীলা ভূম্যধিকারিণী তারামণি চৌধুরাণীর দত্তক-পুত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি দত্তক-গ্রহীত্রী মাতাকে এমন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন যে, স্বীয় জননীকেও লোকে কদাচিৎ তেমন ভাবে দেখিয়া থাকে। যখন তিনি জমিদারীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন, তখন ষ্টেট্ ঋণভারাক্রান্ত ছিল। অতি অল্প সময়ে অতিশয় সুশৃঙ্খলার সহিত তিনি ঋণমুক্ত হইয়া জমিদারীর ক্রমেই উন্নতি বিধান করেন।

জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী দাস-কবিকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অনর্থক টাকা ব্যয় করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনেক রকম কথা বলিয়া হরচন্দ্র চৌধুরীর কান ভারী করিতেন; কিন্তু তাহাতে তিনি কোন দিনই কর্ণপাত করেন নাই।

কৃষিবিভাগে কার্য্যবাহুল্য না থাকায়, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে নিজ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে ১২৯৫ সনের ১৫ই আশ্বিন পার্শ্বচর কর্ম্মচারী (প্রাইভেট সেক্রেটারী) রূপে নিযুক্ত করেন। তৎকালে তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য অতি অল্পই করিয়াছেন। সর্ব্বদাই চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তকাদি রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সেরপুরে অদ্যাপি তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

সেরপুরে অবস্থানকালীন তিনি অনেকবার জন্মভূমি জয়দেবপুরে এবং কলিকাতায় আসিয়াছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আর 'ঘর দরজা' কিছুই রাখেন নাই। জয়দেবপুরে আসিলে শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করিতেন। কন্যা মণিকুন্তলা তখনো বালিকা, সেও তাহার মামার বাড়ীতেই থাকিত। ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গোবিন্দদাসের ভিটা এবং

তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর ব্যবধানে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল। একদা সেই দীঘির জল খারাপ হইয়া স্নানের ও পানের অযোগ্য হইয়াছিল।

রাজভবনের পশ্চিম দিকে রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাসস্থান ছিল। তাহার পশ্চিমে অনতিদূরে আর একটি জলাশয়। সেই জলাশয়ের তীরে রাজমন্ত্রীর বিশেষ প্রিয় নন্দলাল প্রভৃতি কয়েকজন লোক বাস করিতেন।

কবি গোবিন্দদাসের শ্বশুরবাড়ীর সন্নিহিত দীর্ঘিকার জল খারাপ হইয়া যাওয়ায় তিনি একদিন রাজমন্ত্রীর উক্ত জলাশয়ে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে দাস-কবি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—

"কালীপ্রসন্ন আমাকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ পুকুর হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য অতি কর্কশ ভাষায় একজন পেয়াদা দ্বারা আদেশ করিল। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া আসিলাম। কারণ কালীপ্রসন্নের ভাওয়ালে এমন প্রভুত্ব ছিল যে, সে আমাকে সেখানে অসম্মান করিয়া দিলে, তাহার আর প্রতিকারের পথ ছিল না। যাহা হউক, অপরাহ্ণে রাজবাড়ী গিয়া একথা রাজাকে জানাইলাম বটে, কিন্তু তিনি তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না,—করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। নন্দলালের বাড়ীর নিকট দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিলেই কালীপ্রসন্ন ক্রুদ্ধ হইত, এজন্য পার্য্যমানে সে পথে কেহ যাতায়াত করিত না, যেন সেখানে বাঘের ভয় হইয়াছে।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

কবি গোবিন্দদাসের কর্ম্ম-জীবনের অধিকাংশ সময়ই সেরপুরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সেরপুরে থাকিতে তিনি বহু কবিতা রচনা

করিয়াছিলেন। সে সময় সাহিত্যাচার্য্য ৬অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "নবজীবন" বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালে "নবজীবনে" তিনি রীতিমত ভাবে কবিতা লিখিতেন। ১২৯৩-৯৪ সনের "নবজীবনে" তাঁহার বিরচিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২৯৪ সনে কবি গোবিন্দদাস একবার ৬হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্যোপলক্ষে, হস্তী আরোহণে সেরপুর হইতে ময়মনসিংহ আগমন করেন। সেরপুর হইতে পিয়ারপুরের শড়ক দিয়া ময়মনসিংহ আসিতে হয়, এবং মৈষমারী নামক একটি স্থান পথিমধ্যে পাওয়া যায়। উক্ত উভয় গ্রাম, ময়মনসিংহ হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে উত্তর পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত।

উক্ত পিয়ারপুরের সন্নিহিত হইয়া হস্তী আরোহণে কবি একটি কবিতা রচনা করেন। ১৩২৫ সনের "সৌরভে" কবির মৃত্যুর পর তাহা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম;—

"১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সন। দিবা ১০টা।

হস্তী আরোহণে পিয়ারপুরের শড়ক—মৈষমারীর নিকট।

বল বল বল সখা শুনি যে একি,
তোমাতে আমাতে আছে প্রভেদ না কি?
অনন্ত তোমার রাজ্য, অনন্ত তোমার কার্য্য,
কেবলি তোমারে দেখি যেদিকে ফিরাই আঁখি।
তুমি ছাড়া আমি নই, আমি ছাড়া তুমি কই?
তোমারি আমারি কার্য্য অবিভিন্ন মাখামাখি!
দিয়েছ ভুগিতে সুখ, কেন হইব বিমুখ?
করিব প্রাণে যা চাহে, পাপ বা কি পুণ্য বা কি?

ধূলিতে মিশিব ধূলি পড়ে র'বে কথাগুলি,
তোমারে করিব সুখী আপনি হইলে সুখী।"

"করিব প্রাণে যা চাহে পাপ বা কি পুণ্য বা কি?" ইহা পাঠে ইংরেজ কবির "There's nothing good or bad, but thinking makes us so" কথাটি মনে জাগাইয়া দেয়। চির দরিদ্রের হস্তী আরোহণে মনের যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহার একটা ছাপ্ খুব স্পষ্টভাবে কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু ইহাই নহে। "তুমি ছাড়া আমি নই, আমি ছাড়া তুমি কই? তোমারি আমারি কার্য্য অবিভিন্ন মাখামাখি।" প্রভৃতি কথায় তাঁহার ঈশ্বরে একাত্মভাবের সূচনা করিতেছে। তিনি ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস করিতেন। এই কবিতায় একটি আত্মহারা ভাব এবং হৃদয়ের উল্লাসের চিহ্ন সহজেই ধরিতে পারা যায়।

ইহা পাঠ করিলে তাঁহার "পাপ পুণ্য" কবিতার কথা মনে পড়ে। উহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আমার তৃপ্তিতে তবে, সে কি তৃপ্ত নাহি হবে?
পূরিলে আমার ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!"

ইহাতেও সেই একাত্মভাবের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত।

১২৯৪ সনে তাঁহার প্রথম গীতি-কবিতা "প্রেম ও ফুল" মুদ্রিত হয়। শ্মশান-শয্যায় শায়িতা প্রাণসমা প্রেয়সী ও কন্যার বিলাপ সঙ্গীতে "প্রেম ও ফুলের" সৃষ্টি। "প্রেম ও ফুল" প্রিয়জনের সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ। ইহাতে এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা, রোমিও ও জুলিয়েট, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমের হিল্লোল নাই, আছে শুধু মরজগতের সহিত পরপারের সম্বন্ধ।

ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের In Memoriam. পত্নীহারা, ভ্রাতৃহীন, কন্যাহারা দরিদ্র কবির শোকোচ্ছ্বাসে "প্রেম ও ফুল" পরিপূর্ণ। বিরহী চক্রবাকের আর্ত্তনাদের ন্যায়, ব্যথিত ঘুঘুর করুণ বিলাপের মত "প্রেম ও ফুলের" কবিতা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেয়। এভাবের কবিতা রচনায় বঙ্গ সাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"প্রেম ও ফুল" প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্র একদিন উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন "সহচর" লিখিয়াছিলেন ;—

"প্রেমের রস ও ফুলের মধু পান করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। গোবিন্দদাসকে সরস্বতীর দাস বলিয়াও স্বীকার করিতেছি। সকল কবিতাই সুন্দর হইয়াছে। নবীন গোবিন্দদাস প্রাচীন গোবিন্দদাসের পদবী অনুসরণ করিয়াছেন, ভাবের উচ্ছ্বাসে, প্রেমের তরঙ্গে, ভাসিয়া যাইতেছেন।"

ময়মনসিংহের "চারুবার্ত্তা", 'প্রেম ও ফুলের" সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন ;—

"ময়মনসিংহে "প্রেম ও ফুলের" কবি অপরিচিত নহেন। বর্ষে বর্ষে তাঁহার বীণার ঝঙ্কার, বসন্ত পঞ্চমীর বাসন্তী হিল্লোলের সঙ্গে ময়মনসিংহবাসীর প্রাণে এক নবভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে। * * * গোবিন্দ বাবু কেবল ময়মনসিংহে সুপরিচিত তাহা নহে, তাঁহার খণ্ড কবিতা পশ্চিম বঙ্গের কাব্যরস-প্রিয়জনের আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। * * * কবি দরিদ্র, কবি গৃহলক্ষ্মীশূন্য, ভ্রাতৃবিহীন, কবি দারিদ্র্যে পরান্নপুষ্ট। * * * পরান্নপুষ্ট বলিয়াই কণ্ঠ এত মধুর ; কালের ঘোর কাল আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন বলিয়াই তাঁহার ধ্বনি পঞ্চমে বাঁধা—সে পঞ্চমে দুঃখ সঙ্গীত চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। * * * দুঃখেও আহা কি মাধুরী! "প্রেম ও ফুলের" সর্ব্বত্র মাধুরী। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বড়ই

প্রীত হইয়াছি। "প্রেম ও ফুল" কাব্য-কাননে আদৃত হইবার সর্ব্বথা যোগ্য।"

"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছিলেন ;—

"গ্রন্থকারের প্রেম,—শোকগীতি; ফুল শ্মশান-শয্যায় অথবা সমাধির উপর বিস্তৃত। * * * গ্রন্থকারের ভাষায় সরলতা আছে, তাঁহার কবিতায় মাধুরী আছে।"

সে সময়কার "ভারতী"ও কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। * বস্তুতঃই "প্রেম ও ফুল" প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার সমস্ত গীতি-কবিতার মধ্যে "প্রেম ও ফুল" গ্রন্থখানিই সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছে। তিনি পশ্চিম বঙ্গে "প্রেম ও ফুলের" কবি বলিয়াই পরিচিত। আর পূর্ব্ববঙ্গে তিনি "মগের মুলুকের" নামে সুবিখ্যাত।



* ১২৯৫ সনের মাঘ সংখ্যা "ভারতী", "প্রেম ও ফুল" গীতিকাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিলেন, "পুস্তকখানা আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বপূর্ণ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:•:——

"কুঙ্কুম" রচনা,—অদৃষ্টের পরিহাস,—মৃত্যু-কল্প নির্ব্বাসন,—"মগের মুলুক" ব্যঙ্গ কাব্যের ইতিহাস।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী লিখিতে বসিয়া আমাদের অযোগ্যতা পদে পদে অনুভব করিতেছি। জীবনী-গ্রন্থ সুসঙ্গতভাবে রচনা করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আমাদের সে ক্ষমতা নাই। তথাপি "তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ" হইয়াই তাঁহার জীবনী লিখিতে আরম্ভ করি। এক্ষণে, আশঙ্কা হইতেছে যে, এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন হইলাম। অথচ, কার্য্য আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতেও সঙ্কুচিত হইতেছি। এজন্যই অবশিষ্ট কাহিনী লিখিতে অগ্রসর হইলাম।

১২৯৫ সন চলিতেছে,—কবি গোবিন্দচন্দ্র এখনও শেরপুরের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সময় তিনি কয়েকবার কলিকাতায় এবং মাঝে মাঝে জন্মভূমি জয়দেবপুরে আসিয়াছেন। বিপত্নীক কবি তৎকালোচিত হৃদয়ের অবস্থার উপযোগী একখানি গীতি-কাব্য তখন ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। প্রবল পত্নী-শোক-বিহ্বল কবি-হৃদয়ে, সে সময় যে সকল ভাবরাশি বর্ষা-গগনের পুঞ্জীভূত মেঘের ন্যায় জমিয়া জমিয়া উঠিতেছিল, কবি তাহাই নানাবিধ শোক-গাথায় তখন রচনা করিতেছিলেন।

সারদার বিয়োগ ব্যথা তখন উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত কবি-হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিতেছিল। ১২৯৫ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে একবার কলিকাতা আসিয়া "আনন্দ আশ্রমে" ছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় গাঢ়তর শোকান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সমস্ত কর্ম্মের ভিতর, সারদার স্মৃতি, তাঁহাকে অনুক্ষণ দগ্ধ করিতেছিল। দিবাবসানে, রজনীর অন্ধকার—তাঁহার প্রাণের শোকানল উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত। কলিকাতায় "আনন্দ আশ্রমে" বসিয়া চক্রবাকের নৈশ-কাতরতা-মণ্ডিত ভাষায় তিনি লিখিলেন,—

"সেই মান অভিমান তাহার পীরিতি,
তোমারি তোমারি চেয়ে গাঢ় অন্ধকার,
নিবিয়াছে চন্দ্র, সূর্য্য, ডুবিয়াছে ক্ষিতি,
গ্রাসিয়াছে একেবারে সমস্ত সংসার।"

তারপর সেই বৎসর দুর্গোৎসবের সময় জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, হৃদয়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রবাস প্রত্যাগত বিরহ বিধুর কবি গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন,—

"আছে সেই ঘর বাড়ী আছে লোকজন,
সকলি তেমনি আছে আগেকার মত,
তবু যেন লাগে সব বিজন বিজন,
নিরখি নয়নে জল ঝরে অবিরত।"

শারদীয়া পূজার পর কবি কর্ম্মস্থলী সেরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। সারদার শোকে তখনো তিনি মুহ্যমান। বিগত জীবনের কত না কাহিনী কবি-হৃদয়ে তখন ছায়া-চিত্রের মত ভাসিতেছিল!

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সারদাসুন্দরী কবিকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছিলেন; কিন্তু নানাবিধ কারণে যথা সময়ে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে কবি যখন গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন অসময়,—পত্নী সারদাসুন্দরী

মুমূর্ষু, অচৈতন্য। কেহ কাহারও কথা আর শুনিতে পাইলেন না। সারদাসুন্দরীর শেষ বাসনা আব পরিপূর্ণ হইল না। কবি গোবিন্দচন্দ্রের এতদুপলক্ষে বিরচিত কবিতাবলী প্রকৃত প্রাণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ,—কোথায়ও কল্পনা-দোষ-দুষ্ট নহে।

সেরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রাণস্পর্শী বিগত কাহিনী স্মরণে কবি লিখিলেন,—

"কোন্ কালে নিভে গেছে চিতার অনল,
ভুলিয়া গিয়াছি কবে তার সেই কথা,
মুছিয়া ফেলেছি কবে নয়নের জল,
মনে নাই সেকেলে সে আদর মমতা!

* * *

কেবল একটী কথা মনে বড় জাগে,
রাগ করে লিখেছিল মরিবার আগে।"

৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কোন কার্য্যোপলক্ষে ১২৯৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে গোবিন্দ দাস কলিকাতা আগমন করেন। ময়মনসিংহের জনৈক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তখন তাঁহাব কলিকাতায় দেখা হয়। তাঁহার সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাসে সাগর-সঙ্গম দেখিতে গিয়াছিলেন। ডায়মণ্ডহারবার হইতে তাঁহারা জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। গেঁওখালীর নিকট জাহাজ উপস্থিত হইলে এমন ঝড় উঠিয়াছিল যে, তাহাতে জাহাজখানা প্রায় ডুবিবার উপক্রম হয়। জাহাজের যাত্রিগণ জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিকে কেবল ক্রন্দনের করুণ শব্দ ও আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল। বাহিরে ঝড় ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। কবির মুখে শ্রবণ করিয়াছি, সেই বিপদের সময়ে ভয়ে ভীতা একজন ইংরেজ মহিলা তাঁহার স্বামীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে

থাকেন। ঝড়ের গর্জ্জনে এবং যাত্রীদের আর্ত্তনাদে, সাগর-সঙ্গমের সেদিনকার দৃশ্য কবির চক্ষে প্রলয়ের ভীষণ দৃশ্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর জাহাজখানা তীরে আসিয়া পৌঁছিল। যাত্রিগণ তথায় অবতরণ করিয়া যে যাহার পথে চলিয়া গেলেন। কবি বলিয়াছিলেন,—"অর্দ্ধ পথেই সাগরের মাহাত্ম্য বুঝিয়া ও কল্পনায় সাগব দেখিয়া আমরা ফের্‌তা ষ্টিমারে সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর দেবীবাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন আর এক-বার গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গিয়া সাগর দেখিয়াছিলাম।"

কবির দ্বিতীয় বার "সাগর সঙ্গম" গমনের সময় আমরা জানিতে পারি নাই।

১২৯৫ সনের পৌষ মাসে তিনি একবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা গিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন রাজা ছিলেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় কবি অবস্থান করিতেন। কবি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বিষ্ণুবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের আদর যত্নে অতি সুখে ছিলাম। আগরতলার পাহাড়ে ও মনিপুরী পল্লীতে গিয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছি। 'চম্পামুড়া' কবিতা 'চম্পামুড়া' দেখিয়াই লিখিয়া-ছিলাম। 'ফুলরেণু'তে তাহা ছাপা হইয়াছে।"

১২৯৫ সনের শেষভাগে কবি গোবিন্দচন্দ্র বারাণসী, গয়া, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার পর আর একবার তিনি কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নির্ণয় করিতে পারি নাই। সন তারিখ তাঁহার নিজেরই স্মরণ ছিল না।

১২৯৬ সনের ১৩ই আষাঢ়, কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার কন্যা মণি-কুন্তলার বিবাহের আয়োজন করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাকে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। অথচ তিনি দীর্ঘ দিনের বিদায় গ্রহণ না করিয়া দুই চারি দিনের জন্য সেরপুর পরিত্যাগ করেন। অবশেষে সময়ে কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইতে না পারায়, কিম্বা বিদায় প্রার্থনা না করায়, ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। পরে, উপস্থিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিলে, দয়াশীল চৌধুরী মহাশয়, কবিকে ঐ সনের ২৭শে আষাঢ় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করেন।

কবির একমাত্র কন্যা মণিকুন্তলা একাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র পল্লীর জনৈক যুবক নিশিকান্ত দের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। কবির হিতৈষী বান্ধব, দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের "দেব নিবাসে" বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

কবির জামাতা নিশিকান্ত বিবাহের সময় বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত সচ্ছল ছিল না। দরিদ্র কবি কন্যাকে দরিদ্র গৃহেই বিবাহ দিয়াছিলেন।

সেরপুরে কবি গোবিন্দচন্দ্র আরও দুইটি বৎসর এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি জন্মভূমি জয়দেবপুর দেখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। ভাওয়াল রাজ্যে তখন উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। যে দুঃখে তিনি ভাওয়াল রাজের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দুঃখ তাঁহার দূরীভূত হইল না। ভাওয়ালের রাজ্য ও সমাজ তখনও স্বেচ্ছাচারীতার ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি জন্মভূমির প্রতি একটা অকৃত্রিম অনুরাগ, শৈশব

কাল হইতেই কবি-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ক্রমে, তাহা প্রবল দেশাত্মবোধে পরিণত হয়। সুতরাং, ভাওয়ালের অধঃপতন তাঁহার প্রাণে অসহনীয় বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। জন্মভূমির শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে গভীর বিষাদ কালিমায়, তাঁহার সমগ্র হৃদয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

একবার দেশভক্ত কবি গোবিন্দচন্দ্র সেরপুর হইতে জয়দেবপুরে আসিয়া গভীব মনোবেদনায়, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক রূঢ় কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে কথা আমরা লিখিতে পারিব না।

১২৯৮ সনে একদিন স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে "কুঙ্কুম"-গন্ধ-লেপিত কতকগুলি গন্ধপুষ্প অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১২৯৮ সনে তাঁহাব "কুঙ্কুম" নামক গীতি-কবিতা প্রচারিত হইল। গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে তিনি সেরপুর হইতে কলিকাতা গিয়াছিলেন। কলিকাতা গিয়া দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়েব ভবন, "আনন্দ আশ্রমে" অবস্থান করিয়া "নব্যভারত" যন্ত্র হইতে "কুঙ্কুম" মুদ্রিত করিলেন।

কার্য্যান্তে কলিকাতা হইতে সেরপুর যাইবার পথে জন্মভূমি জয়দেবপুরে পদার্পণ করিয়া, একখণ্ড নব প্রকাশিত 'কুঙ্কুম" রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে উপহার প্রদান করিলেন। সে সময়, কবি গোবিন্দদাস যে কয়দিন জয়দেবপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন, প্রায় প্রতিদিনই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিত। রাজা "কুঙ্কুম" পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দদাস যখনই তাঁহার নিকট যাইতেন, তখনই তিনি অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, "কুঙ্কুমের" কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কবিকে জানাইতেন। অবশেষে একদিন রাজা, কবি গোবিন্দ-

দাসকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া, জয়দেবপুরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজমাতা সত্যভামা দেবীও, দাস-কবির পুনর্ব্বার বিবাহের জন্য পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজার ব্যবহার কবির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই। এই ভাবে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল।

কিন্তু অকস্মাৎ ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। শরতের মেঘমুক্ত নির্ম্মল গগনে, কাল মেঘের ছায়া পড়িল এবং ক্রমে তাহা গাঢ়তর হইয়া রাজার হৃদয়-গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল;—সরল হৃদয়ের দয়া ও অনুগ্রহ, অকস্মাৎ সন্দেহের প্রবল অনলে পরিণত হইল। সে অনলে দরিদ্র কবির প্রতি রাজার বিশ্বাস ভস্মীভূত হইয়া গেল। কবি, রাজরোষে পতিত হইলেন।

রাজানুগ্রহের প্রায় দশ দিন পর, একদা কবি গোবিন্দচন্দ্র রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন, রাজা আর তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় সরলভাবে কথোপকথন করেন না এবং কবিকে ডাকিয়া কোন কথা বলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর করেন মাত্র। রাজার সে সরলতা আর নাই, মুখে আর সে হাসি নাই, যেন সকল বিষয়েই উদাসীন। কবির সঙ্গে রাজা সেই দিন নিতান্ত অপরিচিতের মত ব্যবহার করিলেন। তখন পর্য্যন্তও গোবিন্দ-চন্দ্র প্রকৃত বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ইতোমধ্যে একদিন কবি পূর্ব্বাহ্নে সাত আট ঘটিকার সময় জয়দেব-পুরের বাজারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে রাজভ্রাতা (রাজার মাতৃস্বসার পুত্র) ৺প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি কবি গোবিন্দচন্দ্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া নানাকথার পর

বলিলেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "নবযুগ" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজা ও ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে অতি তীব্র ভাষায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহাতে অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। অবশেষে জানাইলেন যে, উক্ত প্রবন্ধ গোবিন্দদাসের রচিত বলিয়া ঘোষ মহাশয় রাজার কর্ণগোচর করিয়াছেন এবং এজন্য রাজা, গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছেন।

তচ্ছ্রবণে, কবি গোবিন্দ দাস একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কারণ "নবযুগে" প্রকাশিত প্রবন্ধের কথা তিনি কিছুই জানিতেন না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইতঃপূর্ব্বে রাজা কেন তাঁহার সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহা গোবিন্দচন্দ্রের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। বুঝিলেন, পশ্চাতে ভীষণ শত্রু অগ্রসর হইয়াছে। বুঝিলেন, সমস্ত ষড়যন্ত্রটি এক বিরাট অগ্নি-গর্ভ পর্ব্বতের মত আপাততঃ নির্ব্বাক নিস্তব্ধ রহিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই ভীষণ অগ্ন্যুদগম হইতে থাকিবে। রাজার সেদিনের গাম্ভীর্য্য এবং ঔদাসীন্য একটা প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। সমস্তই বুঝিলেন; বুঝিয়া নিঃসহায় কবি, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের তৃতীয় দিবস প্রভাতে, কবি গোবিন্দ দাস রাজার ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন সবে মাত্র হস্তী আরোহণে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন। কবি, রাজাকে দর্শন করিয়া করযোড়ে নতশিরে প্রণাম করিলেন; কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ মৌনভাবে, গম্ভীর মুখে রহিলেন,—কবিকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। করিবর রাজাকে পৃষ্ঠে লইয়া, মন্থর গতিতে হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল। কবিবর দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। রাজার প্রস্থানের পর তিনি, কবি গোবিন্দচন্দ্রকে পথপার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "নবযুগ" পত্রিকার প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত বলিয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য রাজা আদেশ করিতেছেন, তিনি যেন সেই দিন,—সেই মুহূর্ত্তে—চিরদিনের জন্য জয়দেবপুর পরিত্যাগ করেন এবং রাজ অন্তঃপুরে গমন করিয়া আর রাণীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন। পরিশেষে ইহাও শুনিলেন যে, তিনি যদি সেইদিন জয়দেবপুর পরিত্যাগ না করেন, তবে ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইবেন। ১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে এই নিদারুণ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তখন অনন্যোপায় কবি গোবিন্দচন্দ্র, সেই দিনই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ভাবে বিধি বিড়ম্বনায়, বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। অদৃষ্টের কি বজ্র কঠোর পরিহাস। গোবিন্দচন্দ্র "নবযুগের" প্রবন্ধ না লিখিলেও তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল! প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করা হইল না, অথবা অপরাধের কোনই বিচার হইল না; কেবল বৃথা সন্দেহে একজন নিরপরাধীর প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইল! এই প্রকার দণ্ডাজ্ঞা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

কবির নির্ব্বাসন সম্পর্কে, রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় একেবারে নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, রাজার ত কথাই নাই। "নবযুগ" সম্পাদকের নিকট হইতে সেই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আনাইয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে, কাহারও আক্ষেপ করিবার পথ ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই।

১২৮৪ সনে কবি গোবিন্দদাস, প্রজামণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া,

ভাওয়াল রাজগৃহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় তিনি ভাওয়াল রাজসভার বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

"নবযুগ" কাগজে কে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত ঘটনা, গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি ঘোষ মহাশয়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইবার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

১৩২৪ সনের বৈশাখ সংখ্যা "নব্যভারত" পত্রিকায়, সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—"কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গবাসী'র সাহায্যে নিজ দুষ্কৃতি ঢাকিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে পাষাণও ফাটিয়া যায়।"

উল্লিখিত ঘটনা হইতেই তাঁহার নির্ব্বাসনের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বিশদভাবে এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

রাজাজ্ঞা শ্রবণে, গৃহে ফিরিয়া কবি জয়দেবপুর পরিত্যাগের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। দাস-কবির শ্বশ্রুমাতা এই সংবাদ শুনিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, পত্নী বিয়োগের পর তিনি শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতেন এবং প্রবাস হইতে জয়দেবপুরে আসিলে সেখানেই থাকিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা মণিকুন্তলার বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর। ইতঃপূর্ব্বেই মণিকুন্তলার বিবাহ হইয়াছিল। মণিকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য তখনই তাহার স্বামীগৃহে টেলিগ্রাম করিয়া জানান হইল। সেই রাত্রিতেই মণি, স্বামীগৃহে চলিয়া গেল। গোবিন্দচন্দ্রও রাত্রিতে রেলগাড়ী যোগে সেরপুরের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ যাত্রা করিলেন।

কবি গোবিন্দদাস জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী ভাওয়াল, তাহার প্রিয় পুত্র কবি গোবিন্দচন্দ্রকে হারাইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। "চিলাইর" কলতানে বিষাদের

করুণ-গীতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। নিবিড় গজারী বনে সমীরণ হুহু করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। ভাওয়ালের জনসঙ্ঘ কবির এই মর্ম্মবিদারক কাহিনী শুনিয়া গোপনে হাহাকার করিতে লাগিল। নিরপরাধী, নির্ব্বাসিত কবি জন্মভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই নির্ব্বাসনে স্বভাব-কবি যে কতদূর সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা "চন্দন" নামক গীতিকাব্যে তিনি অশ্রুময়ী করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

১২৯৮ সনে মহাবারুণী গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল। জয়দেবপুর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সেরপুরে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই, জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, তাঁহাকে বারুণীর পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইতে হয়। দৈবাৎ একদিন কলিকাতার রাজপথে, চিৎপুরে, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পিসা রাসমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নানাবিধ কথোপকথনের পর তিনি কবি গোবিন্দদাসকে একবার তাঁহাদের কলিকাতার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে পরদিন অপরাহ্নে কবি রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজভগ্নী কৃপাময়ী দেবী, রাজমাতা জয়মণি দেবী প্রভৃতি তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কৃপাময়ী দেবী দাস-কবিকে প্রশ্ন করেন যে, জয়দেবপুর হইতে সেরপুর যাওয়ার পথে তিনি কেন সেবার তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করেন নাই। রাজভগ্নী এবং রাণীদের কেহই কবি গোবিন্দচন্দ্রের নির্ব্বাসন কাহিনী জানিতেন না। সুতরাং তাঁহারা দাস-কবির নিকট তখন সমস্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হইলেন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তখনও জয়দেবপুরে।

ইহার পর তিন দিন অতীত হইয়াছে। দাস-কবি রাণীদিগের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিতে আর একবার রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন দেখিলেন, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। সুতরাং অবসর বুঝিয়া রাজার নিকট বিগত প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন। এ সম্বন্ধে দাস মহাশয় একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—

"রাজাকে বলিলাম, আমি 'নবযুগে" আপনার কি কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে কিছু লিখি নাই; মিছামিছি জন্মভূমি হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার একজন বিশ্বাসী লোকদ্বারা অনুসন্ধান করুন আমি লিখিয়াছি কিনা? যদি অন্যকে বিশ্বাস না করেন তবে বলুন "নবযুগের" সম্পাদককে আমি অনুনয় বিনয় করিয়া আপনার নিকট লইয়া আসি, আপনি স্বয়ং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন। আপনার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের নিকট তিনি কখনই আমার খাতিরে মিথ্যা কথা বলিবেন না।" —অপ্রকাশিত পত্র

এই কথায় রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তিনি অনুসন্ধানে সমস্ত ঘটনা সবিশেষ অবগত আছেন, আর পুনরায় বৃথা কোন অনুসন্ধান করিবেন না। কিন্তু গোবিন্দদাস রাজাকে পুনর্ব্বার অনুসন্ধানের জন্য বারংবার মিনতি করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন;—

"জয়দেবপুরে আমার এমন কেহ আত্মীয় নাই যাহাকে না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। কেবল জন্মভূমি হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইতেছি বলিয়া দুঃখ হয়। * * * আমার স্নেহ প্রীতি ভক্তি যে শ্মশানভূমিতে মিশিয়া আছে সেই শ্মশানভূমিও যে দেখিতে পাইব না ইহাতেও প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেছি। অতএব আপনি দয়া করিয়া পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করুন। * * * বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন না।" —অপ্রকাশিত পত্র।

কিন্তু রাজা আর কোন মতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের হৃদয়ে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা গোবিন্দচন্দ্র কিছুতেই উৎপাটন করিতে পারিলেন না। কবির বিনীত প্রার্থনা আকাশে মিলাইয়া গেল। তখন তেজস্বী নির্ভীক কবির অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। দৃপ্ত সিংহের মত, দাঁড়াইয়া তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন ;—

"আপনি কি অনুসন্ধান করিবেন? আপনার ক্ষমতা থাকিলে ত? কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলে, তাহাই আপনার বিশ্বাস,—তাহাই আপনার বেদবাক্য। * * * * কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছেন। * * * আপনার চক্ষু কর্ণ থাকিলে, হৃদয় থাকিলে কালীপ্রসন্ন ভাওয়ালের কি করিয়াছে ও করিতেছে তাহা দেখিতেন ও বুঝিতেন। যা' হউক, আমি অপরাধ না করিলেও আপনি আমার যে দণ্ড করিলেন তাহা অতি গুরুতর। ফাঁসির পরই নির্ব্বাসন। আপনি বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। আচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি বলিয়া মিছামিছি দণ্ডিত হইলাম, তবে এখন হইতে আমি লিখিব। আপনি যতদূর সাধ্য করিবেন। * * * এখন দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কি না?"

— অপ্রকাশিত পত্র।

রোষে, ক্ষোভে ও মর্ম্মযাতনায় এই কথা বলিয়া দাস-কবি রাজার ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার আগুন অতি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। এবং সেই মর্ম্মাহত হৃদয়ের অনলশিখায় অল্পদিন পরেই "মগের মুলুক" জন্মিল।

অতঃপর জমিদারের কার্য্য-অন্তে তিনি কলিকাতা হইতে সেরপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে কবি গোবিন্দদাস জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সেরপুরে চলিয়া আসেন। পথে ময়মনসিংহের জমিদার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি ময়মনসিংহ নগরের একপ্রান্তে অবস্থান করিতেন। তাঁহার সুরম্য ভবনের নাম "দেব নিবাস"। কবি গোবিন্দচন্দ্রের বহু কবিতা "দেব নিবাসে" রচিত হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্র যখন ১২৮৫ সনে জয়দেবপুর-রাজের পার্শ্বচর কর্ম্মচারী ছিলেন তখন দেবেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। এককালে দেবেন্দ্রকিশোরের "দেব নিবাস", শোক জর্জ্জরিত, দগ্ধহৃদয় কবির শান্তি নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র যখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে উৎকট বিভীষিকা দেখিতেছিলেন, তখন দেবতুল্য দেবেন্দ্রকিশোরই তাঁহার সম্মুখে আশার আলো প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রকিশোর গোবিন্দচন্দ্রকে পরম বন্ধুরূপে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন,—এমন কি, একবার গুপ্ত ঘাতকের হস্ত হইতে কবিকে রক্ষাও করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রকিশোরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ কবি, "ফুলরেণু" কাব্যগ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"দেবেন্দ্র ! দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি,
ত্রিদিব হইতে উচ্চ হৃদয় তোমার,
চির বসন্তের উহা পুষ্প রাজধানী,
চিরফুল্ল ও নন্দনে মমতা-মন্দার !
বহিছে অমৃত-গঙ্গা স্নেহ করুণার,
সিক্ত করি সদা প্রেম-কল্পতরুমূল,

দরিদ্র দুঃখীরা তব দেব-পরিবার
অবিরত ভুঞ্জে তাহা আনন্দে আকুল !”

* * *

দেবেন্দ্রকিশোরের মত উদারহৃদয়, নিস্বার্থ, পরোপকারী পুরুষ একালে বিরল। তিনি বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। কবির সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়ের প্রণয় পরবর্ত্তী কালে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকিশোর এখন পরলোকে।

যাহা হউক, দেবেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে দেখা করিয়া কবি গোবিন্দদাস তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অবশেষে এ বিষয়ে আরও নানারকম কথার আলোচনা করিয়া কবি সেরপুরে চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দচন্দ্র সেরপুরে আসিয়া কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতর দিবানিশি ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। নির্ব্বাসিত কবি, তাঁহার শোচনীয় পরিণামের কথাই দিবারাত্রি ভাবিতে লাগিলেন। প্রাণের বেদনায় কবি তখন অস্থির।

১২৯৯ সনের শ্রাবণ মাসে আবার কবি গোবিন্দচন্দ্র কলিকাতা আসিয়া “আনন্দ আশ্রমে” উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধুবর দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়কে নির্ব্বাসনের আমূল ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আরও বলিলেন, ভাওয়ালের বর্ত্তমান অবস্থা, রাজা ও রাজ্যের ইতিহাস সম্বলিত একখানি কাব্য তিনি রচনা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট তাঁহার নির্ব্বাসন কাহিনী ও নির্বিচারে গুরুদণ্ড বিধানের কথা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করেন।

তদনুসারে তিনি কলিকাতার অনেক সংবাদপত্র সম্পাদকগণের

সঙ্গে দেখা করিয়া স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু নানা কারণে, নির্ব্বাসিত দরিদ্র কবির কাতর প্রার্থনায় একমাত্র 'নব্যভাবত'' সম্পাদক ব্যতীত আব কাহারও হৃদয় বিচলিত হইল বলিয়া মনে করা যায় না। "প্রকৃতি'' সম্পাদকও প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। অপর কেহই সাহস করিয়া স্ব স্ব কাগজে কবি গোবিন্দচন্দ্রেব সপক্ষে লেখনী ধারণ করিলেন না। সংবাদপত্রই লোক-মত গঠনের সহায়তা করে এবং সংবাদপত্রই সর্ব্বসাধারণের চালক। দেশেব ও দশের দোষ সংশোধন করাও সংবাদপত্রের কার্য্য। সংবাদপত্রই সর্ব্বসাধারণের নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচক। এই বিশ্বাসে তিনি সম্পাদকগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাব আবেদন পত্রস্থ কবিয়া সর্ব্বসাধাবণেব শ্রুতিগোচব করিলেন না। নিঃসহায় কবি হতাশ হইলেন। এই বিষয়ে গোবিন্দচন্দ্রেব প্রমুখাৎ আমরা নানা কথা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী শ্রবণে "দৈনিক'' কাগজের সম্পাদক সেনগুপ্ত মহাশয়ের উক্তি, এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। কবি গোবিন্দচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

"যখন বাঙ্গালার সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট গিয়া আমার নির্ব্বাসন সম্বন্ধে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া, তাঁহাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি, তখন বঙ্গবাসী আফিসেও গিয়াছিলাম। সেখানে যোগেন্দ্র বাবু কৃষ্ণ বন্দ্যো, দৈনিকের সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহাদের দলস্থ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমার নির্ব্বাসন সম্বন্ধে ও কার্য্য ত্যাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত অবস্থা শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিলেন, 'কালীপ্রসন্নের এতদিন পরে পদস্খলন হইল। রাজনীতি সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন এতদিন যে চাল দিয়া আসিতেছিল, যে কৌশল ও চাতুরী প্রদর্শন

করিতেছিল, আজ আপনাকে তাড়াইয়া সে চালে ভুল করিয়াছে, সে কৌশলে ও চাতুরীতে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছে। কোন দেশে কোন লোক, লেখকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে নাই। ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা নানা উপায়ে লেখকদিগকে বাধ্য করিয়া সাধারণ্যে তাহাদের মতের সমর্থন করায় ও এইরূপে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন যদি আপনাকে না তাড়াইয়া যে কোন উপায়ে হোক, আপনাকে বাধ্য রাখিতে, হাতে রাখিতে চেষ্টা করিত, তবেই তাহাকে বুদ্ধিমান বলিতাম। কালীপ্রসন্ন আপনার সঙ্গে বিবাদ করিয়া, আপনাকে তাড়াইয়া, নিতান্তই নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছে। অচিরে কালীপ্রসন্নের পতন অনিবার্য্য।' ইহার অল্পদিন পরেই মগের মুলুক লিখিতে আরম্ভ করি।"

সম্পাদকগণের * সহানুভূতি আকর্ষণে অসমর্থ হইয়া তিনি নিতান্ত অস্থির হইলেন—তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য তখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। এ যাত্রা কলিকাতা উপস্থিত হইয়া বন্ধুবর দেবীপ্রসন্নকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। কবির হৃদয়ের সমস্ত দুর্নিবার জ্বালা আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইল। এইভাবে কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইলে একদিন নির্ব্বাসিত কবির অনলস্রাবী লেখনী মুখে দুঃখের উৎস তীব্র বেগে ছুটিল।

"আনন্দ আশ্রমে" বসিয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র পাঁচ দিনে একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়া তাহার নামকরণ করিলেন, "মগের মুলুক।" একদিন সেই কাব্যের কতক অংশ পড়িয়া দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়কে শুনাইলেন। অবশেষে কাব্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে পাঠ করিতে দিলেন।

* সম্পাদকগণ বলিতে বিশেষভাবে সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদকগণের কথা বুঝাইতেছে।

গোবিন্দচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল "নব্যভারতে" তাঁহার রচিত ব্যঙ্গ কাব্য-খানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের তাহাতে একটু আপত্তি ছিল। ভবিষ্যৎদর্শী সম্পাদক বুঝিয়াছিলেন যে, এই কাব্য প্রচারিত হইলে একটা অনর্থ ঘটিবে; বিশেষতঃ মাসিকে প্রকাশিত না হইয়া সাপ্তাহিক মুদ্রিত হইলে, এই জাতীয় কাব্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়; এজন্য তিনি কবি গোবিন্দচন্দ্রকে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহা প্রচারিত করিতে পরামর্শ দিলেন।

তৎকালে কলিকাতা হইতে "প্রকৃতি" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। "প্রকৃতি" তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে।

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র "প্রকৃতি" জন্মগ্রহণ করে। কাগজখানা বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল এবং প্রবন্ধ নির্ব্বাচনেও সম্পাদক অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর কৃতীত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। "প্রকৃতি"র লেখকগণও সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম" রচয়িতা, "সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস" প্রণেতা; "নব্যভারত" সম্পাদক; পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন; নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ "প্রকৃতি"তে লিখিতেন। কাগজখানার প্রচারও নিতান্ত মন্দ ছিল না।

"নব্যভারত" সম্পাদকের সঙ্গে "প্রকৃতি" সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। একদিন তিনি কবি গোবিন্দচন্দ্রকে "প্রকৃতি" সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিলেন এবং সেইদিন "মগের মুলুক" সম্বন্ধেও সম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। "প্রকৃতি" সম্পাদক "মগের মুলুক" মুদ্রিত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। "প্রকৃতি"র সহায়তা না পাইলে গোবিন্দচন্দ্রের "মগের মুলুক" প্রচারিত হইত কি না সন্দেহ।

"প্রকৃতি" পত্রিকার ২য় বৎসরের ১ম সংখ্যায় (১২৯৯ সনের ৫ই

ভাদ্র) "মগের মুলুক" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সংখ্যায় কতক অংশ প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অংশগুলি ক্রমশঃ ১৯এ ভাদ্র; ৯ই আশ্বিন; ২৪এ পৌষ; ২রা মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এবং ২৩এ মাঘের সংখ্যায় "মগের মুলুক" সমাপ্ত হয়।

"মগের মুলুক" একখানি বিদ্রূপরসাত্মক কাব্য। ইহাতে কবি গোবিন্দদাস ভাওয়াল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালের প্রজামণ্ডলীর উপর অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনী অগ্নিময়ী ভাষায়, কবি সেই কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। রাজ্যের বহুতর কলঙ্ক-কাহিনী, তাঁহার লেখনীমুখে উল্কাবেগে নির্গত হইয়াছিল। সে সকল কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে,—কভু নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়—কখনো বা রোষে ধমনীর রক্ত তীব্রবেগে চলিতে থাকে,—আবার কখনো হাস্যরসে মনকে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। কাব্যখানির রচনার ভঙ্গিমাও অপূর্ব্ব!! কবিত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে "মগের মুলুকে"র ভাষা ও ভাব সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। স্বভাব-কবির প্রতিভা "মগের মুলুকে" অতি বিচিত্র ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। এই কবি প্রতীচ্যে আবির্ভূত হইলে একমাত্র "মগের মুলুক" তাঁহাকে বিশেষভাবে লোকবিশ্রুত করিতে সক্ষম হইত।

"মগের মুলুক" একখানি অতি তীব্র ব্যঙ্গ-কাব্য। ইংরেজিতে যাহাকে satire বলে, ইহা ঠিক সেই পর্য্যায়ের। কিন্তু ব্যঙ্গ-কাব্য হইলেও ইহার সার্থকতা আছে, নিতান্ত কাল্পনিক ভিত্তির উপরও ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে। অত্যাচার, অবিচার, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি পাপ-নিচয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। কাব্যের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ সেই অপূর্ব্ব ভাষাময় তীব্রবাণে বিশেষ রূপে আহত হইয়াছিল। কবির উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল।

"প্রকৃতি" পত্রিকায় "মগের মুলুক" কাব্যের কতক অংশ মুদ্রিত হইলে কবি গোবিন্দদাস সেরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এ যাত্রা কলি- কাতা আসিয়া তিনি দীর্ঘ দিন অবস্থান করিলে, সেরপুরের জমিদার-পুত্র (অধুনা রায় বাহাদুর) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে শীঘ্র সেরপুরে ফিরিতে পত্র লিখেন। তদনুসারে তিনি ১২৯৯ সনের পৌষ মাসে সেরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"প্রকৃতি"তে "মগের মুলুক" প্রকাশিত হইলে ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "প্রকৃতি"র সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ এবং সত্বাধিকারী প্রভৃতির নামে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এক মানহানির অভিযোগ করেন। ঘোষ মহাশয় উক্ত মোকর্দ্দমা সম্পর্কে আদালতে ইংরেজি ভাষায় যে স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অভিযোগের ফলে "প্রকৃতি" পরিচালকগণের নামে ওয়ারেণ্ট জারি হয়। গোবিন্দদাস মোকর্দ্দমার কথা জানিতে পারিয়া ময়মনসিংহে বন্ধুবর দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর আলয়—"দেব নিবাসে" উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, "মগের মুলুক" সম্বন্ধে দেবেন্দ্রকিশোরের পরামর্শ গ্রহণ।

তখন ১২৯৯ সনের মাঘ মাসের শেষ। ইতোমধ্যে কলিকাতা হইতে কবি গোবিন্দচন্দ্রকে "প্রকৃতি"র সম্পাদক নিম্নলিখিত দুইটি তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন।

(১ম)

11th February 1893

"Raja Rajendra's Case 20 February meet us Dacca East office positively with all necessaries."



হইয়াছে। বাস্তবিক অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা হইতে অভিযোগের নকল আনাইয়া মোকর্দ্দমার পূর্ব্বেই তাহা মুদ্রিত করিয়া পুস্তিকার সঙ্গে প্রকাশ করা নিতান্ত সামান্য কাজ নহে। ইহাতে কবি গোবিন্দচন্দ্রের কার্য্যতৎপরতায় আশ্চর্য্য হইতে হয়।

"মগের মুলুক" পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইলে, দেখিতে দেখিতে কবি গোবিন্দদাসের নাম সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমন কি অনেকে মুদ্রিত পুস্তিকার অভাবে সমগ্র কাব্যখানি হাতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখনও অনেকের কাছে হস্তলিখিত "মগের মুলুক" পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে "মগের মুলুক" বিলুপ্ত হয় নাই—হইবেও না।

সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গেল। ...খা গিয়াছিল তাহা আশ্চর্য্যজনক। ...থেষ্ট গ্রাহক বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

... কবি গোবিন্দচন্দ্র, ঢাকার উকীল ... করিলেন এবং তিনি যে "প্রকৃতি" ...ায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাও ... ঈশ্বরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, এই ... নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

... শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি ...য়িতে যে সকল প্রমাণের প্রয়োজন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। নির্ভীক ভাবে তিনি যে, কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তিনিই যে কবিতার লেখক, তাহা আর কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং ঘটনার গতি ফিরিয়া গেল। চারিদিকে প্রচারিত হইল যে, মোকর্দ্দমা আপোষে মিটিয়া যাইবে। কবি গোবিন্দচন্দ্রও অনুসন্ধানে এই কথা জানিতে পারিলেন। "প্রকৃতি"র পরিচালকগণের সঙ্গে একদিন দেখা করিতে যাইয়া তিনি ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে আর বাক্যালাপ না করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। তখন কবি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নির্ভীকতা এবং আত্ম-সম্মান-বোধ, এই ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, তথা হইতে কবি ফিরিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তিনিই অনুষ্ঠাতা হইয়া এই মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিলেন। ঢাকার অনেক বিশ্বস্ত সাহিত্য সেবকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, সাহিত্য-

সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নাকি এই মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলিতে ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি নাকি সেই পত্র দেখিয়াছেন।

অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভা আহূত হয় এবং "প্রকৃতি" সম্পাদক উক্ত সভায় ঘোষ মহাশয়কে একখানি ক্ষমা প্রার্থনা পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্রে সম্পাদক অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বলেন।

যথাসময়ে তাহা বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রার্থনা করেন।

সুতরাং মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। বিচারক রায়ে লিখিলেন,

"Accused acquitted, the case being compromised under section 345 (1), 3rd April 1893."

ঢাকায় যখন এই ব্যাপার, কলিকাতা হইতে তখনও "প্রকৃতি" প্রকাশিত হইতেছিল। যথাসময়ে সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা পত্রটি "প্রকৃতি"তে মুদ্রিত করিলেন।

১২৯৯ সনের ২৭এ চৈত্র সংখ্যায় "ক্ষমা পত্র" শিরোভূষণে সেই পত্রখানি প্রকাশিত হইল। পত্রখানির নিম্নে তারিখ ছিল, "ঢাকা—৩রা এপ্রিল ১৮৯৩।"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উক্ত "ক্ষমাপত্র" প্রত্যেক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক কাগজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে তাহা বঙ্গদেশের প্রায় সকল কাগজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। সে সময়কার দেশের লোকে জানিতে পারিয়াছিল যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মোকর্দ্দমায় জয়ী হইলেন। এতদুপলক্ষে দাস-কবি একখানি পত্র আমাদিগকে একবার লিখিয়াছিলেন ;—

" 'প্রকৃতি'র-সম্পাদক আমার লিখিত 'মগের মুলুকে'র হস্তলিপি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে দিয়াছিলেন। এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি,

তাহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকর্দ্দমা করিতে সাহস পায় নাই প্রমাণের আমার অপ্রতুল ছিল না।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

কেবল ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে "প্রকৃতি" পত্রিকাখানা বিলুপ্ত হইল। এই নিষ্পত্তি সম্বন্ধে এবং "প্রকৃতি"র প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়া সম্পর্কে, আরও অনেক কথা সর্ব্ব সাধারণ্যে প্রচারিত আছে। সে সকল কথা এখন জনশ্রুতিতে পরিণত। তাহা আর আলোচনা করিব না।

এই ভাবে, "মগের মুলুক" নাটকের যবনিকা পতন হইল ; নতুবা ইহার শেষ অঙ্কে হয়ত, নানা অপ্রীতিকর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইত।

নির্ব্বাসন অনল-দগ্ধ, নির্য্যাতিত গোবিন্দদাস "মগের মুলুক" লিখিয়া ভাল কি মন্দ কাজ করিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। নিষ্পেষিত না হইলে মানুষের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে না, একথাও সত্য। নিজে অত্যাচারিত না হইলে, ভাওয়াল রাজ্য সম্পর্কে গোবিন্দদাস লেখনী ধারণ করিতেন কি না বলা যায় না। তবে জগতে একের কুৎসা অপরে প্রচার না করে, তাহাই বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে গোবিন্দদাসকে প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু উৎপীড়িত, অসহায় গোবিন্দচন্দ্রের কথা মনে পড়িলে, তাঁহার প্রতি সহানুভূতিই জাগিয়া উঠে। "নির্ব্বাসিতের আবেদনে" তাঁহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে, মনুষ্য-হৃদয়ে করুণারই সৃষ্টি হয়। এ-কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ?

তিনি কাতর প্রাণে অথচ নির্ভয়ে লিখিয়াছিলেন,—

"তোমরা বিচার কর—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির-নির্ব্বাসন !

বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি এই কি কারণ?

* * *

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা!
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা!

* * *

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে!
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে!"

তারপর ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কঠোর ভাষায় লিখিলেন,—

"বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা;
হৃদয়ে নাহিক মোটে জ্ঞানের উদয়;

এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়!
এরা আহা চক্ষু খেয়ে,
একটু দেখে না চেয়ে,
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয়!
ও উচ্চ শিক্ষায় ধিক্,
আমি যা দিয়েছি—ঠিক্
জগতে জঘন্য হেন নাহি নীচাশয়,
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?"

আবার তেজস্বী কবি গম্ভীর স্বরে, দেশবাসিগণকে আশার বাণী শুনাইলেন;—

"কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন?
আমার জীবন-আয়ু,
তোমারি মা জল বায়ু,
তোমারি স্নেহের সব মমতা-মাখন।
যদি মা তোমারি হিতে,
পারি এ জীবন দিতে,
এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন,
কি আছে সৌভাগ্য আর,
এর চেয়ে মা আমার?
আমি যে তোমারি ক্ষুদ্র প্রাণের নন্দন!



অপ্রকাশিত পত্র হইতে গৃহীত। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় রাণী বিলাসমণি দেবী, ১৩১৮ সনে ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে, কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষট্টি হাজার টাকার দাবীতে যে অভিযোগ আনয়ন করেন, তাহার মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠ করিলেও এই ঘটনা অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। উক্ত অভিযোগে,

হরণের কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছিল, তাহা ...ইতে হয়। একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের এ ... লজ্জাজনক সন্দেহ নাই। উক্ত রাণী বিলাস- ...র একস্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া-

...' নামে একখানা সংবাদপত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে ...র, তাহাতে বিবাদী ঐ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ...এক মানহানীর মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। ...পরিহার জন্য, বিবাদী ঐ মোকর্দ্দমা আপোষ ...মণি দেবীর মুদ্রিত অভিযোগের প্রতিলিপি।

...ইতিহাস। নির্ব্বাসিত কবি একদিন কাতরে, ...ড়ে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের নিকট পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিয়া- ...লেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ প্রমুখ সমস্ত দেশবাসিগণের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে, তাঁহার নিষ্ফল প্রয়াসের প্রবল উত্তেজনায় "মগের মুলুক" রচিত হইয়াছিল। এই ব্যঙ্গ কাব্যখানি বাঙ্গালার ...ব্য-সাহিত্যে,—বিশেষতঃ সাহিত্যের ইতিহাসে ভাওয়ালের যে পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনী অগ্নিময়ী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কলঙ্ক-দাগ আর বিলুপ্ত হইবার নহে।

আমরা সে সকল ঘৃণিত কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই ব্যঙ্গ কাব্যখানির রচনা-ভঙ্গী প্রদর্শন জন্য ...র প্রথম কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "প্রকৃতি" ২য় বৎসরের ১ম সংখ্যায় "মগের মুলুক" যে ভাবে মুদ্রিত ...ইা তাহারই প্রতিলিপি।

"মগের মুলুক"

"বঙ্গদেশে আছে একটী 'স্বর্ণপুর' গ্রাম,
গাছ গাছ্‌লায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম!
রাঙ্গামাটী, পলাকাটী খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হ'য়ে যায় মৈনাক শত শত!
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহাব মন্দ মন্দ গতি।
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ-ছাই,
মাখি বুকে, মনের সুখে যখন সেথা যাই!
পূবের ধারে, গাঙ্গের পারে শ্যামল তপোবন,
চাঁপাবনে চাতক ডাকে চম্‌কে উঠে মন।
কলসী কাঁখে, আঁচল মুখে মেয়েগুলি আসে,
পাতা ঢাকা ফুলের মত কাঁপর হয়ে হাসে!
কেউ বা পড়ে, কেউ বা ধরে, উঠে ভিজা পায়,
পিছ্‌লা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলসী ভেঙ্গে যায়।
পূবের দিকে পদ্মভরা বিলের সীমা নাই,
পিপি ডাকে, কোড়া ডাকে, কালেম, কড়্গাই!
উত্তরে তার হাজার হাজার বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুঁখে খেলায় হরিণগণ!
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেকম ধরে কত,
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত!
বারমাস-ই ফুলের হাসি হয় না বাসি তায়,
ছায়া ঢাকা, স্নেহমাখা, মায়ের মতন প্রায়!

নানান্ ছন্দে নানান্ গন্ধে শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয়!
টিলার পাশে ঝর্‌ণা বহে—ঢাল্ গড়ানে ভুঁই—
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই!
ফাগুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা,
ধুঁয়ায়, ধুঁয়ায় দিক্ ছেয়ে যায়, আকাশ আঁধার করা!
চৈত্র মাসে, জোর বাতাসে, উড়ে তুলা রাশি,
পোড়া বনের, পোড়া মনের, শুষ্ক শ্বেত হাসি!"

"মগের মুলুক" রচনার বহু বর্ষ পরে—১৩০৩ সনে তাঁহার রচিত "নির্ব্বাসিতের আবেদন" কবিতা প্রকাশিত হয়। "চন্দন" নামক গীতিকাব্যে ইহা স্থান পাইয়াছে। সমগ্র দেশবাসিগণের নিকট তাঁহার কাতর প্রার্থনা এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। শুনা যায় যে, তদানীন্তন, সমগ্র দেশবাসিগণের নিকট হইতেও কবি কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন নাই। কি দুর্ভাগ্য ও গভীর পরিতাপের কথা! কিন্তু নির্ব্বাসিত, উপেক্ষিত কবির প্রতি দেশবাসিগণের এই অনাদর ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

বাঙ্গালার কোন কবিভাগ্যে মৃত্যু-কল্প নির্ব্বাসন আর ঘটিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। অভাব এবং অন্নকষ্টে অনেক কবিই নিপীড়িত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এমন ঘটনা সচরাচর ঘটিতে দেখা যায় না। এজন্য দায়ী কে?—ভাওয়াল, না সমগ্র বঙ্গদেশ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:•:——

কবির বিপদ,—দ্বিতীয়বার বিবাহ,—কন্যাশোক,—"কস্তুরী", "চন্দন", "ফুলরেণু" রচনা,—কর্ম্মত্যাগ,—ভাওয়ালে প্রত্যাবর্ত্তন,—দানবীর রাজা জগৎকিশোরের দয়া।

"মগের মুলুক" সম্পর্কীয় ঘটনার পরিসমাপ্তি হইলে, কবি গোবিন্দদাসের জীবনের উপর দিয়া বহু বিপদের ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়। তিনি তৎকালে, নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইতে থাকেন ;—সর্ব্বদাই তাঁহার পশ্চাদ্দেশে গুপ্তচর ঘুরিতে থাকে ;—এমন কি, অনেকবার গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু, জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অননুভবনীয়রূপে প্রত্যেক বারই সকল বিপদ হইতে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার আসন্ন বিপদ ঘনীভূত হইতেছে, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ বেনামী পত্র পাইয়া সতর্ক হইয়াছেন। নানাস্থান হইতে তিনি অপরিচিত হস্তলিখিত পত্র পাইতেন। কে তাঁহাকে সেই সকল পত্র লিখিয়া সতর্ক করিতেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিতেন না। বিধাতার কি অপরিমেয় করুণা!

তারপর তিনি কর্ম্মোপলক্ষে যে যে স্থানে অবস্থান করিতেন, তথা হইতে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু, গোবিন্দচন্দ্রের বন্ধুগণ এবং প্রতিপালকগণ কেহই সে সকল ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা সম্ভবপর হইতেছে না।

আমরা দাস মহাশয়ের শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, তৎকালে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথে পরিভ্রমণ কালে তিনি অতি সতর্কতা অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেন। এমন কি, জীবনাশঙ্কায় অনেক সময় ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার গুপ্ত হত্যার জন্য নানাস্থানে গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত হইয়াছিল।

একদা এক ব্যক্তি, সেরপুরের জমিদার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, কবি গোবিন্দদাসের বহু দোষ কীর্ত্তন করতঃ, তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

কলিকাতার "নব্যভারত" সম্পাদক পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকটও, একজন লোক একবার একখানা পত্র দিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে দেবীপ্রসন্ন আমাদিগকে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন;—

"আমার এখানে থাকার সময় কালীপ্রসন্ন বাবুর একজন লোক আমাকে হত্যা করিবে ভয় দেখাইয়াছিল; সে পত্র আমি সংবাদপত্রে এবং কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট দিয়াছিলাম। "সময়" প্রভৃতি পত্রে সেই পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।"

আবার ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "নব্যভারতে" দেবীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন;—

"আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম বলিয়া, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর কোন লোক এক সময়ে আমাদিগকে হত্যা করার ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিল। আমরা তাহা "সময়" প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলাম, এবং রায় বাহাদুরের নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—'এক শ্রেণীর লোক আত্মীয়তা ভাঙ্গিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, আপনি কোন ভয় করিবেন না।'"

১৩০০ সনের বৈশাখে "মগের মুলুকে"র মোকর্দ্দমার অব্যবহিত পরে গোবিন্দচন্দ্র, ময়মনসিংহস্থ "দেব নিবাসে" আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেরপুরের চাকরির আশা তখন এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

তথায় অবস্থানকালীন কবি গোবিন্দদাসকে বিনষ্ট করিবার জন্য কয়েকজন হত্যাকারী, গুপ্তভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকে। দেবেন্দ্রকিশোর তাহা অবগত হইয়া, কবিকে একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কবি যে তথায় নাই, তাহা হত্যাকারীদের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। অবশেষে গোপনে দাস-কবিকে সেরপুরে পাঠাইয়াছিলেন। হত্যা সম্বন্ধে কবি গোবিন্দদাসের নিজের উক্তি নিম্নে লিখিতেছি ;—

"আমি কলিকাতা হইতে, কি অন্য কোথায়ও হইতে ময়মনসিংহে যাইবার সময়, আমাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে ধরিয়া মারিবার জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের ষ্টেশনে লোক নিযুক্ত * * * ছিল। আমি রাত্রির গাড়ীতে ছাড়া দিনের গাড়ীতে যাতায়াত করিতাম না। গাড়ীতে উঠিয়াই পার্শ্বস্থ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে আমার

অবস্থা জানাইয়া, ষ্টেশনের নিকট গাড়ী আসিতেই, গায় মাথায় কাপড় দিয়া, মাথা গুজিয়া টুলের উপর পড়িয়া থাকিতাম। আর সেই লোকেরা আমার রক্ষার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের যে সকল ষ্টেশন ভাওয়ালে অবস্থিত, তাহাতে রাজার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেই সকল ষ্টেশনে রাজার লোকে গাড়ী হইতে কাহাকেও টানিয়া নিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্যই এত ভয়ে ও সতর্কতার সহিত আমি এই রেলপথে যাতায়াত করিয়াছি।"

"মগের মুলুকে"র মোকর্দ্দমার পর তিনি অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন; সে সকল কাহিনী অতীব আশ্চর্য্যজনক। মানুষের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার যে সকল উপায় আছে, তাহার অধিকাংশই কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর "মেসো" মধুসূদন কর তাঁহার প্রতি কোন গুপ্ত কারণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে "প্রেম ও ফুল" কাব্য মুদ্রিত করিতে ২০০৲ টাকা ঋণ করিয়াছিলেন এই দাবীতে তিনি ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জে অভিযোগ করেন। মধুসূদন, অপরের ইঙ্গিতে এই কাজ করিয়াছিলেন। বিচারে মোকর্দ্দমা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহার কারণ এই যে, ১২৯৯ সনে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ১২৯৪ সনে তাঁহার "প্রেম ও ফুল" মুদ্রিত হয় এবং প্রেসের টাকাও পূর্ব্বেই পরিশোধ করা হইয়াছিল। সুতরাং ঋণ গ্রহণ করার কথাটা একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় মোকর্দ্দমার খরচ বাবদ গোবিন্দদাস ২০৲ টাকার ডিক্রি পাইলেন।

এ রকম অদ্ভুত আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আর একবার কবি গোবিন্দদাস গুপ্তঘাতকের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহার কাহিনী লিখিতেছি।

একবার গোবিন্দচন্দ্র, তাঁহার মাতুল শ্বশুরালয় লতপদী গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। লতপদীর পশ্চিমে "রাঙ্গা মালীয়া" নদী। তখন বর্ষাকাল। কুলপ্লাবিনী, খরস্রোতা নদীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া কবি-সুলভ প্রলোভনে তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার পরমাত্মীয় জনৈক ভদ্রলোক ছিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে, গগনমণ্ডল নীরদমালায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইল। গ্রাম-পথের দুই দিকে ঘন শস্যক্ষেত্র। সেই বর্ষণ-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায়, দাস মহাশয়েরা শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া গ্রামাভিমুখে দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। হঠাৎ শস্যক্ষেত্র হইতে চারিজন ভীমদর্শন মুসলমান দীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে বহির্গত হইয়া দাস মহাশয়ের মস্তকে একযোগে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার মস্তকের ছত্র সেই আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে সেই যাত্রা রক্ষা পাইলেন। অতঃপর তিনি প্রাণভয়ে বেগে পলাইতে আরম্ভ করেন। সে সময় তাঁহার আত্মীয় দস্যুদিগকে বাধা প্রদানে উদ্যত হইলে, তাহারা কবিকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করে। ইতোমধ্যে জনৈক দুগ্ধবিক্রেতা, সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলে আততায়ীগণ পলায়ন করিল। আমরা শুনিয়াছি যে "মগের মুলুক" রচনা করিয়াই তিনি এই বিপদে পড়িয়াছিলেন।

১২৯৯ সনের ১লা মাঘ প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর প্রায় সাত

বৎসর পর, কবি গোবিন্দদাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মাতুল এবং তাঁহার গুরু মদনমোহন গোস্বামী মহাশয় এই বিবাহ স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার কবির তৎকালীন প্রতিপালক হবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় দয়াপূর্ব্বক বহন করিয়াছিলেন।

কবি-পত্নীর নাম প্রেমদাসুন্দরী। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রাম নিবাসী ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা। কবির বিবাহের সময় ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালিনী রমণী ছিলেন। পুরুষমহলে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাকে গ্রামের সমাজপতিগণ তুচ্ছ করিতেন না। কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য পুরুষদিগের বৈঠক বসিলে তিনি সময় সময় তথায় উপস্থিত থাকিতেন। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতা বশতঃ তিনি উপনেত্র পরিধান করিতেন। পল্লী বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। প্রকাশ্যে তাঁহাকে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইত না,—তিনি এতদূর 'রাশভারী' স্ত্রীলোক ছিলেন। পরোক্ষে, বালকেরা তাঁহাকে 'ব্যারিষ্টার' বলিত এবং এককালে গ্রামের ভিতর "ব্যারিষ্টার" নামেই তিনি সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রখরা বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত বাক্‌পটু স্ত্রীলোক ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বলিবার উদ্দেশ্যে এই যে, তিনি একদা অন্যায়রূপে কবি গোবিন্দদাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের পরমাত্মীয়া হইয়াও তাঁহার হিতচেষ্টা হইতে বিরতা ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রও "বিক্রমপুরে বসন্ত" নামক তাঁহার বিরচিত ব্যঙ্গ-কবিতায় ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। একে দিদি শাশুড়ী,—রহস্যের পাত্রী, তদুপরি নাত্‌জামাইএর বিপক্ষাচরণ! এই সকল কারণে

সেই ব্যঙ্গ-কবিতাটি বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আমরা পরে বলিব।

কবির শ্বশুরালয়, বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রাম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া, তাহার পদ চুম্বন করিতে করিতে, সাগরতুল্য অতিকায়, সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী পদ্মা, ধীরে গম্ভীরে গন্তব্যপথে চলিয়াছে। এককালে ব্রাহ্মণগ্রাম, পদ্মার তটভূমি হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নিকটস্থ গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া পদ্মা, সম্প্রতি এই গ্রামখানির প্রতি তাহার ভীষণ কটাক্ষপাত করিতেছে। কে বলিবে, গ্রামখানি কবে কোনদিন পদ্মার কুক্ষিগত হইবে?

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া, একদা সন্ধ্যায় পদ্মাতীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তখন বর্ষার প্রারম্ভ—পদ্মার দুর্দ্দমনীয় শক্তি প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। নিতান্ত হৃদয়হীনার মত পদ্মা, তাহার জলোচ্ছ্বাসে তটভঙ্গ করিয়া ভীষণ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছিল। এই উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মের বিরাট পার্ব্বত্য প্রদেশের সুগম্ভীর দৃশ্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জাগিতেছিল। অতি নগণ্য ভাষায় আমরা সেদিন লিখিয়াছিলাম,—

আজি এই পদ্মাতীরে, নিরজনে সন্ধ্যাবেলা
ঝরিতেছে নয়নের জল,
গভীর নিরাশা মগ্ন, অশান্ত প্রাণের মাঝে
জ্বলিতেছে চিন্তার অনল!
হেরিতেছি নদীবক্ষে, উত্তাল তরঙ্গমালা
অবিশ্রান্ত পড়ে আছাড়িয়া,
যেন লক্ষ সর্প শিশু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফণা তুলি',
খেলা করে দুলিয়া দুলিয়া!

সৈকতে তরঙ্গ আসি, আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে
উন্মাদিনী রমণীর প্রায়,
তট মৃত্তিকার রাশি, ক'রিতেছে আত্মত্যাগ
সে উত্তাপে সলীল-শয্যায়!
নৈশ সমীরণ আসি, নারিকেল তরু শিরে
থেকে থেকে করে হাহাকার,
পেচক কর্কশ কণ্ঠে, আম্রবনে বসি' বসি',
মাঝে মাঝে করিছে চিৎকার!
হেন সন্ধ্যাকালে আজি, জাগিতেছে মনোমাঝে
সে অপূর্ব্ব পর্ব্বত প্রদেশ,
কি চারু সে বনভূমি! —সেথানে নাহিক রাজে
প্রকৃতির এ ভীষণ বেশ।
সেথা দৃশ্য সুগভীর, মহান্ পর্ব্বতমালা
ধ্যান মগ্ন মহর্ষির মত,
অগণিত গিরিনদী, প্রাণারাম প্রস্রবণ,
নির্ঝর, গহ্বর শত শত!
অনন্ত আকাশ গায়, নীল শৈল শোভা করে
মনোহর ছবির মতন,
সম্মুখে গভীর বন, ঝিল্লি রবে মুখরিত
কি মধুর সন্ধ্যার পবন!

● ● ●

যাহা বলিতেছিলাম। পদ্মার ভীষণ-মধুর বিরাট দৃশ্য বাস্তবিকই পরম উপভোগ্য। আমরা বহুদিন কবি গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে পদ্মাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে, কবি-প্রদর্শিত সন্ধ্যাকালের রমণীয়তা এবং সূর্য্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। প্রায় প্রতিদিন সায়াহ্নে, কবি পদ্মাতীরে পরিভ্রমণ করিতেন এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া নিসর্গের শোভা সন্দর্শন করিতেন।

ব্রাহ্মণগ্রাম শ্বশুরালয় হইলেও তিনি এখানেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পরলোকে। তাঁহার একমাত্র শ্যালক অল্পদিন পর দেহত্যাগ করেন। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে, প্রেমদা পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলে, আশ্রয়হীন গোবিন্দচন্দ্র ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিবার সুযোগ লাভ করেন।

নির্ব্বাসিত হওয়ার পর কবি, অবশিষ্ট জীবন এই গ্রামেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩০২ সনে তাঁহার রচিত "কস্তুরী" কাব্যের উৎসর্গ পত্রে তিনি পদ্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"শ্মশান ধুইয়া তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে,
কল তানে, মৃদু গানে, বনে বনে ঘুরি,
অকস্মাৎ পাশে তার, বহে মন্দাকিনী ধার—
ভীষণ গর্জ্জনে পদ্মা ব্যোম ভাঙ্গি চুরি!"

ব্রাহ্মণগ্রামে অবস্থিত তাঁহার বাড়ীখানি সামান্য গৃহস্থ আলয়। দরিদ্র কবির দুইখানি গৃহ,—একখানি শয়নের ও অপরখানি রন্ধনের। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আম্রবন,—এক পার্শ্বে পুষ্করিণী। কবি-গৃহের বহির্ভাগে একটি দেবদারুর বৃক্ষ ছিল,—এখন আর তাহা নাই। বাড়ীখানিও বিশেষত্বহীন।

এই বিবাহের পর তিনি তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয়ার তুলনা মূলক যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব।

"সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পুবে
জীবন গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,

অপূর্ব্ব সুন্দরী উষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া !
প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর-সজ্জা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই তীরে, আম কাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা বিছানায় !
নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে ।

* * *

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁফরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে ?"

মানব মনের স্বাভাবিক অবস্থার কথা তাঁহার অসাধারণ লেখনী ইহাতে একটি সরস চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যাহা বঙ্গপল্লীতে প্রতিদিনই ঘটিতেছে। এ দৃশ্য আমাদের সমাজে বিরল নহে।

সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর যে গোবিন্দদাস একদিন প্রাণের অশ্রু দিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"আজ,
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর ?
তোমার অধিক শোভা, ততোধিক মনোলোভা
শোয়ায়ে দিয়াছি চাঁদ চিতার উপর !"

আবার সেই গোবিন্দদাসই সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর পর আক্ষেপ করিয়া লিখিলেন,—

"হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে ?"

সারদাকে হারাইয়া প্রেমদাকে গ্রহণ করিবার অপরাধ যদি কিছু গোবিন্দের হইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক। জগতে এই প্রকার ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে। তথাপি প্রেমদাকে বিবাহ করিয়া সারদার কথা কি কবি ভুলিতে পারিয়াছিলেন ? সারদার নিষ্কলঙ্ক, অতুল, অপরিমেয় প্রেমের কথা কি কবি বিস্মৃতির অতল জলধি তলে ডুবাইতে পারিয়াছিলেন ? কখনই না। এই মর-জগতে কেহ তাহা পারেন কি না জানি না,—কিন্তু কবি গোবিন্দদাস তাহা পারেন নাই। তাই নিতান্ত সহজ, সরল ভাষায় "পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি, ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে।" বলিয়া—প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া—সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর অবসানে কবি গোবিন্দচন্দ্রের আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। "কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জ'নে পিছনে লাগা" ইহা সরল প্রাণের সরল কথা। এমন করিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা নিতান্ত প্রশংসনীয়। "উদ্ভ্রান্ত প্রেম", "হিমালয়" প্রভৃতির গ্রন্থকারগণ পরবর্ত্তী কালে বিগত জীবনের কোন কথাই এমন ভাবে উল্লেখ করেন নাই!

কবি গোবিন্দচন্দ্র ১২৯৯ সনের ১লা মাঘ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সে সময় তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগ পরিপূর্ণ। "মগের মুলুকে"র কতকাংশ তখন "প্রকৃতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে,—বিশেষতঃ ভাওয়ালে, কবিপ্রসঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে। তাঁহার মস্তকোপরি তখন একখানি কাল মেঘ সজ্জিত হইতেছিল।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অশান্তির গুরুভার-নিপীড়িত কবি, তখন বরবেশে পদ্মাতীরে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন! কবির মুখে কতদিন শুনিয়াছি, "সহস্র বিপদ আসিলেও আমি ভয় করি না,—নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাই। আমি বিপদকে কোন দিনই ভয় করি নাই।"

সারদার শোকে মুহ্যমান কবির এই বিবাহের কথা,—চারিদিকে অশান্তির ছায়া দেখিয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে বরবেশে যাত্রার কথা, মনে হইলে, আমরা কবি অক্ষয়কুমারের ভাষায় আবৃত্তি করি;—

"হৃদয়ের একপ্রান্তে আজ
জ্বলিতেছে দারুণ শ্মশান
হৃদয়ের আর প্রান্তে আজ
স্বর্ণপুরী হতেছে নির্ম্মাণ।"

১২৯৯ সন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ১৩০০ সনও কবি গোবিন্দচন্দ্রের পক্ষে অশুভ বৎসর। তাঁহার পত্নী সারদার গর্ভজাত কন্যা মণিকুন্তলা এই বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

১৩০০ সনের বৈশাখ মাসে কবি গোবিন্দচন্দ্র যখন "দেব নিবাসে" বন্ধুবর দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর অতিথি, তখন তাঁহার জামাতা নিশিকান্ত, কবিকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে "নব্যভারত" সম্পাদকের আশ্রয়ে থাকিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে কবিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কবি গোবিন্দচন্দ্রের অনুরোধে, নিশিকান্ত "নব্যভারত" সম্পাদকের আলয়—"আনন্দ আশ্রমে" আসিয়া, কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন। নিশিকান্ত বি-এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে মণিকুন্তলার হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই দারুণ রোগে সোরজোয়েই কবিকন্যা, শেফালী

ফুলের মত অকালে ঝরিয়া পড়িল। মণিকুন্তলা যখন হৃদ্‌রোগে শয্যা-শায়িনী, কবি তখন সেরপুরে।

সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর পিতৃগৃহের সঙ্গে মণিকুন্তলার সম্বন্ধ এক-রকম ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল;—তার পর কবির নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে, পিতৃগৃহের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কবি গোবিন্দদাস তখন গৃহহীন,—নির্ব্বাসিত হওয়ার পর তাঁহার মাথা রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। এজন্য ইচ্ছা থাকিলেও, মণিকুন্তলাকে নিজের কাছে রাখিতে পারেন নাই।

অবশেষে কবি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে পর, মণিকুন্তলা পিতৃগৃহে আসিতে ব্যস্ত হইয়া প্রায়ই সকাতরে কবিকে পত্র লিখিতেন। কবি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কবি-কন্যার লিখিত সেই সকল পত্র আমরা দেখিয়াছি। পত্রগুলি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। সে সকল কথা এখানে আর উল্লেখ করিব না।

মণিকুন্তলার হৃদ্‌রোগ ১২৯৯ সনে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাতের দরুণ তাহার হৃদ্‌পিণ্ড আক্রান্ত হইয়াছিল। কবি গোবিন্দদাস তখন নির্ব্বাসিত হইয়া নানা ভাবে বিপন্ন। দেখিতে দেখিতে রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে, কবি অবশেষে মণিকুন্তলার চিকিৎসার জন্য তাহাকে "আনন্দ-আশ্রমে" আনয়ন করেন। কবি-জামাতা নিশিকান্তও তখন "আনন্দ আশ্রমে" ছিলেন।

"আনন্দ আশ্রমে" মণির রীতিমত সুচিকিৎসা, এবং তজ্জন্য নিশি-কান্তের যৎ কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্বেও মণিকে বাঁচাইতে পারা গেল না।

১৩০০ সনের ১৩ই কার্ত্তিক রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় পত্নী সারদাসুন্দরীর শেষ স্মৃতি কন্যা মণিকুন্তলা, কবি গোবিন্দচন্দ্রকে

অতি গভীর শোকে নিমজ্জিত করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে অনন্ত ধামে প্রয়াণ করিল।

কবি-কন্যা মণিকুন্তলা, যথোচিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে, কবি-জনোচিত শক্তিও বিকশিত হইয়াছিল। মণিকুন্তলা, কবিতা রচনা করিতে পারিত। মণির মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত বহু কবিতার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। গোবিন্দদাসের "কস্তুরী" কাব্যে তাঁহার রচিত একটিমাত্র কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

মণিকুন্তলার মৃত্যু উপলক্ষে কবি লিখিয়াছিলেন :—

"তৃতীয় প্রহর গত হেমন্তের নিশি,
অচেতন অন্ধকারে স্তব্ধ কলিকাতা,
জীবন যেতেছে যেন মরণেতে মিশি,
উলটিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক পাতা!
শায়িতা দ্বিতল গৃহে "আনন্দ আশ্রমে"
বিদেশে বিভূমে নাই আত্মীয় স্বজন,
একাকী বালিকা মেয়ে মহা পরাক্রমে
ভীষণ মৃত্যুর সঙ্গে করিতেছে রণ।"

মৃত্যুর পর কবি লিখিলেন ;—

"তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে,
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে সারদা তোমার!

* * *

ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চিরদগ্ধ রাহু,
একাকী ভ্রমিতে থাকি জগত বংলার,
নেও কোলে নেও মেয়ে—সারদা তোমার।"

কবিতাটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহা ভাবে ও ভাষায় গম্ভীর; দুঃখের কবিতা হইলেও ইহাতে, শোকের সে প্রবল উচ্ছ্বাস নাই। উপর্য্যুপরি শোক জর্জ্জরিত হইলে মানুষের আর সে চিত্ত চাঞ্চল্য থাকে না। দাস-কবিরও সেই অবস্থা। কবিতাটির আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহার ভাষা অত্যন্ত পরিমার্জ্জিত,—প্রাদেশিকতাবিহীন।

কন্যা মণিকুন্তলাকে হারাইয়াও কবি গোবিন্দচন্দ্রের শোক নির্ব্বাপিত হইল না। মণিকুন্তলার মৃত্যুর অল্পদিন পর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র সহোদর অতুলচন্দ্র পঠদ্দশাতে প্রাণত্যাগ করেন। এতদুপলক্ষে রচিত কবিতার বর্ণনাভঙ্গী অতিশয় মনোমুগ্ধকর।

কবিতার স্থানে স্থানে অতি সুন্দর নৈসর্গিক বর্ণনা আছে।

"শরতের শুক্লাষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সুতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির!
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়!"

আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ!

নিরাশার নিস্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থি চূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে!
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল!
দিক্‌বদ্ধ শ্যাম মাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই,
একটি মায়ের চখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ জাগরণ তাব বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতা চুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।"

১৩০০ সন বঙ্গদেশের পক্ষেও এক মহা অশুভ বৎসর। বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই বৎসর বঙ্গদেশকে শোক-সাগরে ডুবাইয়া স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্রের রচিত কবিতা সাহিত্য-সম্রাটের স্তুতি গানে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কবিতার প্রথম ছত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর সময়, সন, তারিখ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহা ছাড়া গোবিন্দচন্দ্র এই কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সমা-লোচনাও করিয়াছেন। একটু নমুনা আবশ্যক।

"সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তেরশত সন,
এক পায়—দুই পায়, বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন!

* * *

ছিন্নআশা ছিন্নবাসা, সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায়!

এখনো পুরেনি তার, সময়ের অধিকার,—
সায়াহ্ন—ছাব্বিশ চৈত্র, হায়, হায়, হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!

* * *

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,

* * *

প্রতিভার দীপ্ত রবি, বাঙ্গালীর মহা কবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে?
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষা ফুলবনে?

* * *

তুমি থাক মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু কণিকায়?
আমরা পথের ধূলি, কর্দ্দম কঙ্কর গুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায়!

* * *

মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে কবি গোবিন্দচন্দ্র ভাবের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া বিলাপ করিয়াছেন। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার উপযোগী কিন্তু স্থানাভাব এবং পাঠক পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে বিরত রহিলাম।

১৩০০ সনে কবি একবার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজায় সময় কলিকাতা আগমন করিয়া তথায় কতক দিন অবস্থান করেন।

১৩০১ সনে কবি গোবিন্দদাস সেরপুরের ভূম্যধিকারী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কর্ম্মত্যাগ করেন।

চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি কবির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনিও দাস-কবিকে যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন ও আন্তরিক ভালবাসিতেন। তিনি পূর্ব্বাপরই কবির প্রতি সমভাবে দয়াপ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে কবিকে সেরপুর পরিত্যাগ করিতে হইল। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে অনুমান হয় না যে, হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কঠোর ব্যবহার, কবির কার্য্যত্যাগের কারণ।

৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং জ্ঞানী লোক ছিলেন সত্য; কিন্তু মনুষ্যজীবনের দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে তিনিও বিমুক্ত ছিলেন না।

শুনা যায় যে, চৌধুরী মহাশয়ের মতের স্থিরতা ছিল না। প্রবাদ আছে যে, চৌধুরী মহাশয় সময়ে অসময়ে পদাতিকদের খোজ করিতেন এবং তাহাদের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে যখন ইচ্ছা তখনই ডাকিয়া পাঠাইতেন। কেহ কেহ বলেন যে, এজন্যই কবি বিরক্ত হইয়া কার্য্যত্যাগ করেন। সেরপুর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কবি, "গোবিন্দ বিদায়" নামক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেই কবিতায় ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের খামখেয়ালের প্রতি কটাক্ষপাত ছিল,—অন্য কোন অপ্রীতিকর কথা ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সেরপুরে অদ্যাপিও "কোথায় থাকিয়া করে কোন্ হায়, কোন্ হায়? গোবিন্দ বিদায় আজি গোবিন্দ বিদায়।" ইত্যাদি কবিতার চরণ লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়।

গোবিন্দচন্দ্র সেরপুরে এক প্রকার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গীভাবেই থাকিতেন। অথচ একবার তাঁহার কোন অনুরোধ অন্যায় মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই

কারণেই গোবিন্দচন্দ্র বাধ্য হইয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে সেরপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রবল অতুলনীয় ছিল, এজন্যই তিনি স্বাবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেন। একমাত্র চরিত্রবলেই তিনি দারিদ্র্যকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার চরিত্র অনিন্দিত ছিল।

তার পর সেরপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় "নব্য-ভারত" সম্পাদকের "আনন্দ আশ্রমে" অতিথি হইলেন।

১৩০১ সনে "নব্যভারত" সম্পাদক জ্বরের প্রবল আক্রমণে কাতর হইয়া পড়েন। কলিকাতার নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন উপকার না পাইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর উপস্থিত হওয়ার পর রোগ আরোগ্য হইয়া যায়,—কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। কবি গোবিন্দদাস "নব্যভারত" সম্পাদকের অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে মধুপুর গমন করিয়াছিলেন।

১৩০২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত তিনি মধুপুরে অবস্থান করেন।

মধুপুর সম্বন্ধে তাঁহাকে একবার আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া নিম্নলিখিত উত্তর পাইয়াছিলাম।

"মধুপুরে অবরোধ প্রথা নাই। সেখানে যত ভদ্রলোক বাস করেন, সকলেই স্ত্রী পুত্র কন্যার সহিত প্রাতঃকালে ও বৈকালে মাঠে, ঝরণার তীরে, কি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বেড়াইতে যান। মধুপুর যেন বাঙ্গালীর বিলাত! * * * দেবীবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা, তাঁহার ছোট ভাই গিরিজাবাবু ও আমি,—আমরা এই কয়জন একসঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম। * * * সেখানে আমাদের অন্য কোন কাজ ছিল না। প্রাতঃকালে কিছু জলযোগ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম, ১০টা ১১টার সময় বাসায় ফিরিতাম। আবার ২টা ৩টার

সময় বাহির হইতাম, সন্ধ্যার সময় বা তাহারও পরে বাসায় আসিতাম। এমন আনন্দের দিন জীবনে অল্পই গিয়াছে। বাস্তবিকই মধুপুরের মধুপুর নাম সার্থক। * * * মধুপুরে থাকিবার সময় আমি মধুপুরের ও অন্যান্য বিষয়ের কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছি।"

১৩০২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে কবি গোবিন্দচন্দ্র, মধুপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অল্পদিনের জন্য "নব্যভারত" প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে, তিনি "আনন্দ আশ্রমে"ই অবস্থান করিতেন।

১৩০২ সনে তাঁহার তৃতীয় গীতিকাব্য "কস্তুরী" প্রকাশিত হয়। কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে এই কাব্যখানি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার বালিকা পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ;—

"'কুঙ্কুম' দিয়েছি আগে সবলারে, সেই রাগে
অভিমানে মুখ ভার ক'রে থাকে ছুঁড়ী,
কখনো বা মোটা মোটা, আঁখি হ'তে পড়ে ফোটা,
কেলি কদমের মত দুই-দশ-কুড়ি!
তাই গো করিনু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান,
প্রেমদার পাদপদ্মে প্রেমের কস্তুরী।"

"কস্তুরী" কাব্যেও তিনি জন্মভূমি ভাওয়ালের জন্য বিলাপ করিয়াছেন,—"কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?" বলিয়া দরিদ্র কবি মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে ভাওয়ালের অধঃপতনের কতক বর্ণনাও আছে। "কস্তুরী"র এক স্থানে তিনি তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ডের কথা ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাওয়ালের তদানীন্তন ও অতীত কাহিনীরও কতক আভাস দিয়াছেন।

"নব্যভারতে"র কার্য্যাধ্যক্ষরূপে অবস্থানকালীন ১৩০৩ সনে তাঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একখানি "চন্দন" নামক গীতি-কাব্য; অপরখানি "ফুলরেণু" নামক সনেটের সমষ্টি। কবি গোবিন্দ-দাস, তাঁহার "চন্দন", এবং "ফুলরেণু" যথাক্রমে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বন্ধুদ্বয়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

"চন্দনে"ও দরিদ্র কবির সেই বিলাপ গাথা বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে "নির্ব্বাসিতের আবেদন", "ভাওয়াল", "বাঙ্গালী", "কালীয় দমন" প্রভৃতি কবিতাগুলি অতুলনীয়। এই সকল কবিতার ছত্রে ছত্রে তাঁহার জ্বালাময় জীবনের মর্ম্মবেদনা স্পষ্টভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

১২৯৮ সনে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত, কবি গোবিন্দদাস, অন্যায় বিচারের প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করিয়া "মগের মুলুক" রচনা করেন। কিন্তু দেশবাসিগণের নিকট তখনও তাঁহার কাতর প্রার্থনা পৌঁছে নাই। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার "নির্ব্বাসিতের আবেদন" কবিতার সৃষ্টি। ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে আগ্নেয়গিরির অনলস্রোত প্রবাহিত।

দেশবাসিগণ তাঁহার চীৎকারে হয়ত সাড়া দিবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। কিন্তু তিনি প্রতারিত হইলেন। সমগ্র দেশবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার স্বদেশবাসী ভাওয়ালের জনসঙ্ঘ হইতেও এমন একটি লোক বাহির হইল না, যিনি এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারেন। অতএব, যে ভাওয়াল সেই ভাওয়ালই রহিয়া গেল এবং দ্রুতগতিতে অধঃপতনের 'অতল স্পর্শে' ডুবিতে লাগিল। কবি গোবিন্দদাসও মিছামিছি দেশে দেশে দুঃখের গান গাহিয়াই বেড়াইলেন এবং অপরিজ্ঞাত ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অসহায় অবস্থার কথা, ভাবিতেও হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়।

১৩০৩ সনে কবির "চন্দন" ও "ফুলরেণু" প্রকাশিত হইলে তিনি এক এক খণ্ড পুস্তক তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রতিপালক হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই বৎসর ২৩এ পৌষ জমিদার হরচন্দ্র পুস্তকের প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া পত্র লিখেন।

১৩০৩ সনে "আনন্দ আশ্রমে" থাকিয়া "নব্যভারতে"র কার্য্যাধ্যক্ষতা কবিলেও তিনি তখন কর্ম্মপ্রার্থী। তাঁহার আর্থিক অবস্থা কোন দিনই সচ্ছল ছিল না, তখন আরও শোচনীয়।

কলিকাতায় সে সময় তিনি চাকরির অনুসন্ধান কবিতেছিলেন। কবির মুখে শুনিয়াছি যে, তৎকালে তাঁহার অকপট সুহৃৎ কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বড়াল-কবির চেষ্টায় এবং "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অনুরোধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চাকরির জন্য বাঙ্গালার একৈক মহারাজার নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন।

কবি গোবিন্দদাস সেই পত্র লইয়া কলিকাতার প্রান্তভাগে অবস্থিত মহারাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি গোবিন্দদাসকে আর একদিন আসিতে বলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে কবি পুনরায় রাজার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। প্রখর মধ্যাহ্নের অতি তীব্র আতপতাপে কবি তখন অবসন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। এবার, কবি মহারাজের দেখা পাইলেন না—প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাল বৃথা কর্ম্মহীন ভাবে অপেক্ষা করিবার পর, মহারাজ একজন সামান্য কর্ম্মচারী দ্বারা পঞ্চাশৎ মুদ্রা প্রেরণ করিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের পত্রের সম্মান রক্ষা করিলেন। কিন্তু দরিদ্র অথচ তেজস্বী কবি, মহারাজের ভিক্ষা হেলায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে, তখনই সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজে সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন।

তখন দাস মহাশয় নিতান্তই বিপন্ন, অর্থহীন। মহারাজের ভিক্ষা গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও সমাজপতি মহাশয়ের অপমান করা হয়, এজন্য উহা গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে বিরল। উপরোক্ত ঘটনায় কবি গোবিন্দদাসের মহৎ চরিত্র প্রমাণিত হইতেছে।

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। বড়াল-কবি প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন যে, পশ্চিম বাঙ্গালায় অক্ষয়কুমারের মত তাঁহার "পরমাত্মীয় অকপট সুহৃৎ" আর কেহই নাই।

১৩০৩ সনে গোবিন্দচন্দ্রের সেই কর্ম্মহীন অবস্থায় বড়াল-কবি তাঁহাকে একদা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার "ষ্টেটে" একটি কাজের যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র বহু বন্ধুবান্ধব সমন্বিত, চির পরিচিত ময়মনসিংহে কর্ম্ম-লাভ করিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত কার্য্য আর গ্রহণ করেন নাই।

১৩০৩ সনের মাঘ মাসে কবি গোবিন্দ মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর জমিদারীতে চাকরি পাইয়া ময়মনসিংহে আগমন করেন। দেবীপ্রসন্নের চেষ্টায় এই কর্ম্মপ্রাপ্তি হয়। ১৩০৩ সনের ৬ই ফাল্গুন বাঁশহাটি নামক স্থানে কাছারীর নায়েব নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। বাঁশহাটিতে প্রায় দুই বৎসর চাকরি করিয়াছিলেন। তৎপর সূর্য্যকান্ত মহারাজের বেগুণবাড়ী কাছারীতে ১৩০৫ সনের ২রা অগ্রহায়ণ পরিবর্ত্তিত হইলেন।

এই কার্য্যকালে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালী-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় জয়দেবপুর হইতে প্রস্থান করেন। ১৩০৮ সনে এই ঘটনা ঘটে। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় তখন পরলোকে। রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পর রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রাণী বিলাসমণি

দেবী রাজকার্য্যের আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তিনি প্রখরা বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন বলিয়া রাজার জীবিতাবস্থাতেই রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ সমূহ অবগত ছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে রাজ্যসংক্রান্ত অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তারপর ১৩০৮ সনে তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নামে আদালতে এক অভিযোগ আনয়ন করেন, এবং ১৩০৮ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ ঘোষ মহাশয়কে ম্যানেজারের পদ হইতে অপসৃত করেন। ঘোষ মহাশয়ও নানা বিভ্রাটে পতিত হইয়া ভাওয়াল পরিত্যাগ করিলেন। পরে বহু চেষ্টায় সেই মোকর্দ্দমা আপোষে মিটিয়া যায়।

তাঁহার প্রস্থানের পর রাজকুমারেরা তদানীন্তন দেওয়ান ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও অন্যতম প্রধান কার্য্যকারক নবকুমার নিয়োগী মহাশয়দের দ্বারা কবি গোবিন্দচন্দ্রকে পত্র লিখিয়া তাঁহার জন্মভূমি ভাওয়ালে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইভাবে সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর পর, হতভাগ্য ভাওয়াল তাঁহার নির্ব্বাসিত প্রিয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থা হইলেন। সে কি আনন্দের দিন, যেদিন নির্ব্বাসিত কবি গোবিন্দদাস করুণাময়ী রাণী বিলাসমণি দেবী এবং রাজকুমারগণের মহানুভবতা ও অপার কৃপায়, তাঁহার চির আরাধ্যা দেবীসমা জন্মভূমি ভাওয়ালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! কবির সেদিনের প্রাণের উল্লাস অবর্ণনীয়। আবার তিনি তাঁহার চিরদয়িত "চিলাই" নদীতীরে ফিরিয়া আসিলেন, —প্রাণপ্রতিম ভাওয়ালের বনভূমির অপরূপ শ্যামশ্রী দর্শনে আত্মহারা হইতে লাগিলেন,—প্রিয়তমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মহাশ্মশানেও বুঝি বা এক বিন্দু অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন,—সেই দীর্ঘিকার তীরে তীরেও নিঃসঙ্গ ভ্রমণের সুযোগ পাইয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে নির্ম্মম নির্ব্বাসনের যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা কন্টর মত

লুক্কায়িত ছিল, তাহা বিলীন হইয়াছিল কি না, কে বলিবে? তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে সে যাতনার আভাস যে না পাওয়া যাইত তাহা নহে,—তাঁহার হৃদয়ে সম্ভবতঃ সেই দুঃখ আমরণ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল।

ভাওয়ালে পুনরাগমন করিবার পর, কবি গোবিন্দদাসের দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে অস্বস্তির মেঘমালা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন! তৎকালীন ভাওয়ালের অবস্থা দৃষ্টে কবি লিখিয়াছিলেন,—

"সে দুর্দ্দিন নাহি আর, অবিচার অত্যাচার,
প্রাণভরা হাহাকার, বুকভরা গ্লানি,
নাহি আর যথা তথা, সে দুঃখ কাহিনী কথা,
নাহি আর দেশে দেশে লোকে কাণাকাণি!
প্রজার সে মহা রোষ, অবরুদ্ধ অসন্তোষ—
ধূমায়িত দাবদাহ, মনে মনে জানি,

* * *

যুগ যুগান্তের পরে, হাসিল ভকতি ভরে,
সীমাশূন্য ভাওয়ালের মহা অরণ্যাণী,
নাহি আর হাহাকার বুকভরা গ্লানি!
উল্লসিত ভাওয়ালের বন-রাজধানী,
উল্লসিত দেবপুর, আশঙ্কা হইল দূর,
সশঙ্কে পলায় যত ক্রূর অভিমানী!

* * *

ভাওয়ালের দুঃখ ভয় হইয়াছে দূর,
ভাওয়ালের বনে বনে, বসন্তের সমীরণে,
কীর্ত্তির কোমল কণ্ঠে শোনা যায় সুর,

হাসে তরু হাসে লতা, ভুলিয়া সে গতকথা,
সুগন্ধ মুকুলে পুষ্পে প্রসন্ন প্রচুর !
ভাওয়ালের দুঃখ ভয় হইয়াছে দূর !”

কবি গোবিন্দদাসের, জন্মভূমি দর্শনে—হৃদয়মাঝারে যে অনাবিল, অফুরন্ত আনন্দের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষায় লিখিয়াছিলেন,—

“দিক্ দিগন্ত আছে ব্যাপি,
উর্দ্ধে উঠ্‌ছে আকাশ ছাপি,
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভারাশি।
সিন্ধু যেন শ্যাম তরঙ্গে—
খেল্‌ছে বনের অঙ্গে অঙ্গে
শীত-বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি।
বনভরা সব যত টিলা—
মাথায় আছে আকাশ মিলা
মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি।
ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা
উড়ছে মায়ের শ্বেত-পতাকা
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিগ্‌দিগন্তে ভাসি।
শুক্‌না বিলে শুক্‌না খালে
বন-বরাহ—পালে পালে
খুঁজছে শালুক পদ্মনালে সলিল-পিপাসী।

* * *

বর্ষাকালে ‘বেলাই’ বিলে
শাপ্‌লা শালুক সুন্দরী মিলে
কমল-বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি।

ভারতী কি স্নেহের ভরে
বীণা রেখে কবির করে
পদ্ম-সরে হ'য়ে আছেন পদ্মবনবাসী!
ওগো শ্যামা বনভূমি
বিপুলা বিশালা তুমি
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী।
আমি বা বুঝিব কি মা
তোর ও শ্যাম মহিমা
তথাপি সেবিব তোরে, চির অভিলাষী
আমি, তাইতে হেথা আসি।"

কবি গোবিন্দদাস ভাওয়ালে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কবিতাটি রচনা করেন। ১৩১৬ সনের বৈশাখ সংখ্যা "নব্যভারতে" ইহা প্রকাশিত হয়।

মহারাজ সূর্য্যকান্তের বেগুণবাড়ী কাছারীতে কবি গোবিন্দচন্দ্র প্রায় চারি বৎসর কাল অবস্থান করেন। সে সময় তিনি তথায় সস্ত্রীক বাস করিতেন। কবির শেষ পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র বরুণ এখানে জন্মগ্রহণ করে। বরুণ ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র অতি প্রবল বেগে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বারিপাত হইয়াছিল। এমন কি গৃহের প্রাঙ্গণে একাদিক্রমে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত জল স্থিরভাবে রহিয়াছিল। এই জন্যই কবি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম বরুণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইহার পূর্ব্বেই পল্লী-ভবনে জন্মিয়াছিল। কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীর গর্ভে তাঁহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে তিনি, তিন পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিদারুণ পতি ও পুত্র শোকে অবসন্ন হইয়া কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরী ১৩২৮ সনের ৯ই কার্ত্তিক পরলোক গমন করেন।

কবি গোবিন্দদাসের দ্বিতীয় পুত্র বরুণ (শরদিন্দু) অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিতে সে আমাদিগকে তাহার সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়াছিল। সে তাহার পিতার অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিল। অল্পবয়সেই কাব্যচর্চ্চায় তাহার রুচি দেখা গিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে সে হয়ত তাহার পিতার নাম রক্ষা করিতে পারিত। *

বেগুণবাড়ীতে অবস্থানকালীন একবার প্রজামণ্ডলী বিদ্রোহী হইয়া গোবিন্দচন্দ্রকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলীকে দমন করা আবশ্যক মনে করিয়া তিনি সূর্য্যকান্ত মহারাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। † কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে বেগুণবাড়ী হইতে তারাটী নামক কাছারীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৩০৯ সনের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনি বেগুণবাড়ীতে চাকরি করেন। তারাটী কাছারী বেগুণবাড়ী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তারাটীতে পরিবর্ত্তন, কবি তাঁহার কর্ম্মোন্নতির

---

* গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে লিখিতেছি যে আমাদের পুত্র-প্রতিম বরুণ ১৩২৭ সালের ৯ই ভাদ্র বুধবার রাত্রি ৮টা ৫৫ মিনিটের সময় কলিকাতার উপকণ্ঠে, আমাদের গৃহে দেহত্যাগ করে। কঠিন জ্বর বিকারে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মাতা তখনও জীবিতা ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম শরদিন্দু দাস। মৃত্যুর সময় তাহার বয়স বিংশতি বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

† কবির মৃত্যুর পর কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মহারাজ সূর্য্যকান্তের বেগুণবাড়ীতে নায়েবরূপে অবস্থান কালীন, তথাকার বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলী দমন করিতে মহারাজের সাহায্য না পাইয়া, গোবিন্দচন্দ্র কবিতায় আবেদন পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করেন। একথা সত্য কি না জানি না। গোবিন্দচন্দ্রের স্বীয় উক্তি এইরূপ;— "'বেগুণবাড়ী' ৩।৪ বৎসর থাকিবার পর 'তারাটী' কাছারীতে বদ্‌লী হই। সেখানে প্রায় বৎসরাধিক কাল কার্য্য করিয়াছিলাম। শেষে পীড়িত হইয়া বিদায় লই। ছুটির পরে আর কাজে যাই নাই।"—অপ্রকাশিত পত্র। ৭ই ভাদ্র ১৩১৮ সন।

পরিচায়ক মনে করেন নাই। এই সময় চাকরির প্রতি ঘৃণা, তাঁহার প্রাণের ভিতর বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে।

তারাটীতে তিনি অতি অল্প সময় চাকরি করেন। পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অগ্রহায়ণ মাসে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়ের অবসানে দীর্ঘকাল কার্য্যস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় ১৩১০ সনের শ্রাবণ মাসে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করা হয় •

জামদারী কার্য্যে সময় সময় অন্যায়রূপে প্রজাপীড়ন করিতে হয় বলিয়া তিনি আর চাকরি করেন নাই। প্রজাপীড়ন তিনি পছন্দ করিতেন না। বিশেষতঃ তিনি চাকরি-জীবন অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করিতেন; কিন্তু অশেষ দারিদ্র্য নিবন্ধন সে দাসত্ব-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

প্রজার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া প্রভুর অনিষ্ট করাও তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এজন্যও জমিদারী চাকরির প্রতি তিনি শেষকালে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন।

পরপদ লেহন তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে চাকরি করিতে পরামর্শ দান করিতেন না।

গ্রন্থকারের ব্রহ্ম-প্রবাসে অবস্থান কালীন কবি গোবিন্দদাস প্রায় অনেক পত্রেই তাহাকে চাকরি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেন। গ্রন্থকারকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিবার জন্য তিনি, বহুদিন উপদেশ দিয়াছেন। সে সকল কথা আর লিখিয়া কি করিব ?

তিনি একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"চাকরি চিরকালই আমার নিকট অতি ঘৃণিত ও কষ্টকর বোধ হইয়াছে। অথচ চাকরি ভিন্ন জীবন ধারণের অন্য উপায় ছিল না।"

জমিদারের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যখন জীবনধারণের জন্য কোনও প্রতিকার করিতে পারিলেন না, তখন অনন্যোপায় দরিদ্র কবি, পূর্ব্ববঙ্গের

দাতাকর্ণ বদান্যবর রাজা জগৎকিশোরের শরণাগত হইলেন। তিনি দরিদ্র স্বভাব-কবিকে বিমুখ করিলেন না। রাজা জগৎকিশোর দান-বীর বলিয়া বঙ্গবিশ্রুত। তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে কেহই রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া আসে না। দানই তাঁহার জীবনের কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি বিভবশালী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইলেও তাঁহার হৃদয় পরদুঃখকাতর। অনেকেই তাঁহার গুপ্ত দানের কথা অবগত নহেন। জগৎকিশোর গুণের আকর। ঐশ্বর্য্যবান, রাজোপাধিধারী হইয়াও তিনি গর্ব্বিত নহেন। তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে।

জগৎকিশোর, কবি গোবিন্দদাসকে স্বীয় নামে পঞ্চদশ মুদ্রা এবং কুমার জিতেন্দ্রকিশোরের নামে পঞ্চমুদ্রা, মোট বিংশতি মুদ্রা তাঁহার আমরণ কাল পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার এই অপার করুণার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে।

এতদুপলক্ষে কবি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লিখিলেন,—

জগৎকিশোর।

"নির্ব্বংশ সগর বংশ করিতে উদ্ধার,
মর্ত্ত্যধামে মন্দাকিনী আনে ভগীরথ,
মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নাহি আর তার,
সে এখন কীর্ত্তিনাশা কর্ম্মনাশাবৎ।
মৃত এ পতিত জাতি, মৃত জন্মভূমি,
ভাষা মাত্র আশা তার উদ্ধার উপায়,
সে পুণ্য অমৃতগঙ্গা বহাইয়া তুমি,
জাতীয় জীবন রাখ স্নেহ করুণায়!
অনন্ত অভাব ঘটা বেষ্টিত জটায়,
মহা দৈন্য গিরি অন্ত, সবে রোধে পথ,

কঠোর জঠর জ্বালা জহ্নু সম হায়,
দুর্ভাবনা দুর্ম্মনস্ মহা ঐরাবত।
নাশি এ পথের বিঘ্ন ভাসায়ে ভারত,
বহাও অমৃতগঙ্গা নব ভগীরথ।”

তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে ভাওয়ালের তিন কুমার মাসিক আটটি মুদ্রা হিসাবে কবিকে চতুর্ব্বিংশতি মুদ্রা বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তিলব্ধ ধন ও পুস্তকের যৎকিঞ্চিৎ সামান্য আয়ে তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ লইয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ১৩১৮ সন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনযাত্রার পথ এইভাবেই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু অকালে জয়দেবপুরের রাজকুমারগণ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, ভাওয়াল রাজগৃহের অর্থ-সাহায্য বন্ধ হইয়া গেলে, কবির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করে। তখন, শিশু সন্তানগণ সহ কবি অতি কষ্টে নিপতিত হইলেন।

দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ার পর, ভাওয়ালে তাঁহার যে সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমারগণ কবিকে জয়দেবপুরে আহ্বান করিয়া তাঁহার নষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, জয়দেবপুরের সন্নিকটস্থ কুরমীতলা নামক স্থানে কবি গোবিন্দদাস কিছু ভূমি কৃষিকর্ম্মের জন্য নামমাত্র মূল্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দরিদ্র কবি এই ভূমি হইতে প্রতি বৎসর যে শস্য পাইতেন, তাহা দ্বারা কবি-পরিবারের অন্নক্লেশ যথেষ্ট পরিমাণে বিদূরিত হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——:০:——

পল্লীজীবনে কবির লাঞ্ছনা,—"বৈজয়ন্তী", "শোক ও সান্ত্বনা*, "শোকোচ্ছ্বাস" রচনা,—রোগশয্যায় দৈন্যদশাপন্ন গোবিন্দদাস।

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস, পরাধীনতার কঠোর-বন্ধন স্বেচ্ছায় বিমুক্ত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গবাণীর সেবা করিতে লাগিলেন। ১৩১০ হইতে ১৩২৫ সন পর্য্যন্ত "নব্যভারত"এর অঙ্কে তাঁহার বহু সুমধুর কবিতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু, স্বাধীন জীবনেও সাহিত্য-সেবায় অনেক সময়, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সময় কর্ত্তন করিতে পারিতেন না।

তাহার কারণ, গোবিন্দচন্দ্রের জীবন নানাবিধ অপ্রীতিজনক ঘটনার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি, নিশ্চিন্তভাবে দিন যাপন করিতে পারেন নাই। দুরদৃষ্টের অলঙ্ঘ্য শক্তি তাঁহাকে নিরন্তর অভিভূত করিয়াছিল। তথাপি, তিনি বাণী আরাধনা পরিত্যাগ করেন নাই।

---

* গ্রন্থের বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইবার প্রাকালে, ঢাকা নগরী হইতে শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোরমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয়, সহানুভূতিপূর্ণ একখানা পত্রদ্বারা আমাদিগকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কবি গোবিন্দদাস একদা পরিহাসচ্ছলে আমাদিগকে বলিয়াছিলেনঃ—"দেখুন, আমার ধনুরাশীতে জন্ম বলিয়া তাহার ফলও তদনুরূপই পাইতেছি। ধনুরাশীর চিত্রের সঙ্গে আমার জীবনের সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমি যেন যুদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—ধনুরাশীর মত একটা তীরধনু লইয়া কেবল জীবনভরা যুদ্ধই করিলাম।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রাম নামক পল্লীতে, পরাধীন কর্ম্মাবসানে, বাসস্থান নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থান করিতেছিলেন। তথায়ও তিনি শান্তি সুখে—নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। সেখানেও একদল নিন্দাকারী ও প্রবল অহিতকামী লোক গোবিন্দ-চন্দ্রকে অতিমাত্রায় ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

সে অনেক কথা। ১৩১০ সনে পল্লীগ্রামে অবস্থানকালীন তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইতে থাকে। গোবিন্দচন্দ্র, ব্রাহ্মণগ্রামে তদপেক্ষা উচ্চবংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া নিন্দাকারীদিগের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। শুনা যায়, কবি গোবিন্দদাস এজন্যই তাঁহাদের বিষনয়নে পতিত হইয়াছিলেন।

কবি-গৃহের অনতিদূরে হেমাঙ্গিনী ঘোষ নামে একজন বিধবা ভদ্রমহিলা বাস করিতেন।

কবির জনৈক সচ্ছল অবস্থাপন্ন প্রতিবেশী, উক্ত বিধবা রমণীর সম্পর্কান্বিত হইয়াও তাঁহাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতেন না। বিধবা হেমাঙ্গিনী ঘোষের দুইটি পুত্র ছিল। তাহারা নিতান্ত অল্পবয়স্ক, এজন্য মায়ের কোন সহায়তা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। হেমাঙ্গিনীর জীবিকা নির্ব্বাহের অর্থ-সংস্থান থাকিলেও অসহায়া পতি-হীনার তত্ত্বাবধান করিবার কেহ ছিল না।

দারুণ বর্ষাকালে সমগ্র বিক্রমপুর জলমগ্ন হয়,—সে সময় নৌকা ভিন্ন

গমনাগমন অসম্ভব। বিধবা হেমাঙ্গিনী ঘোষের পুত্র দুইটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। কবি গোবিন্দদাসের একখানি ভাঙ্গা নৌকা ছিল। বর্ষাকালে কবির পুত্রগণ, তাহাতে বসিয়া, কষ্টে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করিত,—সঙ্গে সঙ্গে বিধবার পুত্র দুইটিকেও উদার হৃদয় কবি, তাঁহাব নিজের নৌকায় বিদ্যালয়ে যাতায়াত কবিতে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কবি, নিজে স্থানীয় বাজার হইতে হেমাঙ্গিনী ঘোষেব যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিতেন এবং আবও নানা প্রকারে অনাথার সাহায্য করিতেন। ইহাই কবি গোবিন্দচন্দ্রেব অপবাধ।

বিধবাটির আত্মীয়—যিনি সচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন কবিতেন. ভুলিয়াও, সেই অনাথা রমণীব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেন না। অধিকন্তু, কবি গোবিন্দচন্দ্রের এবম্প্রকার উদারতায় অতিশয় বিরক্ত হইতেন। পল্লীগ্রামে এজাতীয় মানুষের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে।

দাস-কবি, দয়ার্দ্র হৃদয়েব লোক ছিলেন। নিজে দরিদ্র, কাজেই দরিদ্রেব অসুবিধা উপলব্ধি করিতেন ও মর্য্যাদা জানিতেন। বিধবা হেমাঙ্গিনীর উপকার করিতে কবিব কোন প্রকারে অর্থব্যয় হইত না, অথচ একজন প্রতিবেশিনী অনাথা ভদ্র মহিলাব পরম উপকাব হইত।

শুনিয়াছি, হেমাঙ্গিনী ঘোষকে গোবিন্দচন্দ্রের নানাবিধ সাহায্য শত্রুবৃদ্ধিব উদ্দীপক কারণ।

আর একটি কারণে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছিল, তাহাতে ঘৃতাহুতি পড়িল এবং পূর্ণমাত্রায় দাস-কবির চারিদিকে অশান্তির অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কবি-পত্নীর পিতামহী পূর্ব্ব-কথিত "ব্যারিষ্টার", এই ঘৃতাহুতির পুরোহিত।

দাস-কবির চাকরি পরিত্যাগের পর কবি-পত্নীর পিতামহী জীবিতা ছিলেন—তিনি তখন বৃদ্ধা। তিনি দাস-কবির নিকট হইতে মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার পশ্চাতে, যবনিকার অন্তরালে অপর লোক ছিল। বৃদ্ধা তাহার হস্তে ক্রীড়ণক মাত্র ছিলেন। একে কবি গোবিন্দদাস দরিদ্র, তদুপরি পরান্নপুষ্ট,—তদবস্থায় কেমন করিয়া তিনি মাসে মাসে বৃদ্ধাকে অর্থ যোগাইবেন? কি অসম্ভব কথা! বৃদ্ধা দিদি শশ্রূমাতাকে কবি, তাঁহার আর্থিক অবস্থার কথা বিশদরূপে জানাইলেন এবং তাঁহার অন্নসংস্থানের ভার গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু পাষাণ বিগলিত হইল না। তিনি কবি গোবিন্দচন্দ্রের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা, ব্যয়-ভার বহনের নিমিত্ত গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাকে প্রতি মাসে অর্থ প্রদান করেন।

অসম্ভব সম্ভব হয় না। গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় অসামর্থ্য জানাইলেন। বৃদ্ধার হস্তে অর্থ ছিল,—অন্নসংস্থানের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। কেবল কুচক্রীর চক্রান্তে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল।

কবির উত্তর শ্রবণে বৃদ্ধা কুপিতা হইলেন। অবশেষে গোবিন্দ-চন্দ্রের প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সংঘটনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি পুরুষোচিত ছিল।

তারপর, উভয়ে একযোগে গ্রামের জমিদারগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গোবিন্দচন্দ্র অত্যন্ত গর্হিত কাজ আরম্ভ করিয়া-ছেন—তিনি বিধবা হেমাঙ্গিনী ঘোষের গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন এবং তাঁহার সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হইয়াছেন। কথাটা কবি গোবিন্দচন্দ্রের পক্ষে যতদূর গুরুতর না হউক, হেমাঙ্গিনী ঘোষের পক্ষে ততোধিক!

এবম্বিধ জনরবে হেমাঙ্গিনী মৃতকল্প হইলেন। অনাথিনী সমাজের চক্ষে নিতান্ত হেয় ও নিন্দনীয় হইয়া পলে পলে মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিলেন। ফলে, জমিদারগণের চেষ্টায় দাস-কবি, গ্রামের ভিতর এক প্রকার 'একঘরে' হইয়া রহিলেন। তাঁহার 'ধোপা' এবং 'নাপিত' বন্ধ করা হইল। কোন পূজা, দেবার্চ্চনা, অথবা পার্ব্বণ উপলক্ষে তিনি পুরোহিত পাইতেন না। কয়েকবার প্রয়োজনবশতঃ ঢাকা হইতে কবি, পুরোহিত আনাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে নানাবিধ অন্যায় চেষ্টা করা হয়। সেই দুঃসময়ে তিনি, গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বস্তুতই মর্ম্মপীড়ক।

কবির বিপদে, গ্রামের প্রবীণ চিকিৎসক—গ্রন্থকারের পিতৃদেবতা, অধুনা পরলোকগত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং জনৈক ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণ ও কতিপয় গ্রাম্যযুবক, তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

পিতৃদেব একজন হৃদয়বান্ এবং নিরপেক্ষ লোক ছিলেন। তিনি অন্যায়রূপে কাহারও পক্ষ সমর্থন করিতেন না। এজন্য তিনি, স্বগ্রামে আবালবৃদ্ধবণিতা প্রত্যেকেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কবির পরিবারস্থ কাহারও অসুখ হইলে, তিনি নির্ভয়ে কবি-গৃহে উপস্থিত হইয়া সুব্যবস্থা করিতেন। তিনি অনেকবার স্বগৃহে কবিকে আহ্বান করাইয়া ভোজন করাইয়াছেন।

পিতৃদেব গভীর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি কখনও সময়ের অপব্যবহার করিতেন না। আলস্যপরায়ণতা তাঁহার জীবনকে এক দিনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। অলসের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জাগিত না। আশ্চর্য্য এই যে, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা

যুবকের ন্যায় বলবতী ছিল। তিনি নানাবিষয়ক সৎগ্রন্থ, ধর্ম্মপুস্তক, বহু সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্র নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার আলয়ে প্রায় প্রতিদিন একটিবার করিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহার গৃহে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে কবি অনেক সময় যাপন করিতেন।

কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুতে তিনি আন্তরিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। কবির পল্লীজীবনে গ্রন্থলেখকের পিতৃদেব, তাঁহার একজন বিশিষ্ট হিতৈষী বান্ধব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পর পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন।

ব্রাহ্মণগাঁ-নিবাসী ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের তিন পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতচন্দ্র ঘোষ এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান্ বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ জীবিত আছেন। মধ্যম, গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোকে। তাঁহারা প্রত্যেকেই কবি গোবিন্দদাসের সহায়তা করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের গ্রামস্থ প্রবল প্রতিপক্ষগণকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ভীকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বংশমর্য্যাদায় দাস মহাশয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁহারা ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। তাঁহাদের গৃহেও কবি সচরাচর যাতায়াত করিতেন।

ইহা ১৩১০—১৩১১ সনের কথা। তখন গ্রামের ভিতর, কবি গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে এক মহা আন্দোলনের সুর পূর্ণমাত্রায় উত্থিত হইতেছিল। এই সংবাদ শ্রবণে হেমাঙ্গিনী ঘোষের পিতা, কবি গোবিন্দচন্দ্রের সহায়তায়, বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে এক মানহানীর মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। মোকর্দ্দমার বাদিনী ছিলেন হেমাঙ্গিনী ঘোষ। পরে, প্রতিবাদিগণ প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া, মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিলেন।

ইহার পর দীর্ঘ দিন সেই বিধবা জীবিতা রহিলেন না। নানা দুঃখে পতিপ্রাণা অসহায়া হেমাঙ্গিনী ঘোষ, ১৩১৪ সনের ৩১শে ভাদ্র মঙ্গলবার পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র, তাঁহার অমর লেখনী বলে দুঃখিনী হেমাঙ্গিনীকে চিরস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন। হেমাঙ্গিনীর মৃত্যুর পর, তিনি সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা অত্যন্ত প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট—ভাবে ও ভাষায় রত্নখণ্ডের মত সমুজ্জ্বল। আমরা সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অমর কবি তাঁহার কল্প-তুলিকায় হেমাঙ্গিনীর প্রকৃত আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত কবিতা পাঠে, পল্লীগ্রামস্থ তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ অতীব মর্ম্মান্তিক জ্বালা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি।

হেমাঙ্গিনী ঘোষ

—•—

১

"একাকিনী অসহায়া বিধবা রমণী
একমাত্র শিশু দু'টি আশার সম্বল,
অশ্রু দিয়া দিন গণে দিবস রজনী,
জীবনে বর্ষিবে আর কত অশ্রুজল।
কবে গেছে প্রিয়পতি কোথা কোন্ দেশে
কবে যাবে তার কাছে ভাবনা কেবল,
নিদ্রা গেছে মনোরথে তাঁহার উদ্দেশে
স্মৃতি আছে পথ চেয়ে পল অনুপল।
কল্পনা গড়িলে তারে আঁখিজলে মুছে
বিশ্বাসে পাইলে কাছে নিশ্বাসে উড়ায়,

জীবনের এই স্বপ্ন আজি গেছে ঘুচে,
সে আজি সতাই পতি পাইষাছে হায় !
আজি সে অনন্তধামে অনন্ত সন্তোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ !

২

"শুভ্রকান্তি শুভ্রবেশ বিশুভ্র বিধবা,—
জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা শুভ্র সরস্বতী,
যোগমগ্ন তপস্বীর তপঃ সমুদ্ভবা
মুমুক্ষুর ভক্তি মুক্তি শান্তি মূর্ত্তিমতী।
কামনা আকাঙ্ক্ষা আশা জ্ঞান কর্ম্মযোগ,
একমাত্র পতি পদে বিশ্বপতিরূপে
বাক্য মন দেহে দিয়া যা' করে সম্ভোগ,
সকলি অর্পিত তাঁর দক্ষিণা স্বরূপে !
উৎপীড়িত উপেক্ষিত দরিদ্র ভিখারী,
ক্ষুধিত আতুর অন্ধ দীন দুঃখীজন,
রোগে শোকে সকলের নিত্য সেবাকারী
নিঃস্বরূপে পূজিয়াছে বিশ্ব নারায়ণ।
পবিত্র চরিত্র তার দেবতা সন্তোষ
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ !

৩

"হেমন্তের হৈম মেঘ কনক কিরণে
আলো করে বিশ্বরাজ্য,—স্বর্গ ধরাতল,
কিন্তু যবে নিদাঘের ঘোর উৎপীড়নে
অত্যাচারে দগ্ধ করে ধরণী শ্যামল !
তখন সে ক্রোধে রোষে ভীমা ভয়ঙ্করী
ধরে সে ভৈরবী মূর্ত্তি করালী কালিকা

পদাঘাতে তাঁহে ব্যোম দিক্ দগ্ধ করি
নয়নে জ্বলিয়া উঠে শত বহ্নি শিখা।
তেমনি তুমিও দেবি আর্ত্তের রক্ষণে
অবতীর্ণা রণক্ষেত্রে ছিন্নমস্তাবৎ
পরাজিয়া দৈত্যদল একাকিনী বণে
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিবে জগৎ।
পবিত্র চরিত্র তব নির্ম্মল নির্দ্দোষ,
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

৪

"পর্ব্বতে প্রান্তরে কিম্বা কানন কান্তারে,
যখন যেখানে থাকি নিকটে কি দূরে
না চাহিতে দেয় আলো সতত আমারে,
দিবা নিশি রবি শশী সাথে সাথে ঘুরে।
তুমি থেকে তারো উর্দ্ধে,—বৈকুণ্ঠে গোলকে,
জ্বলিতেছ ব্রহ্মতেজে বিশ্বের জীবন,
বরষি স্নেহের সুধা, দুঃখে রোগে শোকে,
দিবানিশি করিতেছ শান্তি বিতরণ।
রোধিবে তোমার জ্যোতিঃ তোমার কিরণ,
নাহিক এমন মেঘ,—হেন কুজ্ঝটিকা।
মর্ম্মভেদী সর্ব্ব আত্মা সর্ব্ব দরশন
সর্ব্বরূপে জ্বলে আজ তব রূপ শিখা।
তোমারি প্রসন্ন হাসি প্রভাত প্রদোষ
পুণ্যবতী সাধ্বী সতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।"

হেমাঙ্গিনী ঘোষ সম্পর্কিত গোলযোগের অবসান হইল। কিন্তু, কবির বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য রহিয়া গেল। বৃদ্ধা, তাঁহাকে নানা ভাবে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। সে সকল

কথা লিপিবদ্ধ করিবার নহে। কবি গোবিন্দদাসও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। অভদ্রোচিত ভাষা ও অন্যায় ব্যবহার না করিয়া, বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে ১৩১০ সনের চৈত্র মাসে, তিনি "বিক্রমপুরে বসন্ত" নামক এক অনলগর্ভ কবিতা রচনা করিলেন। "নব্যভারতে" তাহা প্রকাশিত হয়।

যথাসময়ে তাহা পাঠ করিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোক কবির প্রতি বিরক্ত হইলেন। বৃদ্ধাও কবিতা শ্রবণে একেবারে উন্মত্তাবৎ হইয়া প্রায় প্রতিদিনই গোবিন্দদাসকে অকথ্য ভাষায় অভিসম্পাত করিতেন।

গ্রাম্য বালকেরা বৃদ্ধাকে দেখিলেই কবিতার দুই চারিটি ছত্র, অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করিত। তাহাতে বৃদ্ধা আরও কুপিতা হইয়া তাহাদের প্রতি 'ইট্ পাট্‌কেল্' প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতেন।

গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে আমরা উল্লিখিত কবিতা প্রসঙ্গে আলাপ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া দেশের লোকে ইহাকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

"নব্যভারতে" কবিতাটি প্রকাশিত হইলে কবি, বিক্রমপুরবাসিদের বিরাগভাজন হইলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "ঢাকা প্রকাশে" কোন অজ্ঞাতনামা লেখক, কবিতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা সমালোচনায় বেদনা অনুভব করিয়া "নব্য-ভারত" সম্পাদক দেবীপ্রসন্নের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "সমালোচকের অজ্ঞতার জন্য আক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি সমালোচনা করিয়াছেন, তিনি কবিতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।" সম্পাদকের কথায় আমাদের প্রাণের বেদনা দূর হইয়াছিল।

"বিক্রমপুরে বসন্ত" কবিতার সমালোচনা করিতে বসিয়া "সাহিত্য"

সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"এই গোবিন্দদাস কি আমাদেব চিরপ্রিয় সেই 'প্রেম ও ফুলে'র সুবিখ্যাত কবি? তাঁহার কি এমন অধঃপাত সম্ভব? * * * প্রবীণ সম্পাদক * * 'নিজের ছাগল' বলিয়া যদি 'ল্যাজের' দিক্ কাটিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাচাব।"

ইহা যে ব্যক্তিগত কঠোব বিদ্রূপ বসাত্মক কবিতা, তাহা সমাজপতি মহাশয়ও সম্ভবতঃ বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন। কলাকৌশলের দিক্ দিয়া কবিতাটির কোন বিশিষ্টতা নাই। কবি, ইহার অনেকস্থলে যদিও সত্য কথাব অপলাপ করেন নাই, তথাপি ইহা বীভৎস বস পরিপূর্ণ —স্থানে স্থানে অপভাষা প্রয়োগ-দোষ-দুষ্ট। কবিতাটি পাঠ করিলে বিক্রমপুরবাসিগণেব দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কাবণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র বিক্রমপুরের কেবল যে নিন্দাই করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে; পরন্তু, তাঁহার কবিতায় সে দেশের যশঃ কীর্ত্তনও আছে।

একদিন তিনি বিক্রমপুরের অতীত কীর্ত্তি কাহিনী ও লুপ্ত মহিমার কথা উদাত্তস্বরে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। ১৩০০ সনে তিনি "বিক্রমপুর" নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন;—

"বিস্তীর্ণ বিশাল পদ্মা বিনাশ-অক্ষরে,
সৈকতে লিখিয়া যায় গত ইতিহাস,
হংস-বক, কাদাখোঁচা বালু চরে চরে,
পদচিহ্নে পরিশিষ্ট করিছে প্রকাশ!
আদিশূর যজ্ঞভূমি হবিঃ সিক্ত স্থল
তরঙ্গে লেহিয়া লোভে আজিও ধোয়ায়,
কনোজী ব্রাহ্মণ পঞ্চ-প্রতিভা অনল,
প্রজ্বলিত বেদমন্ত্র সুপ্ত-বালুকায়!

বিলুণ্ঠিত রত্নাকর ছিল 'সমতটে',
'রামপালে' পায় চাষা স্বপ্ন কত তার,
'রাজনগরের' কীর্ত্তি শত রত্নমঠে,
প্রগল্‌ভ স্পর্দ্ধিত ফেনে ভাসিছে তাহার!
বল্লালের দগ্ধ অস্থি ভস্ম কহিনুর,
তোমারি পথের ধূলি হে বিক্রমপুর!"

"বিক্রমপুরে বসন্ত" কবিতার উদ্দেশ্য, কবি-পত্নীর পিতামহীকে সংযত করা। বৃদ্ধাকে তিনি কি ভাবে কবিতায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—

"পবনাহীনা মবদা মেঘে পদ্মানদীর প্রায়,
ঠেরেণ দিদি বেড়ান আশে বাবুর বাড়ী যায়!
বাড়ী বাড়ী বৈঠক তাহার, পাড়ায়, পাড়ায় হাট,
এম্‌নি তিনি 'রায়বাঘিনী' দেখ্‌লে সবাই কাঠ!
কথায় চোটে আগুন ওঠে ডিনামাইটের মত,
মানুষ সে ত দূরের কথা, পাহাড় উড়ায় কত!
কিবা পুরুষ কিবা নারী সবাই করে ডর,
ফেলে দাড়ী নারদ নারী এম্‌নি মনে লয়!
কন্দলে আনন্দ বড় তা ছাড়া সে নাই,
মান্দার গাছে আন্ধার রাতে লড়াই করে তাই!

* * *

ঠাকুরদাদা স্বর্গে গেছেন তারে বদল দিয়া,
আমার বুকের শান্তি, আমার চখের নিদ্রা নিয়া!
বিনিময় সূত্রে আমি পাইয়াছি তারে
ব্রহ্মরন্ধ্র বিধি তিনি আছেন মজ্জাহাড়ে!

* * *

কল্প দিয়ে থামছে কলম, স্বল্প দেখে ত্রাস
(এখন) ঠৈরণ দিদির সঙ্গে করি বসন্ত-বিলাস!"

সমগ্র দেশবাসীর ইহাতে সন্তপ্ত হইবার কিছুই নাই।

১৩১২ সনের কার্ত্তিক মাসে, শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পরে গোবিন্দচন্দ্রের "বৈজয়ন্তী" নামক গীতিকাব্য প্রকাশিত হয়। কবিত্ব হিসাবে এখানি যে খুব উচ্চ শ্রেণীর ও তাঁহার অন্যান্য কাব্যের সমকক্ষ, এমন কথা বলা যায় না। কবি তাঁহার অন্নদাতা রাজা জগৎকিশোরকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

"মুক্তাগাছার মুক্তা তুমি, বঙ্গভূমির হীরা,
রাজা রাণীর মাথার মণি যশে জগৎ ঘিরা!

* * *

হে সন্ন্যাসি রাজঋষি তোমার মত কেবা,
জনক রাজার মত কর জগৎবাসীর সেবা!
শ্রদ্ধা ভরে ভক্তি ভরে তোমায় নমস্কার,
কৃপা ক'রে গ্রহণ কর প্রীতির উপহার!"

"বৈজয়ন্তী" কাব্যে তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-ব্যথামূলক কবিতাও আছে। ইহার "কাপুরুষ" শীর্ষক কবিতা অতি জঘন্য প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত। কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় বিস্তারিত ভাবে আমরা লিখিব না। কবিতার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, কবির দুঃখময় জীবনের যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহাদের অন্যতম। পরবর্ত্তী জীবনে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি, ইহা ছাড়া আর ঘৃণাব্যঞ্জক কবিতা রচনায় লেখনী কলুষিত করেন নাই। একদা সংসারের প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে পতিত হইয়া, বিপন্ন কবি তৎকর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

কবি, আজীবন বিপদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তথাপি একদিনের জন্যও ধৈর্য্যচ্যুত অথবা বিচলিত হ'ন নাই। তাঁহার জীবনের এই বিশেষত্ব প্রত্যেকের শিক্ষনীয়। মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি পর্ব্বতের ন্যায় নিষ্কম্প রহিয়াছেন। বৈজয়ন্তী কাব্যের "ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক" প্রভৃতি ভাষায় তিনি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাময় স্বীয় জীবনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কবিতাটির একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য কর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক্—আসুক্!
এ সংসার কর্ম্মশালা,
জলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে গাদ থাকে যতটুক্,
* * *
অনন্ত বিপদ দেও আসিবে আসুক্।
রুদ্ধ করি ব্যূহপথ,
থাক্ শত জয়দ্রথ,
অমরের প্রিয়—সে যে সমর কৌতুক,
* * *
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শত বজ্র গর্জ্জিবে গর্জ্জুক!
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ!
* * *

বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে
সিংহ ফিরে বীর মদে
আত্মগুপ্ত সভয়ে শম্বুক!
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক।"

ইহা, কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের আত্মজীবনের কথা। এস্থলে তিনি, জীবনের আদর্শ সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন।

"বৈজয়ন্তী" কাব্যে "আম্‌রা হরিহর" নামক একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে। ইহা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রাক্কালে বিরচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতি সমন্বয়, একতাসিদ্ধি এবং সার্ব্বজনীন্ ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব্ব চিত্র ইহাতে কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম একতা যে মুক্তি-সাধনার প্রধান সম্বল, তাহা তিনি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু মুসলমানের একতাবন্ধন, যে কোন কারণেই হউক, শ্লথ হইয়াছিল। সেদিকেই কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল।

"বৈজয়ন্তী" কাব্যের পর কবি গোবিন্দদাস, কেবল দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ব্যতীত আর কোন কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৩১৬ সনের ৬ই বৈশাখ ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী রক্তামাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং গমন করেন। তথায় অকস্মাৎ ২৫শে বৈশাখ রাত্রিকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে কবি গোবিন্দদাসের বিরচিত শোক গাথা ১৩১৬ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরে, কবি তাহা "শোক ও সান্ত্বনা" নামে ১৩১৬ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন।

ইহা শোক-সঙ্গীত হইলেও, ব্যক্তিগত ভাবে রাজকুমারের জন্য শোক প্রকাশ কবিয়া কবি ক্ষান্ত হ'ন নাই। পরন্তু, সমগ্র ভাওয়ালেব জন্য—তাঁহাব চিরপ্রিয় জন্মভূমির জন্য—ব্যথিত হৃদয়ে, অশ্রুজল মোচন করিয়াছেন।

১৩১৭ সনে ভাওয়ালে, আবার এক মহাপতন হয়। রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণেব জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ 'ভাওয়ালের বড় কুমার' রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয় অকালে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু, ভাওয়ালের পক্ষে অতীব মর্ম্মান্তিক ঘটনা। ইতঃপূর্ব্বেই মধ্যম কুমাব গত হইয়াছিলেন, এখন জ্যেষ্ঠ কুমাব গেলেন। রহিলেন, শুধু সর্ব্ব কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনারায়ণ। ইহাঁরা তিনজনেই অল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন।

তাঁহার অকালমৃত্যুতে কবি গোবিন্দচন্দ্র "শোকোচ্ছ্বাস" লিখিলেন। ইহা ১৩১৭ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

"শোকোচ্ছ্বাস" ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক হইলেও, ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে, পরম রমণীয়। পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকার মত ইহাতেও শোকের অনাবিল উচ্ছ্বাস, নদীস্রোতেব মত বহিয়া চলিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে কুমারের জন্য বিলাপ করিয়াও, অতীব সুশ্রাব্য ভাষায় কবি, ভাওয়াল রাজবংশের একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। ভাওয়ালেব অধঃপতন, কৌশলময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া, তদানীন্তন বিলুপ্ত-প্রায় বাজবংশের জন্য অশেষবিধ বিলাপ কবিয়াছেন। ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির স্থানে স্থানে চমৎকার উপমা দৃষ্ট হয়।

উদাহরণ আবশ্যক। কবিতাটির এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে ;-

"আজিকার—

এ ঘোর গভীর শোক   বাষ্প সম নহে লঘু,

উড়িয়া যাইবে দীর্ঘশ্বাসে,

বিলাপে কি হাহাকারে প্রাণ হবে লঘুভার
পরিমুক্ত কণ্ঠের বাতাসে !”

তারপর কবি, ভাওয়ালের বিনষ্টপ্রায় রাজবংশের কথা কহিতেছেন। ইহা লিখিতে তাঁহার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছিল। যে ভাওয়ালের অনিবার্য্য অধঃপতন প্রতিহত করিতে বিফল মনোরথ হইয়া, পরবর্ত্তী-কালে “মগের মুলুকে” যাহার কলঙ্ক কাহিনী লিখিতে কবি বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই প্রাণসমা মাতৃভূমি—ভাওয়ালের দুরবস্থার কথা লিখিতে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার হৃদ্‌বেপন হইতেছিল। পুস্তিকাখানি যেন “মগের মুলুকে”র এক অভিনব অধ্যায় ! নিম্নে দেখুন ;—

“বরষা দুর্দ্দিন অন্তে প্রফুল্ল শরত আসে,
জগতের এই ত নিয়ম,
অশ্রুময় শোক ঋতু ভাওয়ালে অপরিবর্ত্ত—
ভাওয়ালের বিধি ব্যতিক্রম !
এ ভাওয়াল অযোধ্যায়, কি কাল পুরুষ হায়,
কি কুক্ষণে করিল প্রবেশ,
রাজ্য হল ছারখার, রাজা না রহিল আর,
সবংশে করিল প্রায় শেষ !
প্রাণের অধিক ভাই, স্নেহের তুলনা নাই,
বর্জ্জিয়া সে রমেন্দ্র-লক্ষণ,—
বিধাতা হইল বাম,— অকালে রণেন্দ্র-রাম,
করিলা আপনা বিসর্জ্জন !”

এক্ষণে, দুই একটি উপমার মনোহারিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

“অভাগী ‘সরযূ’ বালা, পরিয়া চিতার মালা,
অশ্রুজলে বহিছে সদাই,

দীর্ঘশ্বাসে অনিবার, জীবন তরঙ্গে তার,
ভাসিতেছে চিতা-ভস্ম ছাই!
রমেন্দ্র-রমণী সতী, শোকাকুলা বিভাবতী,
নয়নে গলিছে অশ্রুধার,
বরষার জলে ভরা, উনমত্তা 'ঘর ঘরা',
কাঁদিছে ধরিয়া গলা তার!
কিম্বা যথা পতিহীনা, দু'টি কুরঙ্গিনী দীনা,
কাঁদে আহা গলাগলি করি,
অথবা হারায়ে পতি, বিবশা ব্যাকুলা অতি,
কাঁদে দু'টি অভাগা কুররী!
কিম্বা জলহীন বিলে, কুমুদ কমল মিলে,
কর্দ্দমে লুটিছে হায়, হায়,
প্রতিপদে শশী রবি, আহা কি করুণ ছবি,
এক সাথে ডুবিছে সন্ধ্যায়!"

শেষোক্ত ছত্র দুইটি অপূর্ব্ব। উপমাচ্ছলে প্রতিপদে রবি চন্দ্রের এক সাথে ডুবিবার কথা সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। অথচ ইহা নৈমিত্তিক ঘটনা!

উপসংহারে কবি গোবিন্দদাস কনিষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

"রবীন্দ্র! ভরত সম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়তম,
রামের চরণ পূজা করি,
পালন করহ রাজ্য, কর ধর্ম্মে রাজকার্য্য
আলস্য জড়তা পরিহরি!

রাজার বিলাস ভোগে, রাজার অমনোযোগে,
রাজা হয় সবংশে বিনাশ,
ইহাই রাজার পাপ, বিধাতার অভিশাপ,
ইহাই রাজ্যের ইতিহাস।
সনাতন রাজনীতি, সাধিবে প্রজার প্রীতি
ন্যায় ধর্ম্মে করিবে পালন,
প্রজার সে অসন্তোষে, অর্থ শোষে বল শোষে
রাজলক্ষ্মী করে পলায়ন।”

“শোকোচ্ছ্বাস” এবং “শোক ও সান্ত্বনা” নামক পুস্তিকা দুইখানি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

১৩১৮ সনে ময়মনসিংহ নগরে “সাহিত্য সম্মিলন”এর অধিবেশন হয়। সুসঙ্গের মহারাজ উক্ত সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। “সৌরভ” সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সম্মিলনে “ময়মনসিংহে সাহিত্যচর্চ্চা” নামক সুশ্রাব্য এবং চিত্তাকর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের একস্থানে আছে ;—

“বাঙ্গালা বক্তৃতাদ্বারা এই নগরে, সাহিত্যচর্চ্চার সামান্য সহায়তা হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সামর্থ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জীবিত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থের সমালোচনার এস্থান নহে। এই সভাস্থলে উপস্থিত সারস্বত কবি ভাওয়ালের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের কাব্য গ্রন্থের কোন সমালোচনা করিব না।”

১৩১৮ সনের মধ্যভাগে কবির স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়িল।



কবি গোবিন্দদাস ও সাহিত্যিক বন্ধুবর্গ।

(ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত সাহিত্য-সেবীবৃন্দ—১৩১৮ সন)

ঐ বৎসরের ২৮শে ভাদ্র, তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মদেশে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে উল্লিখিত ছিল,—

"আমাকে এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলিয়াছেন—৩৪ বছরের মধ্যে আমি মরিব। বাস্তবিক আমার শরীরও আজকাল নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। সামান্য একটু মাথা ধরিলেও আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ি, যেন উঠিতে পারি না। আগে এমন অসুখ গ্রাহ্যই করিতাম না। আর সর্ব্বদাই আমার অসুখ লাগিয়া আছে। একদিনও স্বাস্থ্য-সুখ ভাগ্যে ঘটে না। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, উঠিতে বসিতে যেন হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুষ্টিকর আহার অভাবে আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। জয়দেবপুরের কুমারেরা যে মাসিক ২৪৲ টাকা আমাকে সাহায্য করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে। একমাত্র রাজা জগৎকিশোরের সাহায্যে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। দুধের সের ।০, ৶০ আনা, মাছ দুষ্প্রাপ্য। ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব? একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচদিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। যা' হউক, একদিন মরিতে হইবেই, তাহার জন্য চিন্তা কি?"—অপ্রকাশিত পত্র।

১৩১৮ সনের কার্ত্তিক মাস হইতে কবি গোবিন্দচন্দ্র অর্শরোগের প্রবল আক্রমণে মরণাপন্ন হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্থাভাব তাঁহার মরণাহত জীবনের দুঃখকে দ্বিগুণতর করিয়া তুলিল। কবি, তৎকালে তাঁহার শিশু সন্তানগণসহ দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। রোগের চিকিৎসা দূরে থাকুক, অনুপযুক্ত আহারে তাঁহার শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

কবি গোবিন্দ অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়া, ১৩১৮ সনের ১৯শে পৌষ, তাঁহার পল্লীভবন হইতে আমাদিগকে লিখিলেন,—

"আপনার পত্রখানা অনেক দিন হয় পাইয়াছি, একটু অবসর মত

লিখিব এই আশায় রহিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান্ আমার ভাগ্যে শান্তির অবসর দেন নাই। বাড়ীর ঠিকানা হইতে পত্রখানা জয়দেবপুরে গিয়াছিল, আমি তখন সেখানেই ছিলাম। যখন আপনার পত্র পাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ প্রায় দেড়মাস যাবৎ রক্ত পড়িতেছে। একেই আমি কিরূপ দুর্ব্বল তাহা জানেন। ইহার উপর প্রত্যহ এক ছটাক আধ ছটাক রক্ত পড়িলে আমি আর কত সহিতে পারি? নিতান্ত উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

* * *

অর্শের জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি। এই পত্রখানা লিখিতেও বেদনা ও টন্‌টনানিতে অস্থির আছি। আপনার কুশল লিখিবেন।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

পত্রখানি পাঠ করিয়া কবি গোবিন্দচন্দ্রের তৎকালীন শারীরিক অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমারদ্বয়ের অকালমৃত্যুতে, তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কবি, দৈন্যদশার চরমে উপনীত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ কুমারও অর্থ সাহায্য স্থগিত করেন। এ প্রকার অর্থকৃচ্ছ্রতায় নিপতিত হইয়া, ১৩১৮ সনের ৭ই ফাল্গুন কবি আমাদিগকে আবার লিখিলেন,—

"জয়দেবপুরের বড় ও মেঝো কুমার মারা যাওয়ায় তাঁহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। ছোট কুমারের নিজ খরচেই কুলায় না। মাসিক ১১০০ টাকা তিনি পান। তাহা তাঁহার প্রাইভেট্ খরচেই ব্যয় হয়, এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।"—অপ্রকাশিত পত্র।

এই পত্রখানি প্রণিধানের যোগ্য বটে !

ভাওয়াল রাজকুমারদিগের অর্থ সাহায্য বিলুপ্ত হওয়াতে কবির অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিল। একমাত্র রাজা জগৎকিশোরের মাসিক বৃত্তিদ্বারা কায়ক্লেশে দিন যাপন কবিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থাই আর হইল না।

উল্লিখিত ১৩১৮ সনের শ্রাবণ সংখ্যা "নব্যভারতে" "আমার চিতায় দিবে মঠ" নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। রোগে, অনাহারে বা সল্লাহারে, জীবন্মৃত কবি সাশ্রু-নয়নে কি করুণ ভাষায় লিখিতেছেন দেখুন,—

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে´—
তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোস্‌ করি, না খেয়ে শুকায়ে মরি ;
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় কবি ছট্‌ফট্‌ ;
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে´,
তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ ?"

ইহাতে তাঁহার শীর্ণ, বুভুক্ষিত স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণের যে সজীব প্রাণ-স্পর্শী চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত কবির ক্লান্ত অবসন্ন মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে।

উল্লিখিত কবিতা প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাস-কবির মুখে শুনিয়াছি যে, তৎকালে তাঁহাকে বলীহারের রাণী মহোদয়া ; দিঘাপাতিয়ার রাজা বাহাদুর ; প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শশধর রায় ; ময়মনসিংহস্থ সেনবাড়ীর মহেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন উদার-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার দুঃখ আংশিক অপনোদিত হয়।

১৩১৮ সনেই "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" হইতে ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রমুখ ৫১ জন সুবিখ্যাত দেশনায়কগণ, ভাওয়ালের পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিধবা রাণী মহোদয়ার নিকট একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাস-কবির অবস্থা দৃষ্টে তিনি অর্থ-সাহায্য করিবেন এবং কবিকে ঢাকা-নগরীতে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন ইহাই আবেদনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কবির অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ বলিতে হইবে, কারণ তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই।

নিম্নে আমরা উল্লিখিত আবেদনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম ;—

"মহোদয়া,

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস, ভাওয়ালের কবি,—পূর্ব্ববঙ্গের কবি,—অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান কবি। কিন্তু এই চির-দরিদ্র কবির দারিদ্র্য এখন চরমে উপস্থিত। এ সময় তাঁহার দেশবাসীরা যদি তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতা পাশে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। গোবিন্দ-চন্দ্রের কাব্যের সহিত ভাওয়াল রাজবংশের কীর্ত্তি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। তিনি ভাওয়াল রাজের প্রজা। শৈশব হইতে ভাওয়াল রাজবাটীতে, রাজ অন্নে, রাজ অনুগ্রহে লালিত পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের যে গৌরব-আসনে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, ভাওয়াল রাজই তাহার প্রধান কারণ। তজ্জন্য কবি এবং কবির গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ, ভাওয়াল রাজ-সংসারের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা আপনাকে এখন এই অনুরোধ করি যে, যে কবি স্বামি-দেবতার সহিত,—আপনার শ্বশুরকুলের সহিত চির-জীবন জড়িত, সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাকা-নগরীতে একটি বাসগৃহ প্রদান করিয়া

তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন। তিনি বিক্রমপুরে এখন যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা আচিরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভাওয়ালেও এখন বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন; সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। পাঁচ কি ছয় হাজার টাকা হইলেই, তাঁহার উপযুক্ত বাসগৃহ হইতে পারে। আপনার পক্ষে ইহা ইহ-জীবনেব সংস্থান। আপনি অবগত আছেন যে, আপনার স্বর্গগত স্বামীদেবতা গোবিন্দবাবুকে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আশা করি, এই নিরাশ্রয়, বঙ্গসাহিত্যের কীর্ত্তিমান কবিকে আপনি একটি বাসোপযোগী গৃহ প্রদান করিয়া রাজবংশের পূর্ব্ব গৌবব ও বদান্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। গোবিন্দবাবু, সেই গৃহ আপনার নামে অথবা আপনার স্বর্গীয় স্বামীর নামে নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আমরণ এই দান স্মরণ রাখিবেন, এবং সমগ্র দেশ-বাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার এই কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল থাকিবে। পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রাচীনতম রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার ও দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। হিন্দু বিধবার নিকট ভরসা করি—এই সমবেত অনুরোধ কখনও উপেক্ষিত হইবে না।”

বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাঙ্গালার কবি-কুল-তিলক শ্রীমধুসূদন এক প্রকার অর্দ্ধাশনে প্রাণত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তার পর কবিবর হেমচন্দ্রও অর্থাভাবে অন্নকষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের অবস্থা সম্যক-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এ যুগের একজন প্রতিভাবান দরিদ্র কবির আক্ষেপোক্তি যে আমাদের হৃদয় আলোড়িত করিতে পারে নাই, ইহা নিতান্তই কলঙ্কের নিদর্শন বলিতে হইবে।

এ যুগে জীবিত কবিগণের সম্বর্দ্ধনাও হইয়া গিয়াছে, অথচ দরিদ্র

গোবিন্দ কবির জীবিত অবস্থায় একটা ছোটখাটো রকমের সম্বর্দ্ধনা দূরে থাকুক্, তাঁহার অন্নকষ্ট দূর করিতে পারিলেও আমাদের দেশের একটা ঋণ পরিশোধ হইত। কিন্তু দৈবচক্রে তাহা হয় নাই। গোবিন্দচন্দ্রের মত একজন খাঁটি কবি যে জীবিত কালেই সম্বর্দ্ধনার উপযুক্ত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে, কেন এমন হইল ?

দাস-কবির বিরচিত "আমার চিতায় দিবে মঠ" কবিতা প্রকাশিত হইলে "বীরভূমি" সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ;—

"পড়িয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারি নাই। দেশবাসিগণ, এই কবিতাটিকে কেবল কবিতারূপেই গ্রহণ না করিয়া, কবির প্রতি অন্তরূপ কর্ত্তব্য আছে কি না ভাবিয়া দেখিবেন।"

কিন্তু কি পরিতাপের কথা যে, আমাদের প্রাণে যথাসময়ে সে কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয় নাই। "আমার চিতায় দিবে মঠ" কবিতাটি বাস্তবিকই কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—ইহা আদ্যোপান্ত হৃদয়বিদারক—প্রকৃত অবস্থার প্রতিবিম্ব। কবি যেন স্পষ্টরূপে ভবিষ্যতের চিত্রখানি চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ জাতীয় কবিতায় যে দেশ সহজে সাড়া দেয় না, সে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কি অন্ধকার, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কবির মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে কোন অনুষ্ঠানকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করিতেই যেন গোবিন্দচন্দ্র কবিতাটি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই কবিতাটি গোবিন্দচন্দ্রের আত্মপ্রত্যয়ের আশ্চর্য্য নিদর্শন। তাঁহার কবিতা যে একদিন বঙ্গসাহিত্যে আদরণীয় হইবে, তাহা যেন তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। মাইকেলেও এই ভাব দেখা যায়। মনে হয়, স্বীয় রচনার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি কবি গোবিন্দদাস যথেষ্ট আস্থাবান্ ছিলেন।

১৩১৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় "বীরভূমি"তে সম্পাদক মহাশয় "দুঃস্থ কবি গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

"ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের নাম সকলের পরিচিত না হইলেও, যাঁহারা বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছেন। "চন্দন" "কস্তুরী" প্রভৃতি যে বঙ্গসাহিত্যে অমর হইবে, তাহা কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। * * * বড়ই দুঃখের কথা যে, আজ এই প্রতিভাশালী প্রবীণ কবি, অতি ভীষণ দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রোগে, শোকে ও বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-সেবার পর হতভাগ্য কবি, আজ অন্নাভাবে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছেন। * * * একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক,—ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাহিত্য-গৌরবে যে জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—সেই তাঁহার স্বজাতির মধ্যে এক-মুষ্টি অন্নের অভাবে মারা যাইবেন, এ কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য এদেশে কি কেহই নাই? * * * যখন ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা শুনিবে, এই আদরণীয় কবি দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া দেশবাসিগণের নিকটে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার মত একমুষ্টি অন্ন সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই, তখন তাহাদের পিতৃগণের নামে এ অপবাদ কি তাহাদিগকে বাজিবে না? গোবিন্দের প্রতি দেশের যে একটা কর্ত্তব্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করা যায়, আমরা তাহা সাধ্যমত পালন করিতে সক্ষম হইব।"

লিখিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, কবি গোবিন্দদাস তাঁহার সেই দুঃসময়ে নিতান্ত দগ্ধ-হৃদয়ে "আমার চিতায় দিবে মঠ" কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। "নব্যভারতে" প্রকাশিত উক্ত কবিতার পাদ-টীকায় লিখিত আছে—"কোন রাজকুমারকে তাঁহার একজন সহচর,

আমি মরিলে আমার চিতায় মঠ দিতে বলিয়াছিলেন, ইহা তচ্ছ, বণে লিখিত।"

বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্য সংসারে সুপরিচিত—লব্ধপ্রতিষ্ঠ, জনৈক সুলেখকের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কবি ১৩১৮ সনের ১৯শে পৌষ আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একস্থানে আছে—

"* * সম্পাদক * * * কে * আমি রুচি বিকারের কবিতায় অনেক লিখিয়াছিলাম, এবং সেদিনও 'আমার চিতায় দিবে মঠ' কবিতা উৎসর্গ করিয়াছি। এজন্য * * * * আমার উপর বিরক্ত।"—অপ্রকাশিত পত্র।

কবি গোবিন্দদাস যখন দুঃখ-দৈন্যের চরম সীমায় উপনীত, তখন তাঁহার সাহায্যার্থে কলিকাতাস্থ "ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌" গৃহে ১৩১৮ সনের ১লা চৈত্র এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভার অনুষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্তভূষণ, "বীরভূমি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, বি, এ। উক্ত সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম, এ মহোদয় একটি সুচিন্তিত, সারগর্ভ অথচ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর একজন মনস্বী লেখক,—তাঁহার প্রবন্ধও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কবির প্রতি আমাদের দেশ যে পূর্ব্বাপর একটা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে এবং গোবিন্দচন্দ্রের মত স্বভাব-কবির প্রতি দেশের উপেক্ষা যে কতদূর অন্যায়, তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত নির্ভয়ে, জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধটি পরে "বীরভূমি"তে মুদ্রিত হয়।

উল্লিখিত সভার ফলে, মনীষি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবনায় এবং তৎকর্ত্তৃত্বে নিরন্ন কবির জন্য একটি "সাহায্য সমিতি" গঠিত হইয়াছিল। কবি গোবিন্দদাসের উপকারার্থে, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের এইরূপ চেষ্টা, তাঁহার গুণগ্রাহিতা এবং মহানুভবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টা একেবারে বিফল হয় নাই।

সে সময় ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমারের বিধবা রাণীদ্বয় কলিকাতায় ছিলেন। সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠানের কথা জ্ঞাত হইয়া মধ্যমা রাণী দাস-কবিকে এককালীন ১০৲ টাকা দান করেন। এবং জ্যেষ্ঠা রাণী সরযূবালা ১৩১৯ সনের বৈশাখ হইতে তাঁহার স্বামীর প্রদত্ত মাসিক আট টাকা সাহায্য পূর্ব্ববৎ প্রদান করিতে থাকেন। মধ্যমা ও কনিষ্ঠা রাণীর নিকট হইতে কবি আর কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন নাই।

রোগশয্যায় জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে শায়িত হইয়াও কবি গোবিন্দচন্দ্র, বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। রোগ-যাতনায় কাতর হইলেও তাঁহার লেখনী নিরস্ত ছিল না। সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে সকল অবস্থাতেই তাঁহার অমর লেখনী-মুখে স্বাভাবিক কবিত্ব-নির্ঝরের অমৃত-ধারা উৎসারিত হইত।

যাঁহারা স্বভাব-কবি, তাঁহাদের পক্ষে লেখনী সংযত করা অসাধ্য। বরঞ্চ অবস্থাবৈগুণ্যেই তাঁহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। আগুনে দগ্ধ হইলেই সুবর্ণের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠে।

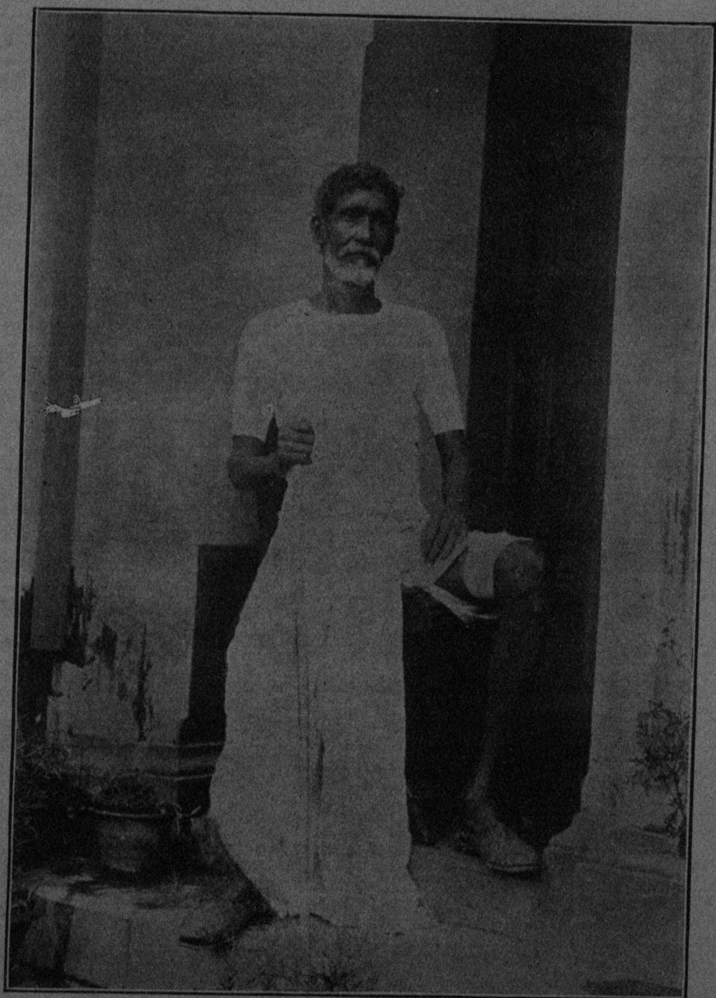
সেবারকার কঠিন রোগের করাল কবলে পতিত হইয়া—মৃত্যু একান্ত নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া—গোবিন্দচন্দ্র, ১৩১৮ সনের "নব্যভারতে", "দিন ফুরায়ে যায়" শীর্ষক প্রাণস্পর্শী কবিতা রচনা করেন। রোগ-শয্যাশায়ী মরণোন্মুখ কবির মর্ম্মের বেদনার ভিতর দিয়া পরকালের

চিন্তা সেই কবিতার প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান। মরণাহত কবি লিখিয়াছিলেন ;—

"দিন ফুরায়ে যায়রে আমার, দিন ফুরায়ে যায় !
মাঝের রবি ডুব্‌ছে সাজে, দিনটা গেল বৃথা কাজে
এক পা কেবল পারে আছে, এক পা দিছি নায়,
আজ কর্‌ব না কর্‌ব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি—
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার, দিন ফুরায়ে যায় !"

ইহা পাঠ করিলে, মিশরের সুবিখ্যাত নীল-নদের জলস্রোতে ভাসমান, প্রবাদ-প্রসিদ্ধ—জরাক্রান্ত—মরণাপন্ন, সুবৃহৎ রাজহংসের বিদায়-সঙ্গীতের কথা প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে।

কিন্তু, দয়াময় জগদীশ্বর বঙ্গদেশের এই নিরন্ন কবিটিকে সেবারের আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।



দাতব্য চিকিৎসালয়ে গোবিন্দ দাস।

("সৌরভ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে)

নবম পরিচ্ছেদ

—:•:—

দাতব্য চিকিৎসালয়ে গোবিন্দদাস,-
"গীতা"র কাব্যানুবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের মহা-কবি শ্রীমধুসূদন ও কান্ত-কবি রজনীকান্ত, জীবন-সায়াহ্নে—দুরদৃষ্টের প্রবল আকর্ষণে—দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্রও একদিন অবস্থায় পতিত হইলেন।

১৩২২ সনের ১৭ই আষাঢ় অকস্মাৎ একদা তাঁহার বাম উরু-প্রদেশের একটি স্থান প্রদাহিত হইয়া তথায় জ্বালাযুক্ত বেদনার সঞ্চার হয়। দুই দিন পর প্রদাহিত স্থানটি স্ফোটকাকারে পরিণত হইয়া পড়ে, এবং তৎসহ বেদনা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় কবি ঢাকা, জয়দেব-পুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা স্থানে বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অবশেষে ২৭শে আষাঢ় জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলে, রোগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ভীষণ উরুস্তম্ভরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, তিনি এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, অচিরে শয্যাশায়ী হইতে বাধ্য হইলেন।

রোগের সূত্রপাতে ইহার ভয়াবহ পরিণাম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া গোবিন্দচন্দ্র, যৎসামান্য স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ করেন।

তরুণ বয়সে মেডিকেল স্কুলে অল্প দিন অধ্যয়ন করিয়া এবং নিজের আগ্রহাতিশয্যে তিনি গৃহস্থের নিত্য আবশ্যকীয় সামান্য সামান্য পাশ্চাত্য ঔষধের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক দেশীয় বনৌষধির কথাও তিনি অবগত ছিলেন।

কিন্তু নিজের চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি, জয়দেবপুরের জনৈক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ডাক্তার মহাশয় কার্ব্বঙ্কল বলিয়া রোগ নির্ণয় করিলেন এবং অস্ত্র করাইতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে উরুস্তম্ভে অস্ত্রোপচার করা হইল। অথচ তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার বিশেষ উপশম হইল না। তিনি তখন জীবনের আশঙ্কাই করিতে লাগিলেন।

এদিকে অর্থাভাবে রীতিমত চিকিৎসক ডাকিয়া দেখাইবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। স্ত্রী পুত্র পরিজন হইতে দূরে রহিয়া যথাযোগ্য শুশ্রূষার অভাব তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে ঢাকার দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে জয়দেবপুর হইতে ৭ই শ্রাবণ তাঁহাকে ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে অপসারিত করা হইল। তাঁহার অবস্থা তখন আশঙ্কাজনক।

আমরা তখন সুদূর ব্রহ্মের উত্তর সীমান্তে—পর্ব্বত শিখরে যক্ষের মত নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছিলাম। কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার বিপদের কতক বিবরণ, ঢাকার চিকিৎসালয় হইতে ১৩২২ সনের ৫ই ভাদ্র আমাদিগকে লিখিলেন ;—

"আমি প্রায় দেড় মাস যাবৎ কার্ব্বঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া কাতর

আছি। ১লা শ্রাবণ ইহা জয়দেবপুরে কাটাইয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে 'ড্রেস্' করার সুবিধা না হওয়ায় ৭ই শ্রাবণ এখানে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছি। * * * আপনি কবে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিবেন; আপনাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়।"

হাস্‌পাতালে প্রবিষ্ট হইবার পর, রোগ-শয্যাশায়ী গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী, অচিরে কয়েকখানি সংবাদপত্রে প্রচারিত হইলে, তাঁহার জন্য দেশের ভিতর একটা সমবেদনার মৃদু স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। কবির জীবনে ইহা এক অমৃতযোগ বলিতে হইবে।

তৎকালীন "বাঙ্গালী" নামক দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়—

"কবি গোবিন্দদাস।

রোগশয্যায় হাস্‌পাতালে।

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাম উরুদেশে স্ফোটক হইয়াছে। কিছু দিন হইতে কবি এই স্ফোটকের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাস্‌পাতালে নীত হইয়াছেন। হাস্‌পাতালের "সাধারণ ওয়ার্ডে" তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। হাস্‌পাতালের চিকিৎসক ও ছাত্রগণ অতীব যত্নের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। বাঙ্গালার কবি,—বাঙ্গালীর কবি মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহপাত করিয়াছিলেন। সে সকল স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মধুসূদন যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব দীন ছিল। এখন বাঙ্গালীর জাতীয় ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। গোবিন্দদাস বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। কিন্তু তিনি নিঃস্ব, চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে কাতর। আজ তাঁহার দেশবাসী,

তাঁহার দিকে লক্ষ্য করুন, তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করুন। হাসপাতালে যাহাতে তাঁহার সুব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারিত করুন। নতুবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। জগদীশ্বর, কবি গোবিন্দদাসকে সত্বর রোগমুক্ত করুন।

—বাঙ্গালী

২৫শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

১৩২২ সন।"

"বাঙ্গালী"তে গোবিন্দচন্দ্রের অসুস্থতার বিবরণ প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহ পর, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক, দেশবন্ধু, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ভাগলপুর হইতে ঢাকার ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন।

"Kindly see to treatment of poet Govinda Dass am responsible for expenses write to me here."

17th Aug. 1915. —C. R. Dass.

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের এই অযাচিত দয়া এবং মহানুভবতা দেশবন্ধুর যথাযোগ্য কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একথা বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠা হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে।

দেশবন্ধুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ব্যারিষ্টার বসু মহাশয় কবি গোবিন্দদাসকে দেখিবার নিমিত্ত হাসপাতালে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার যথাযোগ্য শুশ্রূষা প্রভৃতি হইতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন। ঢাকার উকীল এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন মহাশয় প্রত্যহই একবার দাস-কবিকে দেখিতে যাইতেন। ঢাকার অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুতর সাহিত্যিকবৃন্দের অপর কেহ তাঁহার অবস্থা

নিরীক্ষণ করিতে হাসপাতালে যাইতেন কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না। শুনিয়াছি অপর কেহই যান নাই।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর, তাঁহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। তথাকার চিকিৎসকগণের নৈপুণ্যে ও সুব্যবস্থায়, কবি গোবিন্দদাসের জীবনাশঙ্কা দূরীভূত হইল। ক্ষতস্থান অল্প অল্প করিয়া পরিপূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুর্দ্দিনের কালো মেঘ কাটিয়া গেল। কবি গোবিন্দদাস মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেন।

১৪ই ভাদ্র ঢাকা হইতে কবি গোবিন্দচন্দ্র আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—

"কয়েকদিন হইল হাসপাতালে থাকিতে আপনাকে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে আমার অসুখের কথা অবগত হইয়াছেন। * * * ঘা প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য বাড়ী যাইব মনে করিয়াছি। একমাস আট দিন মিট্‌ফোর্ড হস্পিটালে বাস করিয়া আসিয়াছি। হস্পিটালের কর্ম্মচারী, ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাকে একটি ভিন্ন কোঠায় থাকিতে দিয়াছিলেন, খাবারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হস্পিটালে আমি কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা বা কষ্টভোগ করি নাই। ঘা শুকাইলেও শরীর ভাল বোধ হইতেছে না। * * *

পদ্মাও এমন ভাঙ্গিতেছে যে, বামনগাঁয় এবারও থাকিতে পারি কি না, তাহার স্থিরতা নাই। * * * এ অবস্থায় এই শিশু সন্তানাদি লইয়া কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়া পাই না। জগদীশ্বর এই শেষ কালে সর্ব্বশূন্য করিবার যোগাড় করিয়াছেন। * * *"

রোগ-শয্যায় গোবিন্দচন্দ্র সাহিত্য সাধনা হইতে বিরত ছিলেন

না। আরোগ্যান্তে "কেন বাঁচালে আমায়?" কবিতা লিখিয়া জীবনের শোচনীয় কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৩২২ সনের "সৌরভে" তাহা প্রকাশিত হয়।

"কেন বাঁচালে আমায়?

আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্রযোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি, লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!

* * *

চাল ডাল তেল নূন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কলিজায়

* * *

ছেলের বইয়ের কড়ি, জোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া তেনা গায়!

* * *

তোমার 'বাবার' প্রাণ, থাকিলে হে ভগবান,
দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায়।

* * *

মরিলে থাকিত মূল, বেঁচে যেত জাতিকুল,
বিধাতা তোমার ভুল—দুই কুল যায়!
কেন বাঁচালে আমায়?"

রোগমুক্ত হইয়া তিনি পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য শীঘ্র দূরীভূত হইল না।

রঙ্গপুর জেলার তুষভাণ্ডারের জনৈকা রাণী মহোদয়া কাশীধামে শিব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া "গীতা" বিতরণ করিবার প্রস্তাব করেন। কবি গোবিন্দদাসের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে দিয়া "গীতা"র বঙ্গানুবাদ করাইতে রাণী মহোদয়ার আগ্রহ জন্মে। তদনুসারে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী মহাশয় দ্বারা কবিকে ১৩২২ সনের ৩০শে পৌষ একখানা পত্র লিখাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য রাণী মহোদয়া কবির পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রায় দুই শত মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া- 'ছলেন। এতদুপলক্ষে দাস-কবির সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু পত্রালাপ হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় কৃতবিদ্য এবং সাহিত্যিক। দাস-কবির জীবনী রচনায় আমাদিগকে তাঁহার উৎসাহ দান বস্তুতঃই প্রীতিপ্রদ।

যাহা হউক, রাণী মহোদয়ার অনুরোধে দাস-কবি ১৩২২ সনের মাঘ মাস হইতে গীতার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন। তাহা সমাপ্ত করিতে প্রায় আড়াই বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহা সমাধা হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁহার জীবদ্দশায় "গীতার অনুবাদ" রাণী মহোদয়ার গোচরীভূত হয় নাই। সংসারের নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে আবদ্ধ রহিয়া তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও রাণী মহোদয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারেন নাই। কতবার রাণী মহোদয়ার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু অকস্মাৎ এমন একটা প্রতিবন্ধক আসিয়া জুটিয়াছে যে, বাধ্য হইয়া তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। অভাবের তাড়না বড় বিষম!

একে অনুবাদ কঠিন কাজ, তদুপরি গীতার মত দুরূহ ও জটিল ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুবাদ, নিতান্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই কাজটি নিষ্পন্ন করিতে কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রভূত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

"গীতার অনুবাদ" সম্পর্কে একখানি পত্রে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন ;—

"অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে ভাবি নাই যে কাজটা এত কঠিন! অনুবাদ আরম্ভ করিয়া বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি।

এক একটি শ্লোকের জন্য আমাকে এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যে তাহা আর কি বলিব? এই জন্য অনেক সময় লাগিতেছে। তাব পর আমি সংসারের নানা রকম যন্ত্রণায় বিব্রত,—এই অবস্থায় কতদিনে যে অনুবাদ শেষ করিব বলিতে পারি না। অন্নচিন্তা না থাকিলে অন্য কথা ছিল।"

বাস্তবিকই দারুণ দৈন্য দশাগ্রস্ত হইয়া তিনি তাঁহার জীবনের সঙ্কল্পিত বহু কাজ সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিগত "মহাযুদ্ধ" এবং "পদ্মা নদী" প্রসঙ্গে দুইখানি কাব্য রচনা করিতে তাঁহার একবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর পূর্ণ হয় নাই। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট পিষ্ট হইয়াও বঙ্গ সাহিত্যকে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সম্ল সম্পদ নহে; সুযোগ সুবিধা পাইলে তিনি, বঙ্গ ভাষার পুষ্টি সম্পাদনে, কৃতিত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিতেন!

সৌভাগ্যের বিষয় যে, "গীতার অনুবাদ" খানি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অনুবাদ সুন্দর এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। রাণী মহোদয়া গীতার আক্ষরিক অনুবাদ চাহিয়াছিলেন এবং দাস-কবিও তাঁহার অভিপ্রায় মত সাধ্যানুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

আমরা গোবিন্দদাসের "গীতার অনুবাদ" হইতে প্রথম কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। কোন কোন শ্লোকের দুই তিন রকম অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন।

"গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

১। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মদীয় পাণ্ডবে
কি করিল সঞ্জয় যুদ্ধার্থী মিলি সবে ?
সঞ্জয় কয়ে কি মিলে রণাকাঙ্ক্ষী সবে ? (১)
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মম পুত্রগণ
আর পাণ্ডুর তনয়,
মিলিত হইয়া সবে করিবারে রণ
কিবা করিল সঞ্জয় ? (২)

২। ব্যূহিত পাণ্ডব সৈন্য করি দরশন।
আচার্য্যে কহিলা গিয়া রাজা দুর্য্যোধন॥

৩। দেখ তব ধীর শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃত
বিপুল পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহ বিরচিত॥ (১)
গুরু তব ধীর শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃত
পাণ্ডবের মহা সৈন্য দেখহে ব্যূহিত (২)

৪।৫।৬ এই সৈন্য মধ্যে বীর মহা ধনুর্দ্ধর
সমরে ভীমের মত অর্জ্জুন সোসর।
মহারথ বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান,
বীর্য্যবান ধৃষ্টকেতু, আর চিকিতান,

কাশীরাজ উত্তমৌজা, সুভদ্রা কুমার,
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, নরশ্রেষ্ঠ আর
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য নরপতি
বিক্রান্ত সে যুধামন্যু ; সবে মহারথী।”

অনুবাদখানি অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে! রাণী মহোদয়ার নিকট গ্রন্থখানি লইয়া যাইতে, মৃত্যুর পূর্ব্বে কবি তাঁহার পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা পালিত হয় নাই।

গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী মহাশয় কবির দ্বিতীয় পুত্রের নিকট গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং কতক মুদ্রা কবির পারিশ্রমিক স্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের অসম্মতি প্রযুক্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

১৩২৫ সনে ঢাকা নগরীতে সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল। সম্মিলনের তারিখ ১৩২৪ সনের ৩০শে চৈত্র এবং ১৩২৫ সনের ১লা বৈশাখ।

শুনা যায় যে, কবি গোবিন্দচন্দ্রকে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের দিন শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়, সভায় দাস-কবির অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত কথা প্রকাশিত হয়।

এ সম্বন্ধে ১৩২৫ সনের আষাঢ় সংখ্যা “নব্যভারতে” জনৈক লেখকের নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

“বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জন্য যে কয়েকখানা পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইয়াছিল, তদ্দারাই কবি গোবিন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য সম্মিলনের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে গাড়ীও প্রেরিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।”

উল্লিখিত উক্তিগুলি কতদূর প্রামাণিক জানি না। তবে ইহাতে এইমাত্র অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্করের অনুসন্ধানের ফলে, কবি গোবিন্দচন্দ্রের উদ্দেশ করা হইয়াছিল। উক্ত মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে "তাঁহার গৃহে গাড়ীও প্রেরিত হইয়াছিল।" হইতে পারে—কিন্তু প্রমাণের অভাব! তিনি মধ্যে মধ্যে ঢাকায় আসিলে নারান্দিয়া নামক স্থানে জনৈক পরিচিত ব্যক্তির গৃহে অবস্থান করিতেন।

সম্মিলনের সময় নিজের কার্য্যোপলক্ষে তিনি নারান্দিয়ার সেই বাড়ীতে অস্থায়ী ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের গতিবিধি যখন কর্ত্তৃপক্ষগণের জানা ছিল—তখন কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলে এত কথার সৃষ্টি হইত না।

১৩২৫ সনের আষাঢ় সংখ্যা "নব্যভারতে" প্রকাশিত, আর একজন লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল,—

"সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ গোবিন্দদাসকে নিমন্ত্রণ না করিয়া নিন্দিত কার্য্য করিয়াছেন। ভরসা করি, তাঁহারা তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন।"

তারপর, আরও একজন লেখকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩২৫ সনের বৈশাখ সংখ্যা "নব্যভারতে" লিখিয়াছিলেন;—"শিবশূন্য যজ্ঞ, আর ঢাকায় কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে বাদ দিয়া সাহিত্য সম্মিলন! * * * * গোবিন্দচন্দ্রের মর্য্যাদা অনুভব করিবার মত লোকও ঢাকায় নাই।"

১৩২৫ সনের কার্ত্তিক সংখ্যা "নব্যভারতে" উপরোক্ত লেখক আবার লিখিয়াছিলেন;—

"কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে একদা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় নাকি বিশেষভাবে আক্রমণ

করিয়াছিলেন। অত্যন্ত তেজস্বিতার সহিত তাঁহারা গোবিন্দ বাবুকে বলেন 'দেখুন, আপনি যার তার কাছে বলেন, আপনাকে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এ সব কি? আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ পত্র ও ব্যাজ পাঠাইয়া দিয়াছি, আপনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া রাখিলেন; আবার এখন এসব কি করিতেছেন?' যে গোবিন্দবাবু অসাধারণ তেজস্বিতার জন্য পরের অধীনে চাকরি করিতে পারিলেন না, তিনি এ ঔদ্ধত্য সহিবেন কেন? তিনি সমান তেজে উত্তর করিলেন,—'কোন্ মাতাল বলে যে আমি স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিয়াছি? আমার নামে কেহ কোন পত্র দেয় নাই। যার সাহস থাকে আমার স্বাক্ষর উপস্থিত করুন। আমি সাহিত্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা কখনো পোষণও করি নাই। আমি কাহারও নিকট আপনাদের সম্বন্ধে কিছু বলিও নাই। অনর্থক আপনারা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসেন কেন?' এগুলি ত আমি অন্যের মুখে শুনি নাই, অদূরে দাঁড়াইবার সৌভাগ্য আমার সেদিন ঘটিয়াছিল।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশনিচয় অপরের মুখ-নিসৃত কথা। ইহাতে কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হউক, বা না হউক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এক্ষণে, কবি গোবিন্দদাস স্বয়ং কি বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য; এ সম্বন্ধে আমাদের স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করিব না। গোবিন্দচন্দ্রের উক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। কবি তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ১৩২৫ সনের ১২ই ভাদ্র ঢাকা হইতে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন;—

"ঢাকার সাহিত্য সম্মিলনে আমার নামে যে বাড়ীতে পত্র গিয়াছিল, তাহা অসময়ে,—সম্মিলন শেষে। আমি তখন ঢাকায়। অসুখ ছিল বলিয়া সম্মিলনে যাই নাই।"

কবির পত্র পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার পল্লী ভবনের ঠিকানায় সম্মিলন শেষে একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। কবির কথা শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর উল্লেখ না করিলে এই পত্রও প্রেরিত হইত কি না সন্দেহ। তারপর তাঁহার গৃহে—অর্থাৎ ঢাকায় গোবিন্দচন্দ্র যেখানে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেন—তথায়, গাড়ী পাঠাইবার কথা। কবির পত্রে সে বিষয়ের কোনই উল্লেখ নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন এবং সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। ১৩২৫ সনের কার্ত্তিক সংখ্যা "নব্যভারতে"র জনৈক লেখক কবির সঙ্গে ভদ্র মহাশয়ের কথোপকথনের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করা যায় কি? গোবিন্দচন্দ্র দস্তখত করিয়া নিমন্ত্রণ পত্র রাখিলে তাঁহার লিখিত ১২ই ভাদ্রের পত্রে সম্ভবতঃ সে কথা উল্লিখিত হইত।

কবির মৃত্যুর অল্পদিন পর ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন মহাশয়,—যিনি সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিলেন,—আমাদিগকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বলিয়া সম্পাদক বাবু সত্যেন্দ্র ভদ্র বলিয়াছেন।"

ইহাও সেই বলাবলির কথা এবং শোনা কথা! দেখা যায় যে, শ্রীযুক্ত কামিনী সেন মহাশয়ও সঠিক সংবাদ জানিতেন না। তিনিও নিমন্ত্রণ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার সম্বলিত, কবির স্বাক্ষর স্বচক্ষে দেখেন নাই! এ সকল কাহিনী আর কত লিখিব? তিনি যে অনাদৃত হইয়া গিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? তিনি জীবিতকালে নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে তুচ্ছ করিতে পারিবে না। তিনি স্বীয় প্রতিভা-

বলে সাহিত্যক্ষেত্রে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে ;—

"The poet in a golden clime was born,
With golden stars above ;
Dower'd with the hate of hate, the scorn of scorn,
The love of love."

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কবিপ্রসঙ্গে নানা কথা,—জীবনসন্ধ্যা,—তিরোধান।

কবি গোবিন্দদাসের কাহিনী প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কি লিখিতে কি লিখিলাম, জানি না। স্বভাব-কবির জীবনী রচনা করিতে বসিয়া কতবার যে অক্ষমতা অনুভব করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি সভয়ে অগ্রসর হইয়াছি। জানি না বিধাতার কি ইচ্ছা!

সুরম্য বিরাট সৌধ নির্ম্মাণকালে, স্থপতিগণের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে সামান্য 'মজুরের' আবশ্যক হয় না কি? বঙ্গভাষার বিরাট বিশাল সৌধ নির্ম্মাণ কার্য্যে যে সকল স্থপতিগণ ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের পদপার্শ্বে, নগণ্য 'মজুর' রূপে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তবে ইহা যে নিষ্ফল প্রয়াস, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এজন্য সভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছি।

অতঃপর আমরা গোবিন্দচন্দ্র প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কবি গোবিন্দদাস দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বর্ণ শ্যাম, দেহ কৃশকায়, মুখাকৃতি দীর্ঘ ছিল। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, হাস্যময় নয়ন, মূর্ত্তি প্রশান্ত ও সৌম্য ছিল। সে ললাটের দিকে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত

করিলে প্রতিভামণ্ডিত বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার নয়ন যুগলে চিন্তাশীলতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত।

তাঁহাব বেশভূষাব কোন দিনই পবিপাট্য ছিল না। তিনি সামান্য বসনভূষণ পরিধান কবিতেন। পল্লীগ্রামে তিনি সাধাবণ গৃহস্থের মত থাকিতেন। পরিধানে অৰ্দ্ধমলিন বস্ত্র—সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত। বিদেশে ভ্রমণের সময় একখানি পরিষ্কার বস্ত্র, একটি সার্ট ও চাদর এবং ফিতাবিহীন মোটা জুতা পরিধান কবিতেন। জীবনে কখনও তাঁহাকে 'মোজা' ব্যবহার করিতে দেখি নাই।

কেশ প্রসাধনে, আধুনিক কবিগণেব মত ইনি যত্নবান ছিলেন না। দীনবেশে থাকিতেই ভালবাসিতেন। চস্‌মার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গেলে বেড়া বান্ধিবার লোহাব তার এবং একখণ্ড সূতা দিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি বিলাসিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ বিলাসিতা, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যৌবনকাল হইতেই তিনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। আশ্চর্য্য এই যে, বিলাসোপকরণ সম্বলিত ভাওয়াল রাজগৃহের সঙ্গে আশৈশব বিজড়িত রহিয়াও তিনি বিলাসিতা শিক্ষা করেন নাই। একথা সত্য যে, তিনি দারিদ্র্য নিবন্ধন বিলাসিতার মোহে নিমগ্ন হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার সে পিপাসা ছিল কৈ? ময়মনসিংহস্থ বহু অর্থশালী লোকের গৃহে যাতায়াত করিয়াও তাঁহার সে শিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বিলাসিতায় একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

তিনি বলিতেন, বিলাসিতায় মানুষের নৈতিক চরিত্র অবনত,—জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও বিপন্ন এবং দেশের দৈন্যদশা চরমে উপস্থিত হয়। সর্ব্বোপরি, বিলাসিতায় কর্ম্মশক্তি বিনষ্ট করে—দাসত্বের শৃঙ্খল সুদৃঢ়

করে—সামাজিক জীবনে জড়তা আনয়ন করে ফলে, জাতীয় শক্তি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যাইতে থাকে।

১২৮৯ সনের ১লা ফাল্গুন ময়মনসিংহে শ্রীপঞ্চমী পূজা উপলক্ষে দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া তিনি কি লিখিয়াছিলেন দেখুন। ইহা প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কবি তখন পূর্ণ যুবক।

"দেবি!
কি কাজে তোমারে পূজি? বিফল কেবল!
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা— ফেলে দাও ভাঙ্গা বীণা,
ত্যজ বিলাসিনী বেশ—ভূষণ কমল!
একেই ভারত হায়, নিত্য অধঃপাতে যায়,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আবো হলাহল;
বসন্ত কুসুম থরে, তোমার আরতি করে,
আগমন পথে ঢেলে নব ফুলদল!
শ্যামা কোকিলার গানে, রাগিণী ললিত তানে,
তেমনি বিলাস বিষ ঢালিছে তরল!
নিপাতে বিলাস শিক্ষা তীব্র হলাহল!

দেবি!
এ বেশে এ দগ্ধরাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ।
শোকে দুঃখে হাহাকার, ফেলি নিত্য অশ্রুধার,
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত নহে প্রাণ মন।
যন্ত্রণার একশেষ,— এত কষ্ট এত ক্লেশ,
এখানে বিলাস বেশ? নাহি প্রয়োজন,
ভারত নয়ন জলে ভাসিছে এখন!

* * *

একান্ত ভারত যদি না পার ত্যজিতে,

* * *

বিলাসের বেশগুলি, যত আছে ফেল খুলি,
দূর কর পর্য্যুষিত কুসুমের থর ;
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা, দূর কর ভাঙ্গা বীণা,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার সহস্র বৎসর,
ত্যজ ও বিলাস বেশ—কুসুমের থর।"

ময়মনসিংহের স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় ১৩১৯ সনের কার্ত্তিক মাস হইতে "সৌরভ" নাম দিয়া একখানা সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মজুমদার মহাশয় দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র উক্ত পত্রিকার জন্য "সৌরভ" নামক সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন। ১৩২৪ সনে তাহা "সৌরভে" মুদ্রিত হয়। উক্ত কবিতা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, উহাতে জাতীয় ভাবোদ্দীপক যে সকল কথা ছিল, তাহার কতক কতক কেদারবাবুর নিকট আপত্তিজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি প্রথমে কবিতাটি পত্রস্থ করেন নাই।

উক্ত কবিতায়ও তিনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। আমাদের দেশ "সৌরভে" আকুল হইয়া গিয়াছে, বিদেশী এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, এমন কি বিদেশী আল্‌তা না হইলে, আমাদের চলে না—এই সকল বিলাসিতার উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় জিনিস ব্যবহার না করিলে দেশের দুঃখ অনিবার্য্য, ইহাই কবিতার মর্ম্মার্থ। তাহার এক স্থানে আছে ;—

"বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন!

কোথা ধর্ম্মে অনুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি,
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন!
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কারো গায় জোর,
পড়িলে বিপদে ঘোর কাঁপে কলেবর।
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবলই * * * রঙ্গ,
তাহারি ঔষধ খোঁজে তারি বিজ্ঞাপন!"

তিনি চিরদরিদ্র; তাঁহার আহারও তদনুরূপ ছিল। তিনি নিরা-
মিষাশী ছিলেন না সত্য, কিন্তু মাংস খাইতেন না। মাছটা খাইতে বকবৃন্দের
তিনি আজীবন মিতাচারী ছিলেন। ধূমপান শ্রেণীর লোকদিগের
অপর কোন মাদক দ্রব্যের প্রতি তাঁহার অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া
আহারের পর তাম্বুল চর্ব্বণ স্মার চক্ষে দেখিতেন না।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা পরদুঃখে তাঁহার কবি-হৃদয়
দুইটি শ্লেষাত্মক কবিতাও লিখিয়াছিলেন। এক পিত্তশূলী রোগীর যাতনা
মানব চরিত্র গঠিত। কবি গোবি বিচলিত হইয়াছিল যে, নিজব্যয়ে
এমন কথা আমরা বলি না। শালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,
পক্ষপাতী ছিলাম না। তাঁ স্বীকৃত হয় নাই।
প্রত্যেক মানব-জীবনেই লন সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়, বিদুরের মত
সকল দোষ বর্ণনা অপ্রা নুসারে তিনি পরোপকার করিতেন। তাঁহার
চলিয়াছেন। সহজে তাঁহার ক্ষুদের' সঙ্গে তুলনীয়। অন্ধ, আতুর, খঞ্জ,
স্থিতচিত্ততা তাঁহার সমগ্র যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।
কোথায়ও দীর্ঘদিন চাকরি একটি নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।
তিনি অনেকবার কর্ম্মচ্যু র্ব্বে দশটি মাত্র মুদ্রা জনৈক ব্যক্তির নিকট
প্রবণতার দরুণ অথবা স্বভা বং একখানি কাগজে লিখিয়া গিয়াছেন
দিক ছাড়া অন্য দিকে তেমন শত মুদ্রায় পরিণত হইলে, ইহার

বাল্যজীবনে তিনি অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন। কবি গোবিন্দ-দাস সামাজিক জীবনে কাহারও সঙ্গে অনাবশ্যকরূপে মিশিতেন না। সম্ভবতঃ, সমাজের উচ্চবংশসম্ভূত দলপতিগণ তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিতেন বলিয়া তিনি একটু স্বতন্ত্রভাবে চলিতেন। এজন্য কেহ কেহ বলিতেন, গোবিন্দদাস অসামাজিক,—লোকের সঙ্গে মিশিতে জানে না। কবি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্টতা ছিল বিপদে ধৈর্য্য। কবি গোবিন্দ-মত বিপদগ্রস্ত ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হওয়া বাঙ্গালার কোন ...ট নাই। বিপদে অবিচলিত থাকিবার একটা আশ্চর্য্য ...হার ভিতরে বর্ত্তমান ছিল। ...না। অনুপযুক্ত অথচ ধনবান লোককে ...স্তুতি করিতে পারেন নাই, অথবা ...ন না, নতুবা তাঁহার দৈন্যদশা অনেকদিন ... চরিত্রবলেই তিনি ভাওয়ালের সম্বন্ধ ...ব ভূম্যধিকারী ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর ...। একদিন যে হরচন্দ্র তাঁহাকে ...রচন্দ্রের নানা গুণে আকৃষ্ট ...ার নিকট অবস্থান করেন, ...হইয়া, গোবিন্দচন্দ্র সেরপুর ...আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, এমন ...তন না। ...জ্ঞান প্রখর ছিল। একদা ...রাজ সূর্য্যকান্তের পদত্যাগ

মজুমদার মহ... একখানা সুন্দর মাসি... মজুমদার মহাশয় দ্বারা অনুরুদ্ধ ... জন্য "সৌরভ" নামক সুদীর্ঘ কবিতা ... "সৌরভে" মুদ্রিত হয়। উক্ত ... বলিয়াছিলেন যে, উহাতে জাতীয় ... তাহার কতক কতক কেদারবাবুর নিকট ... হওয়ায় তিনি প্রথমে কবিতাটি পত্রস্থ করেন।

উক্ত কবিতায়ও তিনি বিলাসিতার বির... ছিলেন। আমাদের দেশ "সৌরভে" আকুল ... এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, এমন কি বিদেশী আল... চলে না—এই সকল বিলাসিতার উপকরণ পা... জিনিস ব্যবহার না করিলে দেশের দুঃখ অনি... মর্ম্মার্থ। তাহার এক স্থানে আছে ;—

"বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ মোহে অচেত...
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নী...
কোথা হতে হইয়াছে কোথায়...

একদা পল্লীসমাজ কর্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত হইয়াও কবি গোবিন্দচন্দ্র সমাজ-সদস্যগণের পদলেহন করিতে গ্লানিবোধ করিয়াছিলেন।

তিনি আত্মশ্লাঘা ঘৃণা করিতেন। ঢাকার বিখ্যাত সাহিত্যিক মহলে যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। নতুবা ১৩২৫ সনের সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি হয়ত যথাসময়ে নিমন্ত্রিত হইতেন। এ পন্থা অবলম্বন করিলে, তাঁহার বিজয়-গীতি সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে জীবন কালেই বিঘোষিত হইত।

গোবিন্দচন্দ্র নিরহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন। বালকদের এবং যুবকবৃন্দের সঙ্গে তিনি সমভাবে মিশিতেন। পল্লীগ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথনের ভঙ্গি দেখিয়া অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। তাহাদিগকে তিনি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না।

তিনি অতি দয়ালু পুরুষ ছিলেন। পরদুঃখে তাঁহার কবি-হৃদয় বিগলিত হইত। একদা স্বগ্রামবাসী এক পিত্তশূলী রোগীর যাতনা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর বিচলিত হইয়াছিল যে, নিজব্যয়ে তাহাকে ঢাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু রোগী, ভয়ে ঢাকা যাইতে স্বীকৃত হয় নাই।

গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়, বিদুরের মত করুণা-পরবশ ছিল। সাধ্যানুসারে তিনি পরোপকার করিতেন। তাঁহার মত দরিদ্রের দান 'বিদুরের ক্ষুদের' সঙ্গে তুলনীয়। অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি দেখিলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

তাঁহার দয়ার্দ্র-হৃদয়ের একটি নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিনি মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দশটি মাত্র মুদ্রা জনৈক ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং একখানি কাগজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আসল টাকা সুদসহ একশত মুদ্রায় পরিণত হইলে, ইহার

বাৎসরিক সুদ যেন অনাথ এবং দীন দুঃখীর সেবায় ব্যয় করা হয়। সেই কাগজে তাঁহার বংশধরদিগকে কঠোর দিব্য দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, যদি কেহ এই টাকা নষ্ট করে, কিম্বা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ব্যয় না করে, তবে সে অভিশপ্ত হইবে। ইহা দয়াপ্রবণ হৃদয়ের কীর্ত্তি সন্দেহ নাই।

গোবিন্দচন্দ্র তেজস্বী, নানা বিষয়ে নির্ভীক এবং সৎসাহসী পুরুষ হইলেও, তাঁহার একটা দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার বন্ধুবর্গকে অনেক সময় এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতে দেখা গিয়াছে। নৌকায় নদীপথে ভ্রমণ, তিনি ভয়ানক বিপজ্জনক মনে করিতেন। সম্ভবতঃ জীবনে দুইবার জলপথে বিপদগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল।

কবি গোবিন্দদাস, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথোপ-কথন করিতে বসিলে তাঁহাকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। তাঁহার কথা অত্যন্ত মধুর, এবং স্বভাবতঃ বিনয় ও সৌজন্যে মণ্ডিত ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি অভ্যর্থনার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন—কি যে করিবেন, স্থির করিতে পারিতেন না। কতদিন যে এই হৃদয়বান কবির গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বন্ধুত্বের আদর্শ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কতদিন যে প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, নিশীথে তাঁহার সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিয়াছি, এ জীবনে তাহা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব।

কতদিন সমুদ্রবৎ বিশাল পদ্মার তীরে তীরে সন্ধ্যাকালে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া উভয়ে কথোপকথনে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছি যে, কখন রাত্রি হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করি নাই।

তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্যের কথা লিখিতে গেলে চক্ষুর জল সম্বরণ করা

কঠিন। তিনি দরিদ্র হইয়াও তাঁহার বন্ধুবর্গকে আ-পরিতোষ আহাব করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। কবি-গৃহের চতুষ্পার্শে অনেকগুলি আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহাতে অতি সুমিষ্ট আম্র ফলিত। তিনি তাঁহার পল্লীগ্রামস্থ বন্ধুগণকে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে পবম আদরে তাহা ভোজন করাইতেন। দবিদ্র বলিয়া আয়োজনেব কোন ক্রটী করিতেন না। সে ব্যাপারে তাঁহাব কিঞ্চিৎ অর্থও ব্যয় হইত। অথচ তাঁহাব দৈনিক আহাবে কোনই আড়ম্বর ছিল না। প্রতিদিন দরিদ্রের মত শাকান্ন, এবং সামান্য উপকবণ, আহাবের জন্য আয়োজন করা হইত। মৎস্য কালে ভদ্রে। দুগ্ধ কদাচিৎ। উল্লিখিত আহার্য্য দ্বারা তিনি পবিবারবর্গসহ জীবন ধারণ করিতেন। আর, বুকেব শোণিত দিয়া বঙ্গভাষাকে সজ্জিত কবিতেন।

তাঁহার ক্রোধ সহজে উদ্রিক্ত হইত না—কিন্তু ক্রোধ জন্মিলে, তিনি আব সে মানুষ থাকিতেন না। মাত্র একবার আমরা তাঁহার ক্রোধ দেখিয়াছি।

গোবিন্দচন্দ্রের নির্ম্মল এবং পবিত্র বন্ধুবাৎসল্যে আমরা সৌভাগ্যবান, —তাঁহার বন্ধুভোজেও আমরা দুইবার উপস্থিত ছিলাম। গ্রন্থকারকে তিনি একখানি পত্রে একবার যে কয়টি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"স্থানীয় লোকের সহিত খুব সদ্ব্যবহার করিবেন। নিরহঙ্কারী থাকিবেন। সদয়ভাবে ব্যবসা চালাইবেন। কষ্ট দিয়া অর্থ গ্রহণ করিবেন না। সাধু চরিত্রের লোককে সকলেই পূজা করে। এরূপ ভাবে থাকিলে আপনি প্রচুর সম্মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। আপনি বন্ধু ব্যক্তি বলিয়া এ কথা কয়টা লিখিলাম। আমার এ প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।"

গোবিন্দচন্দ্র ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেক চিঠিপত্র, এবং অন্যান্য কোন বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে তিনি, "জয় জগদীশ্বর" কথাটি শিরোভাগে লিখিতেন। একমাত্র জগদীশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসে, তিনি বহু বিপদের ঝঞ্ঝা নত মস্তকে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

১৩১৯ সনের ২৫শে শ্রাবণ আমাদিগকে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"—আমার অসহায় পরিবার * * * অন্য কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া যাইতে পারি কি না তাহার জন্য * * * চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমার সমস্ত উদ্যম, অধ্যবসায় বিধাতা ব্যর্থ করিয়াছেন। কে জানে, তাঁহার কি ইচ্ছা! তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই বোধ হয় অবিশ্বাসীর এত বিড়ম্বনা!"

—অপ্রকাশিত পত্র।

১৩১১ সনে তিনি একটি কবিতা মুদ্রিত করেন। পরে তাহা 'ফ্রেমে' বাঁধাইয়া গৃহপ্রাচীরে বিলম্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত কবিতায় তাঁহার ধর্ম্মমত ও চরিত্রের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, ইহাই কবিতার উদ্দেশ্য ছিল। কবিতাটি এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

"শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু ভগবান্
দীনবন্ধু করুণা-নিধান
এ গৃহের গৃহী তিনি, এ বিশ্ব মন্দিরে যিনি,
সর্ব্বত্র করেন অধিষ্ঠান!
তাঁর পূজা তাঁর অর্চ্চনায়
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়,
রহ রত সেবক-সন্তান,

ধনে জ্ঞানে লক্ষ্মী সরস্বতী,
হেথা সদা করিবে বসতি,
লাভ হবে সৌভাগ্য-সম্মান !
অনাথ আতুর অন্ধজনে
কাঙ্গাল বৈষ্ণব ভিক্ষুগণে,
যথাশক্তি করিও প্রদান,
শোকে দুঃখে জ্বলে যার হিয়া,
সান্ত্বনা প্রবোধ তারে দিয়া,
তার শোক করিও নির্ব্বাণ !
যে কেহ আসিবে এই দ্বারে,
বিমুখ ক'র না কভু তারে
সবে স্নেহ রাখিও সমান,
সর্ব্বভূতে সম দয়া যার,
শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার,
কৃষ্ণ তার করেন কল্যাণ !
পরহিংসা পরনিন্দা পাপ,
ঘটে তাহে মহা পরিতাপ,
এ গৃহে পায় না যেন স্থান !
কাহারো ক'রনা অপকার,
বিপন্নেরে করিও উদ্ধার,
তাহে হন তুষ্ট ভগবান্ ।
সকলের দর্প অহঙ্কার,
দর্পহারী করেন সংহার,
গৌরবে হয়োনা হতজ্ঞান
বিনয়ে থাকিও অবনত,
নিজ নিন্দা শুনি শত শত,
ভুলেও দিও না তাহে কান

অধর্ম্মের বিনাশ নিশ্চয়,
ধর্ম্মের নিশ্চয় হয় জয়,
সদা ধর্ম্মে থেকো আস্থাবান্,
ঢেউসম পাপের উন্নতি,
পুণ্যের নাহিক অধোগতি,
চির দৃঢ় গিরি গরীয়ান্।
এই গৃহ—এই দেবালয়,
সতত পবিত্র যেন রয়,
পাতকে ক'রনা কভু ম্লান,
সৎ কথা সৎ আলাপনে
হ'রনাম কীর্ত্তনে শ্রবণে,
যে আসে, জুড়ায় যেন প্রাণ।"
১৬ই বৈশাখ ১৩১১ সন।

উপরোক্ত কবিতা প্রত্যেকের জীবনের আদর্শ হওয়া সঙ্গত। তাঁহার জীবন উপরোক্ত আদর্শে গঠিত ছিল বলিয়াই তিনি শত বিপদ—শত বাধা অনায়াসে জয় করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার নৈতিক চরিত্রের মেরুদণ্ড,—তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস। এপথ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হ'ন নাই।

এক্ষণে, কবি গোবিন্দদাসের জীবনে সাহিত্যিক সংশ্রবের কথা লিখিব। তাঁহার সঙ্গে বহু সাহিত্যিকের প্রণয় ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের পরম হিতৈষী বন্ধুগণের মধ্যে "নব্যভারত" সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় অন্যতম। যথাস্থানে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি।

তাঁহার অন্যতম সতীর্থ—কবি-বন্ধু অক্ষয়কুমার বড়াল সম্বন্ধে দাস-কবি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের হিত চেষ্টায় বড়াল-কবি বহুবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনেক ধনীর দ্বারে দ্বারে

ঘুরিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কথা উত্থাপিত হইলেই বলিতেন, "পশ্চিম বঙ্গে আমাব এমন অকপট সুহৃৎ আর কেহ আছে কি না জানি না।" আমরাও একবার কবি গোবিন্দ সমভিব্যাহারে বড়াল-কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সুমিষ্ট কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং সৌজন্যের পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। বড়াল-কবির মধ্যে অহঙ্কারের ছায়া দেখিতে পাই নাই।

একবার কবি অক্ষয় বড়াল, গোবিন্দচন্দ্রকে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছিলেন, "আমি কবিবর রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রথম দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু একটু গর্ব্বের গন্ধ পাইয়াছিলাম। যে গৃহে তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাহা বেশ পরিস্কৃত, পরিচ্ছন্ন, এবং সামান্যরূপে সজ্জিত ছিল।"

গোবিন্দদাস বাল্যাবধি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। নবীন সেনের কবিতা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। নবীনচন্দ্রের সরল অথচ ভাবব্যঞ্জক এবং তেজোগর্ভ ভাষা তাঁহাকে বড়ই আকৃষ্ট করিত।

কবিবর নবীন সেনকে, দাস-কবি এতদূব শ্রদ্ধা করিতেন যে, কলিকাতায় অবস্থান কালীন একদা পদব্রজে আলিপুর যাইয়া তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। নবীন সেন তখন আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। পরে, একদিন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের নিকট এই কথা উত্থাপিত হইলে তিনি দাস-কবিকে লইয়া নবীনচন্দ্রের বাসায় যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে একদা নির্দ্দিষ্ট দিনে কবি-বন্ধু অক্ষয়কুমার ও "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয়দ্বয়ের

সঙ্গে তিনি কবি নবীন সেনের কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাসেব প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অনেকক্ষণ কথোপকথন হইয়াছিল। দাস-কবি বলিতেন যে, নবীনচন্দ্র অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন, কিন্তু আত্মশ্লাঘা তাহাতেও আত্মসম্বরণ কবিতে পারে নাই।

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকাব মহাশয়ের সঙ্গে দাস-কবি কলিকাতাতেই পবিচিত হইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র, তখন "নবজীবন"এর সম্পাদক ছিলেন। ১২৯১ সনের শ্রাবণ মাস হইতে "নবজীবন" প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। গোবিন্দচন্দ্র তখন ময়মনসিংহে অবস্থান করিতেন। ১২৯২ সনের "দৈনিক" পত্রিকায় দ্বিতীয় বার্ষিক "নবজীবনে"র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখক শ্রেণীতে গোবিন্দচন্দ্রের নাম উল্লিখিত ছিল। বিজ্ঞাপনটির অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"নবজীবন।

নূতন মাসিক পত্র।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত।

* * *

বাঙ্গালার অধিকাংশ সুলেখকই নবজীবনের লেখক। গত বৎসর যাঁহারা নবজীবনে লিখিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম বৎসরের লেখকগণের নাম।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নবীনচন্দ্র সেন, বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, * * * বাবু ঈশানচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, * * * বাবু গোবিন্দ-চন্দ্র দাস, বাবু গোবিন্দমোহন রায়, বাবু রসিকলাল রায়, * * শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী।”

দাস-কবি ময়মনসিংহ হইতে সেরপুরে চলিয়া যাওয়ার পরেও “নব-জীবনে” কবিতা লিখিতেন। অক্ষয় সরকার, কবি গোবিন্দচন্দ্রকে ভালবাসিতেন ও তাঁহার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। দাস মহাশয় একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—“কদমতলায়, তাঁহার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম। ইঁহারা বড় লোক, হয়ত আমার মত গরীব দুঃখীর কথা এতদিনে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।”

সাহিত্যাচার্য্যের লিখিত গোবিন্দচন্দ্রের নিকট একখানি পত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পত্রখানি পাঠ করিলে কবির প্রতি অক্ষয় সরকার মহাশয়ের মনোভাব জানিতে পারা যায়।

“৪৩ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।
৩রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

গোবিন্দ বাবু,

আপনি এখন কোথা আছেন এবং কেমন আছেন তাহা জানি না; ভরসা করি—আপনি ভালই আছেন।

আপনার “মা-মরা-মেয়ে” পূর্ব্বেই প্রশংসা করিয়াছি, এখন হাতে হাতে করিতেছি। আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। তাহার পর ছেলে পিলের ব্যারাম লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলাম,—এখন অনেকটা ভাল আছি।

বঙ্গবাসী আফিস হইতে জন্মভূমি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। তাহাতে আপনি লেখেন [illegible] আমি অনুরোধ করিতেছি। লেখার

জন্য আপনি পারিশ্রমিক পাইবেন। প্রবন্ধ আমার কাছে অথবা বঙ্গবাসী আফিসে পাঠাইলেই চলিবে। নিজ মঙ্গল লিখিবেন।

আপনার মঙ্গলাকাঙ্খী

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।"

আচার্য্য অক্ষয় সরকারের অনুরোধ—কবি গোবিন্দচন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। "জন্মভূমি" পত্রিকায় তাঁহার দুই চারিটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় ছিল। বিহারীলাল, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া কবি গোবিন্দকে স্নেহ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা সেগুলি দেখিয়াছি। গোবিন্দচন্দ্রের মতে বিহারীলাল নিতান্ত অমায়িক প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন।

তাঁহার বেশভূষা—তাঁহার বাক্যালাপ—তাঁহার কবিতা নিতান্তই সহজসরল ছিল। বিহারীলাল প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে একবার লিখিয়াছিলেন ;—

"অন্যান্য আলাপের সঙ্গে তাঁহার "সাধের আসন" কবিতার কথা ও আলাপ হইয়াছিল। বিস্তারিত আমার স্মরণ নাই। তিনি বড় বিনয়ী ছিলেন। সাদাসিধা সাজগোছ—বামন পণ্ডিত মানুষ। খালি গায়—স্থূল দেহ, বেশ দেখাইয়াছে। মাথায় বুঝি টিকিও ছিল। তিনি সোণার বেণেদের পৌরোহিত্য করিতেন।"

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ও গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন।

কলিকাতা আসিয়া, একদা দাস-কবি ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। ৺রাজকৃষ্ণ রায়, "বীণা থিয়েটার" নামক একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তাঁহার অনুরোধে দাস-কবি একদিন "বীণা

থিয়েটারে” অভিনয় দর্শন করিতে গমন করেন। সঙ্গে “নব্যভারত” সম্পাদকও ছিলেন। রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের সম্পর্কে নৈতিক চরিত্র অবনত হয়, রাজকৃষ্ণ রায়ের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এজন্য অভিনেত্রীর পরিবর্ত্তে তিনি, বালকগণ দ্বারা অভিনয় সম্পন্ন করাইতেন। অভিনেত্রীর অভাবে বাজকৃষ্ণেব “বীণা থিয়েটার” কোন অংশে নিন্দনীয় ছিল না। প্রত্যেক বিষয় অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনীত হইত। বাজকৃষ্ণ রায়, নিজেও সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। তথাপি, তাঁহাব রঙ্গালয়ে দর্শক-মণ্ডলীর সমাগম নিতান্ত বিরল ছিল।

দাস মহাশয় “বীণা” রঙ্গালয়ে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন যে, দর্শকেব অভাবে সমগ্র অভিনয় গৃহ কেমন এক বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহাবা দর্শনী দিয়া ভিতবে প্রবেশ কবিয়াছিলেন।

একদা “নব্যভারত” সম্পাদক সহ তিনি “শকুন্তলাতত্ত্ব” প্রণেতা চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। দাস-কবির মতে চন্দ্রনাথ বসু শিষ্ট, শান্ত, সংযত এবং স্থির ধীব প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার আলাপ ব্যবহারে দাস-কবি নিরতিশয় প্রীতিলাভ কবিয়াছিলেন। দাস-কবির রচিত “বরষার বিল” নামক কবিতা পাঠ করিয়া চন্দ্রনাথ বসু মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কবি গোবিন্দদাস আমাদিগকে এক সময় আক্ষেপ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, “বড়লোকের নিকট যাইতে আমি সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। বঙ্কিমবাবুকে দেখিবার বড় সাধ ছিল; কিন্তু তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে দেখিতে সাহস হয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি সাধারণ লোকের সহিত প্রায়ই আলাপ করিতেন না—ঘৃণা করিতেন।”

বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি গোবিন্দদাস অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। শুনিয়াছি, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া আর কোন উপন্যাসই জীবনে পাঠ

করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দদাস কবিতায় তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার অতি অশুভ মুহূর্ত্তে দেখা হয়। ঘোষ মহাশয়, গোবিন্দদাসের প্রতি এরূপ বীত-শ্রদ্ধ ছিলেন যে, একদা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস নামক জনৈক কবিতা লেখকের "মণি ও মুক্তা" পুস্তকে, গোবিন্দচন্দ্রের প্রশংসাপত্র দেখিয়া তিনি তাহা "বান্ধবে" সমালোচনা করেন নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে আমাদিগকে গোবিন্দচন্দ্র লিখিয়া-ছিলেন—

"কালীপ্রসন্ন ঘোষের আলাপে গর্ব্বের উগ্রতা অনুভূত হইত। ভাষার শত আচ্ছাদনেও তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিত না।"

পূজ্যপাদ পণ্ডিত, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র, জয়দেবপুর হইতে ১৩১৯ সনে আমাদিগকে লিখিয়া-ছিলেন—

"হরচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। হরচন্দ্রবাবুর সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি ও আলাপ করিয়াছি। বিদ্যাসাগরের কথা কেহ লিখিয়া শেষ করিতে পারে না, আমি কি লিখিব?"

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন, দাস-কবিকে শ্রদ্ধা করিতেন। "নব্য-ভারতে" গোবিন্দচন্দ্রের "উলঙ্গ রমণী" কবিতা প্রকাশিত হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবিবর দেবেন্দ্রনাথ, জৌনপুর হইতে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আপনার প্রতি ও আপনার কবিতার প্রতি আমি সমধিক শ্রদ্ধাপন্ন হইয়াছি।"

"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে "বঙ্গভাষার লেখক" নামধেয় একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে গোবিন্দচন্দ্রের জীবনী মুদ্রিত হয় নাই। তৎসম্পর্কে ১৩২৩ সনের ১১ই চৈত্র দাস-কবি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে যখন জীবিত গ্রন্থকারদের জীবনী প্রকাশিত হয়, তখন আমার নিকট হারাণ রক্ষিত ও অন্যান্য ব্যক্তি আমার জীবন-কথা জানিতে চাহেন। আমি লিখিয়াছিলাম "মগের মুলুকে"র কাহিনীশুদ্ধ যদি লিখিতে পার তবে দিতে পারি। * * * আপনি দেখিবেন "বঙ্গবাসী"র সে পুস্তকে আমার জীবনী নাই।"

"খোকার দপ্তর", "মোহন-ভোগ" এবং "বাসন্তী" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ময়মনসিংহ নিবাসী ৺মনোমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে গোবিন্দ-চন্দ্রের গভীর প্রণয় ছিল। একবার উক্ত মনোমোহন সেন মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"গোবিন্দদাসের কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমার মদ খাওয়ার ফল হয়—যেন নেশায় বিভোর হইয়া পড়ি।"

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে একবার কথোপকথন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একথা তাঁহার মুখেই শ্রবণ করিয়াছি। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল দাস-কবির কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন।

একদা, ১৩২০ সনের কার্ত্তিক মাসের প্রভাতে, আমরা কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়কে দেখিতে তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলাম। আমরা তখন দাস-কবির জীবন-কথা রচনায় ব্যাপৃত। কথাপ্রসঙ্গে বড়াল-কবি বলিয়াছিলেন যে, যদি গোবিন্দদাসের জীবন-কথায় কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির উল্লেখ না করিয়া, তাঁহার কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়, তবেই রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আমাদিগকে

বলিয়াছিলেন যে, গোবিন্দদাসের "সারদাসুন্দরী" শীর্ষক মনোরম করুণ কবিতাটি Artএর অভাবে অনিন্দ্যনীয় হইতে পারে নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, চিতার উপর জীবনসঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীকে শয়ন করাইয়া "আজ, কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?" বলিয়া একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করা অস্বাভাবিক এবং এই দোষেই কবিতাটির Art মারা গেছে।

ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালার একজন খাঁটি স্বভাব-কবির এ কবিতা প্রকৃতই অঙ্গহীন কি না, সমালোচক তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু ইহা যে শোকসন্তপ্ত বিশ্ব-মানব-হৃদয়ের মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন, তাহা কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, গোবিন্দদাসের শোক-সঙ্গীত পর্য্যায়ের কবিতাবলীর মধ্যে ইহা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। বঙ্গসাহিত্যেও "সারদাসুন্দরী"র মত চমৎকার কবিতা আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ইহার ভাষা ও ভাব অত্যন্ত করুণ এবং প্রাণস্পর্শী—মানবহৃদয়কে আলোড়িত করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা। কবিতাটি পাঠ করিতে বসিলে চক্ষুর জল সম্বরণ করা কঠিন।

কবির পল্লীগ্রামে একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গে নৌকা-পথে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। বিক্রমপুরের বর্ষা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বর্ষাকালে বিক্রমপুরের মাঠগুলি জলমগ্ন হইয়া যায়, কেবল বাড়ীগুলি দ্বীপের মত জাগিয়া থাকে। বর্ষাকালে নৌকা ভিন্ন স্থানান্তরে যাতায়াত অসম্ভব।

কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে, আমরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় নৌকারোহণে জলপূর্ণ মাঠের উপর ভ্রমণ করিতাম। তিনি ইহা বড় ভালবাসিতেন। একদিন কবি স্বয়ং নৌকা বাহিতেছিলেন,—আমরা বসিয়াছিলাম। আমরা নৌকা বাহিতে জানিতাম না—এখনও জানি না। নৌকা

বাহিবার জন্য আমাদের লোক ছিল, তাহাকে তিনি লইলেন না—নিজেই নৌকা বাহিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আমাদের তরণী নিস্তব্ধ শস্যক্ষেত্রেব উপর দিয়া চলিয়াছিল। বর্ষাব মৃদু মৃদু পবনহিল্লোলে ধান্য-ক্ষেত্রে সবুজ লহরী উঠিয়াছিল। তখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়। দূরে, পশ্চিম দিকে—দিগ্বলয়ের প্রায় কাছাকাছি তরুপুঞ্জশিরে ববিবশ্মির শেষ বক্তচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল। আকাশের গায় ছিন্ন ভিন্ন মেঘ-পুঞ্জ, অস্তমিতপ্রায় তপনের বর্ণাভায় রঞ্জিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে আকার পরিবর্ত্তন করিতেছিল। আমরা এতক্ষণ নানা কথায় নিবিষ্ট ছিলাম। অকস্মাৎ কবি বলিয়া উঠিলেন,—"দেখুন, দেখুন, কি চমৎকার দৃশ্য! একবাব আকাশেব দিকে দেখুন!! আমার কি মনে হয় জানেন? আমার যেন বোধ হয় একজন চিত্রকর বসিয়া বসিয়া আকাশের গায় ছবি আঁকিতেছে এবং পছন্দ না হওয়ার দরুণ তাহা মুছিয়া ফেলিতেছে, আবার আঁকিতেছে। কেমন, ঠিক নয় কি?"

শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি অপূর্ব্ব দৃশ্য! নানা আকারের শ্বেত, রক্ত ও ধূম্র বর্ণের মেঘমালা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে! অস্তমান রবির বিদায় মুহূর্ত্তে দিক্‌বধূগণ যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! সূর্য্যাস্তের শেষ স্বর্ণরশ্মি যেন জলদাবলীকে অন্তিম চুম্বন করিয়া যাইতেছে!

কবির দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহার মুখখানি হাস্যোজ্জ্বল এবং ভক্তিতে গদগদ। তিনি যেন এক প্রকার ভাবাবিষ্ট হইয়া আছেন। * * *

সেদিনের দৃশ্য আজিও যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ ভাসিতেছে।

আর একবার ১৩২৪ সনের বর্ষাকালে গ্রন্থকারের পিতৃদেব, কবি গোবিন্দচন্দ্র ও গ্রন্থকার সহ নৌকাপথে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন। কোন একটি বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে কবি গোবিন্দচন্দ্রকে আমাদের

সঙ্গে লইয়াছিলাম। তাঁহাবা পবস্পর নানাবিধ কথায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে।

নৌকাখানি এক বিলেব পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়াছিল। চাবিদিকে কয়েকখানি হরিৎবর্ণের বৃক্ষ লতা সমন্বিত গ্রাম দেখা যাইতেছিল। সন্নিহিত শস্যক্ষেত্রগুলিও আমাদেব চক্ষুর সম্মুখে একখানি স্নিগ্ধ দৃশ্যপট উন্মুক্ত করিয়াছিল। উভয়ের কথোপকথন স্থগিত হইলে কবি, একবাব আমাদিগকে বলিলেন,—"ঐ যে সবুজ বঙ্গেব গাছপালা ঘেরা গ্রামখানি দেখিতেছেন, এখান হইতে উহা বডই মনোবম—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। নয় কি? কিন্তু উহাব ভিতবে কি আগুন! কি আগুন।"

এখনও সেই স্বর কানে বাজিতেছে। সামান্য সামান্য বিষয় অবলম্বনে কবি গোবিন্দচন্দ্রের ভাবুকতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

কবি গোবিন্দচন্দ্রেব জীবনের শেষ কার্য্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রেব বিবাহ। ১৩২৪ সনের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ একার্য্য নিষ্পন্ন কবিয়াছিলেন। কলিকাতায় বিবাহ হইয়াছিল। আমাদিগকে লিখিলেন, "যদি আপনার স্ত্রীর অসুখ সাবিয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আসিলে আমার চির দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।" কিন্তু তাঁহার সেই আগ্রহপূর্ণ অনুবোধ, আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই।

কবি গোবিন্দচন্দ্র পণ দিয়া উচ্চবংশের বধূ ক্রয় করিয়া পুত্রেব বিবাহ দিয়াছিলেন।

তিনি বৈজ্ঞিকতত্ত্বের হিসাবে অর্থব্যয় করিয়া এ কাজ করিয়াছিলেন। উচ্চবংশের কন্যা দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশ সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। কতবার আমাদিগকে সে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ বিবাহের অপক্ষপাতী ছিলাম। তাঁহার বংশে আর দ্বিতীয় গোবিন্দদাস জন্মিবে কি না সন্দেহ!

পুত্রের বিবাহ দিয়া দরিদ্র কবি কপর্দ্দকহীন হইয়াছিলেন। বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার কবি-পত্নীর মাতামহী বহন করেন,—কতক অর্থ ঋণ কবিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই মতিভ্রম কেন হয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কারণ, তিনি যে আশা করিয়া পুত্রেব বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হয় নাই। তাঁহাব জীবিত অবস্থাতেই কুটুম্বগণ তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কবেন নাই। মৃত্যুর পর কেহই আসিয়া দরিদ্র কবিব অসহায় পুত্রগণেব অনুসন্ধানও করেন নাই। হায়! কবির দূরদর্শিতা এখানে চূর্ণ হইয়া গেল। ইহা গোবিন্দচন্দ্রের জীবনেব একটা প্রকাণ্ড নিষ্ফলতা।

গোবিন্দচন্দ্র যেন আসন্ন-মৃত্যুর আভাষ পাইয়াছিলেন। প্রকৃতই তাঁহার দুঃখময় জীবনের শেষ অধ্যায় ঘনাইয়া আসিল!

কবি গোবিন্দদাস ভাওয়ালবাজের জমিদারীব অন্তর্ভুক্ত—ঢাকা নগরীব সন্নিহিত কুর্মীতলা নামক স্থানে, কিঞ্চিৎ ভূমি সুলভে 'পত্তনী' গ্রহণ কবেন। এতদ্ব্যতীত, নির্ব্বাসিত হইবার পর তাঁহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি - যাহা বাজসরকারে 'বাজেয়াপ্ত' হইয়াছিল—তাহা, তিনি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু, যথাসময়ে উল্লিখিত ভূসম্পত্তির রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, ১৩২৫ সনে রাজসরকার হইতে কবির নামে বাকী খাজানার 'নালিস' করা হয়। রাজস্ব প্রদান করিতে না পারিলে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ভূসম্পত্তি 'নিলামে' বিক্রীত হইবার দিন ধার্য্য হইয়াছিল।

ভূমি সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি তখন উৎকণ্ঠিত। এজন্য জমিদারের রাজস্ব পরিশোধ করিবার প্রতিকারোদ্দেশ্যে ১৩২৫ সনের শ্রাবণ মাসে কবি তাঁহার পল্লীগ্রাম হইতে ঢাকা যাত্রা করিলেন।

কুক্ষণে গোবিন্দদাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেবারে কোন অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। পল্লীগৃহ পরিত্যাগ করিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া 'দেনা-পাওনা'র হিসাব পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আসন্ন-মৃত্যুর কথাও কবি, তাঁহার পত্নীকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর দুই বৎসর পর তাঁহার স্ত্রীর মুখে আমরা ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম।

কবি ঢাকা আসিলেন। যোত্র রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া তিনি তথা হইতে জয়দেবপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ এবং মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুশ্চিন্তা—অসময়ে অনুপযুক্ত আহার—সময় সময় অৰ্দ্ধাশন ও অনশনে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত কবি ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতে লাগিলেন।

১৩২৫ সনের ২৮শে শ্রাবণ, কবি গোবিন্দদাস গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আর্থিক সাহায্যের আশায় গমন করেন। কিন্তু অভিমানী গোবিন্দচন্দ্র জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারী-প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রা অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসেন। কি জানি কেন, তাঁহার মনোভঙ্গ হইয়াছিল, সে কথা কে বলিবে?

গৌরীপুরে আসিয়া গোবিন্দচন্দ্র কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করেন। তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথম তথায় দেখিতে পাইয়া স্থানীয় জনসাধারণ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কবি যতীন্দ্রের গৃহে দাস-কবিকে লইয়া সাহিত্যিক 'বৈঠক' বসিত। কবি গোবিন্দচন্দ্রের সংস্পর্শে যতীন্দ্রপ্রসাদের গৃহে আনন্দ প্রস্রবণ বহিয়া গিয়াছিল।

অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে প্রত্যেক জমিদার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। তথাকার দুই একজন জমিদার ব্যতীত সকলেই কবিকে যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

অতঃপর গৌরীপুর পরিত্যাগ করিয়া ৩২শে শ্রাবণ কবি, মুক্তাগাছা গমন করেন। তথা হইতে আমাদিগকে লিখিলেন—

"আপনার ৩০শে জুলাইর পত্রখানা পাইয়াও এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন।

ভাওয়ালের স্রোত্ জমির খাজানা দিতে পারি নাই বলিয়া রাজসরকার হইতে নালিশ হইয়াছিল। * * * ইহার চিন্তায় ভাবনায় দিন রাত্রি অস্থির আছি। মুক্তাগাছায় যাহা কিছু সাহায্য পাই তাহার জন্য গতকল্য এখানে আসিয়াছি। দুর্ব্বৎসর বলিয়া ম্যানেজার এখন টাকা দিতে পারিবেন না বলিতেছেন, কিন্তু রাজা হুকুম দিয়াছিলেন। এখন দেখি কি হয়। ম্যানেজার আবার বলিতেছেন ৫।৭ দিন বিলম্ব করিলে কিছু দিতে পারিব কি না তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। অথচ এই টাকা না পাইলে নিশ্চয় নিলাম হইয়া যাইবে। কি উপায় করিব ভাবিয়া পাই না। * * * * এখান হইতে বোধ হয় ৭।৮ই ভাদ্র ঢাকায় যাইব।"

কার্য্যোপলক্ষে কবি গোবিন্দচন্দ্রকে প্রায়ই ঢাকায় যাতায়াত করিতে হইত। গ্রন্থ লেখকেব তথায় অবস্থান কালীন কবি তাহার নিকট আহার ও শয়ন করিতেন। ১৩১৪ সন পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাবপর আমরা ঢাকা পরিত্যাগ কবিলে তাঁহার তথায় অবস্থানের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছিল।

ঢাকার উপকণ্ঠ নারান্দিয়াতে কবির স্ব-গ্রামবাসী স্বর্গগত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের একখানা বাড়ী আছে। তাহা প্রস্তুত হওয়ার পর কবির মৃত্যু পর্য্যন্ত অপর একজন ভদ্রলোকের নিকট একাংশ ভাড়া দেওয়া ছিল। উক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, হোমিও রিসার্চ লেবরেটরীর অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

কবি ঢাকায় গেলে সেই বাড়ীতে—অপরাংশে অবস্থান করিতেন। কিন্তু তাঁহার আহারের ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। বাসা হইতে 'হোটেল' কিছু দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া, অথচ অর্থাভাবেও তিনি অনেক সময় অর্দ্ধাশনে থাকিতেন—কখনো কখনো অন্নাহার অদৃষ্টে ঘটিত না।

গৌরীপুর-ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা প্রত্যাগমন করিয়া, ১৩২৫ সনের ১২ই ভাদ্র কবি আমাদিগকে লিখিলেন ;—

"আমি গতকল্য ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিয়াছি। ময়মনসিংহে এবার অতি সামান্য টাকা পাইয়াছি। কি উপায় করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। পূজার সময় কলিকাতায় গিয়া কাহারও সাক্ষাৎ পাইব না। সুতরাং এ সময় যাই কি না ঠিক নাই। গেলে, পূর্ব্বে আপনাকে লিখিয়া জানাইব। অনেক দিন যাবৎ আপনাকে দেখিনা। আমারও আপনাকে দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। * * * কত দিন যাবৎ বাড়ীর পত্র পাইতেছি না। আজ বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। * * *

রাজস্ব পরিশোধের চিন্তায় কবি তখন হতাশ হইয়াছেন। আবশ্যকীয় অর্থ-সংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা করিতে না পারিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ময়মনসিংহ হইতে যে কয়টি মুদ্রা পাইয়াছিলেন, তাহা যক্ষের ধনের মত রক্ষা করিতেছিলেন। ভাওয়ালের সম্পত্তি যাহাতে হস্তান্তরিত না হয় সে চিন্তাই তখন প্রবল। সুতরাং স্বাস্থ্যের দিকে আর দৃষ্টি করিলেন না। আহার করিতে অর্থের প্রয়োজন, এজন্য কভু অনশনে, কভু অর্দ্ধাশনে এবং বহুদিন চিপিটক্ ভক্ষণে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ফলে, তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইলেন।

এই অবস্থায় এক প্রকার নিঃসঙ্গ ভাবে ঢাকার একপ্রান্তে স্বজন-বিরহিত কবি পলে পলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। প্রবল দুশ্চিন্তা—অসহায় সন্তানগণের জন্য ভাবনা—তদুপরি রোগ যন্ত্রণা এবং অনশন, স্বভাব কবিকে মরণের পথে টানিয়া লইতে লাগিল। ভাবিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, প্রাণ বিদীর্ণ হয় যে, রোগগ্রস্ত কবি গোবিন্দ-চন্দ্রকে প্রায় প্রতিদিন বিচারালয়ে যাওয়া আসা করিতে হইত। নিয়তির কি নিদারুণ বিচার!

প্রকৃতি অত্যাচার সহিলেন না। আর কতই বা সহিবেন? দেখিতে দেখিতে ১৩২৫ সনের আশ্বিন মাস আসিয়া পড়িল। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু অধিপতি এই মহা প্রাণটিকে লইবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে জানিত যে, তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে-ছেন—মহাকালের করাল আহ্বানে তাঁহাকে ত্বরায় ধরাধাম পরি-ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে!

ভীষণ আশ্বিন মাস তাহার নিয়মিত গতিতে চলিতে লাগিল। মহাকালের গতিরোধ করিবে কাহার সাধ্য? স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল। মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বে কবি আমাদিগকে যে পত্রখানা লিখিলেন তাহা পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

কবির শেষ পত্র।

"জয় জগদীশ্বর।

৯ই আশ্বিন ১৩২৫
৪৭ নং সা সাহেব লেন,
নারিন্দা, ঢাকা।

প্রিয় * * *

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানা পাইয়া নিতান্ত সুখী হইয়াছি। আমার অবস্থার কথা কি লিখিব? আজিও বাড়ী যাইতে পারি নাই, কারণ

১লা অক্টোবর নিলামের তারিখ। ঐ তারিখের পরে ছাড়া আব যাইবার উপায় নাই। জগদীশ্বর রক্ষা করেন কি না দেখিব। বড় ছেলেটা পূর্ব্বেই পড়া ছাড়িয়াছে; বরুণকেও খরচের অভাবে ঢাকায় রাখিয়া পড়াইতে পারিতেছি না। গ্রামের স্কুলেও ভর্ত্তি করে না। এই ত অবস্থা!

* * * *

আমি হয় ত পূজার সময় বাড়ী যাইব। আজ ৬।৭ দিন যাবৎ জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। আজও ভাত খাই নাই; এই অবস্থায় কাছারীতে ঘুরি। বাড়ী গিয়া আপনার নিকট যাওয়ার চেষ্টা করিব। আমারও একবার কলিকাতা যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক। * * * আপনি সপরিবারে কেমন আছেন জানাইবেন। আমার শরীর এবার বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা বিদেশে থাকিয়া অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ডান কাঁধে বাতে ধরিয়াছে। পাছের দিকে হাত ফিরাইতে ঘুরাইতে পারি না। বিদেশে থাকায় কোনও ঔষধও ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। ইতি

আপনার

গোবিন্দ*

কবি যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখন ১৩২৫ সনের "সাহিত্য সম্মিলনের" হিসাব নিকাশের জন্য ১২ই আশ্বিন রবিবার ঢাকার "উকীল লাইব্রেরী" গৃহে অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। সদস্যবৃন্দের মহানুভবতায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে "গোবিন্দচন্দ্র সাহায্য ভাণ্ডার" নামে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করিবার প্রস্তাব উক্ত অধিবেশনে গৃহীত হয়। সেই "সাহায্য ভাণ্ডারের" উদ্দেশ্য, কবি গোবিন্দচন্দ্রের ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার ভরণপোষণের নিমিত্ত ভবিষ্যতে সাহায্য করা।

সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কবি গোবিন্দচন্দ্রের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ৭০০৲ টাকা প্রদান করা ধার্য্য হয়। কবি তখন ৭০০৲ টাকার জন্যই ভগ্ন হৃদয়ে বিধাতার দিকে চাহিয়াছিলেন। উপরোক্ত পত্রেও তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "জগদীশ্বর রক্ষা করেন কি না দেখিব।"

প্রকৃতই জগদীশ্বর কৃপা করিলেন। ১৩ই আশ্বিন সোমবার মহা-প্রস্থানের দিন, ঢাকার সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল মহাশয় প্রমুখ কবির কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। "সাহিত্য সম্মিলন" হইতে তাঁহাকে যে ৭০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিয়া মরণোন্মুখ কবি আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন।

পূর্ব্বোক্ত ৭০০৲ টাকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনী সেন মহাশয় আমাদিগকে ১৯১৮ সনের ২১শে নভেম্বর লিখিয়াছিলেন—

"ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনের তহবিলের উদ্বৃত্ত ৭০০৲ টাকা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তাঁহাকে দেওয়া হয়। ঐ টাকা দিয়া বাকী খাজানার ডিক্রী ও অন্যান্য দেনা শোধ হইবে আশা করা যায়। কতক ডিক্রী শোধ হইয়াছে।"

কবি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে অনুমান হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুলিত হইয়াছিল।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবি তাঁহার আত্মীয়-পরিজনের দেখা পাইলেন না। সেই প্রাণবিনাশক রোগে জর্জ্জরিত কবি একটু পথ্য—একটু শুশ্রূষাও পাইলেন না। আমরা শুনিয়াছি তাঁহার রীতিমত চিকিৎসাও হয় নাই। নিকটস্থ জনৈক ডাক্তার দয়া করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া

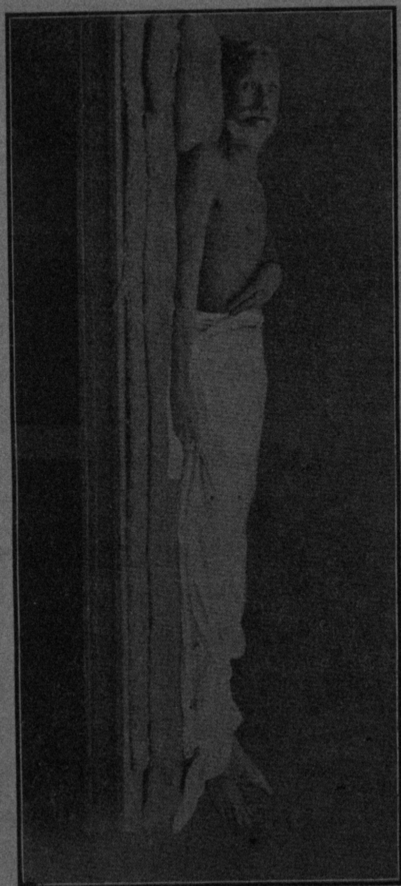
একটু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এইমাত্র। স্বভাব-কবি গোবিন্দ-চন্দ্রের অন্তিম অবস্থা কি শোচনীয়—কি নিদারুণ!

১৩২৫ সনের ১৩ই আশ্বিন প্রভাত হইল। সেদিন কবি গোবিন্দচন্দ্র মরজগত হইতে চিব বিদায় গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর দিন সোমবার—কৃষ্ণা একাদশী তিথি ছিল। সারাটা দিন চলিয়া গেল। দিবসে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয় নাই যে, তিনি পৃথিবী হইতে অন্তিম বিদায় গ্রহণ কবিতেছেন!

সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—গভীর অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আবৃত হইল। ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠ নারান্দিয়ার জন কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। পূর্ব্ব কথিত বাড়ীর একটি কক্ষে মবণোন্মুখ কবি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাই কবির শেষ যুদ্ধ। গৃহ-কোণে একটি প্রদীপ তৈলাভাবে মিটি মিটি কবিয়া জ্বলিতেছিল। কবির জীবন-প্রদীপ তখন নির্ব্বাণোন্মুখ। আর কবির শিয়বে ও পদপ্রান্তে তাঁহার দুইটি অসহায় পুত্র থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রালস নয়নে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। বাহিরে ঘনান্ধকার—প্রকৃতি স্তম্ভিত—যেন কবির অন্তিম মুহূর্ত্তে কালিমময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। সেই ভীষণ বজনীতে, সেই অসহায় অবস্থায় মুমূর্ষু কবির পুত্র দুইটিকে সান্ত্বনা দান করিতে নিকটে কেহ উপস্থিত ছিল না।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। অমরাবতী হইতে দেবকন্যাগণ বিজয়মাল্য হস্তে স্বর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবী বীণাপাণিব সারস্বত কুঞ্জে সারস্বত কবির জন্য একখানি সুবৃহৎ আসন সুসজ্জিত হইতে লাগিল।

মৃত্যু অধিপতি ইঙ্গিত করিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্রের অমর আত্মা শেষ রাত্রি ৫টা ১৫ মিনিটের সময় পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিলেন।



কবি গোবিন্দ দাস——দেহান্তে।

("নব্যভারত" সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়ার সৌজন্যে)

স্বর্গের তোরণ উন্মুক্ত হইল। দেববালাগণ বরণ করিয়া কবি গোবিন্দ-চন্দ্রকে অমরাবতীর বাণীকুঞ্জে গ্রহণ করিলেন। অনাদৃত, উপেক্ষিত, নিবন্ন স্বভাব-কবি জগতের সকল জ্বালা হইতে বিমুক্ত হইলেন।

এই শোকাবহ কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আর আমাদের লিখিবার সাধ্য নাই।

কবির মৃত্যুর সময় তাঁহার দুইটি পুত্র উপস্থিত ছিল। কিন্তু কবি-পত্নী তাঁহার স্বামীর শেষ দেখা দেখিতে পাইলেন না। মৃত্যুর দিন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে গ্রামে এখন নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে কি না। অনুমান হয় যে, তাঁহার বাড়ী যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল।

যাহাদের আলয়ে তিনি অন্তিম নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শুনা যায় যে কেহই, তাঁহার প্রতি তাদৃশ যত্ন করেন নাই।

রজনীর শেষভাগে, পবিত্র ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কবির পবিত্র আত্মা অমর-ধামে চলিয়া গেলেন। সাহায্যকারীর অভাবে তাহার পরদিন সূর্য্যো-দয়ের পর স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের পার্থিব দেহ সৎকার করিবার বন্দোবস্ত করা হইল।

ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানে তাঁহার দেহ চিতাভস্মে মিশিয়া গিয়াছে। সে সময় ঢাকা সেবাশ্রম হইতে সেবকগণ আসিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। কবির শ্মশান বন্ধুগণ সংখ্যায় মাত্র সাত জন ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার দুইটি পুত্র, জনৈক আত্মীয়, দুইজন ঢাকা সেবাশ্রমের সেবক এবং অপরাপর দুইজন ভদ্রসন্তান মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, গভীর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মৃত কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ, কোন কবি, কি লেখক, কি সাহিত্যিক তাঁহার শ্মশানে

উপস্থিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। দেশবাসিগণের নিকট তিনি পূর্ব্বাপর যে ব্যবহার পাইয়া গিয়াছেন, শেষ দশায়ও দেশ-বাসিগণ তাঁহার প্রতি সেই ব্যবহারের কিঞ্চিৎ তারতম্য করেন নাই। ঢাকায় বহুতর সাহিত্যসেবীর বাস, কিন্তু এই আদরণীয় মৃত কবির প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা গভীর কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। কবির প্রতি তাঁহার স্বগ্রামবাসী জনৈক সাহিত্যিকের উপেক্ষা আরো মর্ম্মপীড়ক।

তাঁহার তিরোধানের পর ঢাকা নগরীতে যদিও শোকসভার অধি-বেশন হইয়াছিল, তথাপি লোকে ভুলিতে পারে নাই যে, পূর্ব্ববঙ্গের কবি গোবিন্দচন্দ্র, ঢাকাতেই উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৩২৫ সনের সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, ঢাকার সাহিত্যিকবর্গের একটা বিরাট কলঙ্ক। এক্ষণে, শত বাক্য বিন্যাসেও আর সে কলঙ্ক কালিমা মুছিবে না।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের জন্মস্থান পূর্ব্ববঙ্গ হইলেও তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমগ্র বঙ্গদেশের কবি। ১৩১৮ সনের ১৯শে পৌষ, কবি গোবিন্দ আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "পশ্চিম বাঙ্গালার লোকদের, আমাদের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ আছে।" কথাটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তাহা নহে। তথাপি পশ্চিম বঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্রের বহু গুণ-মুগ্ধ বান্ধব আছেন—তাঁহাকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করেন—এমন গুণগ্রাহী লোকও পশ্চিম বঙ্গে বিরল নহে।

বঙ্গদেশে কবি গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব।

তাঁহার তিরোধানে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পত্রিকা "ঢাকা প্রকাশ" ১১শে আশ্বিন লিখিলেন;—

"আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় আর ইহজগতে নাই। * * * গোবিন্দচন্দ্র মাহেন্দ্রক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গান্তর্গত ভাওয়াল ও বিক্রমপুরের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ আজ রত্নহারা হইলেন।"

"বঙ্গরত্ন" লিখিলেন ;—

"বাঙ্গালার খাঁটি বাঙ্গালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় আর ইহজগতে নাই। * * * ভাওয়ালের এই দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত কবি তাঁহার হৃদয় শোণিত দিয়া যে অতুলনীয় কবিতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমর স্থান অধিকার করিয়া রহিবে।"

অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী" লিখিলেন ;—

"আমার এই দুর্ভাগা অভিশপ্ত দেশের কথা—মাসের পর মাস সেই একই—শোক, দুঃখ, অভাব, দৈন্য, অপমান, অত্যাচার, অবিচার,—রাষ্ট্রে ও সমাজে, ঘরে ও বাহিরে। এবারকার প্রধান শোকের খবর দেশভক্ত তেজস্বী সুকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যু।"

অগ্রহায়ণ সংখ্যা "ভারতবর্ষ" লিখিলেন ;—

"বাঙ্গালীর খাঁটি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মরিয়াছেন,—না, না, মরিয়া বাঁচিয়াছেন। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অর্দ্ধাশনে, অনশনে সুদীর্ঘকাল কাটাইয়া আমাদের চির দরিদ্র পল্লী-কবি গোবিন্দদাস মরিয়া গিয়াছেন, এখন তোমরা সভা কর, বক্তৃতা কর, তাঁহার 'চিতায় মঠ' দেও। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য শ্যামলা, বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে এত কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, সাবধান! তাঁহার জন্য কেহই শোক-প্রকাশ করিও না, সে অধিকার আমাদের নাই।"

কার্ত্তিকের "**নব্যভারত**" লিখিলেন ,—

"প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় বিগত ১৩ই আশ্বিন (১৩২৫) সোমবার শেষরাত্রে ঢাকা নগরীতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

* * * *

তিনি আমাদের হৃদয় মন সব অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার শোকে আমরা অস্থির ও অবসন্ন।"

২১শে আশ্বিনের "**দৈনিক বসুমতী**"তে প্রকাশিত হইল—

"আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বাঙ্গলার বিখ্যাত কবি, খাঁটি বাঙ্গালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

* * * *

বাঙ্গলার সৌন্দর্য্য,—প্রাকৃতিক ও মানসিক,—তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। সে সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাহিত্য সিদ্ধির ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। * * * তিনি প্রতিভাশালী কবি * * * বিশ্ব-বন্দিত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দানের তুলনায় গোবিন্দচন্দ্রের গীতি-কাব্যের সম্পদ 'স্বল্প' হইতে পারে, কিন্তু সে দান সম্পূর্ণ মৌলিক। স্বক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ সার্থক।"

২২শে আশ্বিনের "**নায়ক**" পত্রিকায় প্রকাশিত হইল ;—

"কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য। সরল প্রাঞ্জল কবিতায় একমাত্র তিনিই বাঙ্গালীর অন্তরের নিগূঢ় ব্যথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। * * * নিতান্ত দুঃখের সহিত আজ আমরা বাঙ্গালার এই জাতীয় কবির পরলোক-গমন সংবাদ পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিলাম। পার যদি, তবে কবির উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা কর।"

এতদ্ব্যতীত শ্রদ্ধেয় কবিবর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এবং অধুনা পরলোকগত সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়গণ কবি গোবিন্দচন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে সকল শোকগাথা রচনা করেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

"কবির তিরোধান।

ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্‌নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা ; আন্‌মনে হায়, সেই সমাচার লভি'
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক্ উঠ্‌ল নিমেষ তরে।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুঠেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডোরায় কাঁটার মালা গলে ;
পাতায় চাপা গন্ধ টুকুন্ পূবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যেজে,
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা করে রইল চোখের জলে।

ধন জনের ধার্‌ত না ধার চিন্‌ত তারে অল্প কটি লোকে,
নয় দারোগা নয় খেতাবী—খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্ মুখে ;
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তায় দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চলে ;—রেশ্ রয়েছে সারা দেশের বুকে।

বাদ্‌লা রাতির সাথী সে যে শরৎ প্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরেণি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা স'য়ে,
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্‌ছে ত্রিকাল ধরে,
কবি জানে,—পরম সুখে সে আছে আজ তারি পরাগ হয়ে।"

কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, গোবিন্দ-বিদায়ে অশ্রুপাত করিয়া লিখিলেন ;—

"গোবিন্দ! সুহৃদ্ মম! হে শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম!
সব অবসান,—
নাহি দুঃখ দৈন্য আর, নাহি অশ্রু হাহাকার,
ব্যথা—অপমান!
সমাগত দেব-রথ, সিদ্ধ তব বাণী-ব্রত,
সিদ্ধ মনস্কাম,—
শান্তি-তৃপ্তি-পূর্ণ বুকে, অগ্রসর কাম্য-মুখে
হর্ষে অভিরাম!
ধ্রুবতারা হয়ে রও, আমার আরতি লও,
যুগ যুগান্তরে,—
হে অমর! মর্ত্ত্যলোক ধন্য হোক্! ধন্য হোক্!
তোমা লক্ষ্য করে!"

১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "সৌরভ" পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবির অন্তর্ধানে, বেদনা-কাতর হৃদয়ে এক অনলবর্ষী কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি সর্ব্বতোভাবে সত্যের মহিমা-মণ্ডিত। লেখকের সহমর্ম্মিতা এবং নির্ভীকতা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। এস্থলে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল।

"কবি-প্রয়াণে

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
ভাতের অভাব ঘুচ্‌লো এবার, ঘুচ্‌লো হাহাকার!
সারা জীবন কেঁদে গেছে দু-মুঠ ভাতের দায়।
হাত পাতেনি কারুর কাছে দারুণ যাতনায়!
মাসের ভিতর বেশীর ভাগই থাক্‌তো চিড়া খেয়ে,
জীবন-ভরা জীবন-জালা দেখ্‌লো না কেউ চেয়ে!

জগৎকিশোর বুঝ্‌তো দরদ্—গরীব দুখীর পিতা;
তার দয়াতেই জাত্ রেখেছে কবির পরিণীতা!
সন্তানেরা পাচ্ছে খেতে, যায়নি যমাগার;
বাঁচুক্ কিম্বা মরুক্ তারা, আস্‌বে না সে আর!

(২)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
তোম্‌রা এখন শোকের সভা করো চমৎকার!
চিতায় এখন মঠ দাওগে, কেঁদে ভিজাও মাটি;
বক্তৃতাতে তুব্‌ড়ি ছুটাও, টেবিলে দাও চাটি!
বুকের নীচে তাকিয়া রেখে তর্ক করো সবে,
গোবিন্দ দাস মস্ত কবি, নাম রেখেছে ভবে।
তোদের এসব কথা শুনে উর্দ্ধে দেবপুরে,
ক্ষুৎপীড়িত কবির আত্মা মরছে মাথা খুঁড়ে!
এখন হাজার গলা কাটা, চেঁচা বারম্বার;
কবি তোদের দেখ্‌বে না মুখ, আস্‌বে না সে আর!

(৩)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
যায় না বলা সে সব কথা সকল ঘটনার!
যারা বেশী গর্ব্ব করে দাস কবিকে নিয়ে,
তারাই আগে মাথা কুটুক্ ঘরের কোণে গিয়ে।
কি করেছিস্ তোরা তাঁহার যখন ছিল বেঁচে?
এক মুঠো ভাত দিস্‌নি খেতে একটা দিনও যেচে!
মনের কষ্টে ঢাকায় কবি ফির্‌তো পথে পথে;
ক্ষুধায় চক্ষু কোটরগত, চল্‌তো কোনো মতে!
দোনের মত পেটটি ছিল, হাড় কখানি সার;
জীবন দিয়ে নাম রেখেছে, আস্‌বে না সে আর!

(৪)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
পূর্ব্ববঙ্গ ক'রে গেছে গভীর অন্ধকার !
বিনা পথ্য চিকিৎসাতে কয়টা দিনের জ্বরে,
দেশের মস্ত অবহেলায় মনের ক্ষোভে মরে !
এদেশে কি পাঠক আছে ? এইগুলা সব চাষা !
বুক-ফাটা সে ভীষণ কাঁদন কাঁদ্‌বে কবির ভাষা !
গরীব কাঙ্গাল কবি ব'লে কেউ চাহেনি হেসে ;
আপন ক'রে নেয়নি তারে গভীর ভালবেসে !
পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির অন্ন পাওয়া ভার ?
ভুঁড়ি ভোজন চলুক্ তোদের, আস্‌বে না সে আর !

(৫)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
একটি খাঁটি কবি গেল কাঙ্গাল পল্লী মা'র !
শুভ্র ছিল হৃদয় তাহার কুন্দ ফুলের মত ;
একটু স্নেহে ফেল্‌তো কেঁদে, লাগ্‌তো থতমত !
ক্ষুধার চোটে নিত্য তাহার বইতো বুকে বান !
সহ্য নাহি কর্‌তো তবু আত্মার অপমান !
মনুষ্যত্বের কর্‌তো পূজা, শক্ত বুকের ছাতি ;
কলুষ-হৃদয় লাখ্‌পতিদের মাথায় মার্‌তো লাথি !
নেহাৎ গরীব কবি কিন্তু বীর্য্যের অবতার ;
একটী নিখুত মানুষ গেল, আস্‌বে না সে আর !

(৬)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
পা'র হয়ে সে গেছে চ'লে দুখের পারাবার !
দেশের এসব ধনী মানী মিছাই থাকে ঢাকা !
বৃথা এসব বি-এ, এম-এ, কেবল চেনে টাকা !

দেশের কবি চিঁড়া খেয়ে কাঁদতো সারিন্দায়!
পয়সা হ'লে তবেই চাটি হোটেলে ভাত পায়।
নীল কণ্ঠের মত কেবল গরল পিয়ে গেছে!
সকল জ্বালার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেছে।
কাঙ্গাল কবি আর চাহে না তোদের সুবিচার;
কুকুর শেয়াল কাঁদুক এখন, আস্‌বে না সে আর।

(৭)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
বিনা দোষে দেশান্তরী কর্‌লো জমিদার!
সে কেঁদেছে সারা জীবন মনের মহা দুখে
রক্ত দিয়ে লিখে গেছে মাতৃ ভাষার বুকে:
নির্য্যাতনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে কর্‌লে কষাঘাত,
ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে না তার কর্‌তে মুণ্ড পাত।
"ভাওয়াল তার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল তাহার প্রাণ"
সেই ভাওয়ালে জীবনের তার হয়নি অবসান!
কেউ করে না এমন তর ভীষণ অত্যাচার;
পাপীর বক্ষ পিষে দিতে আস্‌বে না সে আর!

(৮)

গোবিন্দ দাস গেছে চলে, আস্‌বে না সে আর!
একটি মানুষ পাই না খুঁজে দুঃখ ব'লবার!
থাক্‌লে মানুষ কবির মৃত্যু হয় না অনাহারে;
দুই মুঠো ভাত সবাই দিত শাস্ত্র অনুসারে।
এদের চেয়ে হাজং গারো হাজার গুণে ভালো;
তাদের হৃদয় এদের মত নয় তো মসী কালো!
বাহার ক'রে কাপড় প'রে বেড়াস্‌ বাবু সেজে;
হাজার চেষ্টা কর্‌লে মানুষ হয় না ঘসে মেজে!

'দামৃড়ি' 'চামৃড়ি' খুব চিনেছে, হায় কি ব্যবহার !
গরীব কবির হাড় জুড়ালো, আস্‌বে না সে আর !

(৯)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
মনুষ্যত্ব নাই এদেশে, গেছে ছারেখার !
চতুষ্পদের গোষ্ঠি জ্ঞাতি খুবছে দ্বিপদগুলা ;
বাঁধা বুলি ঢের শিখেছে, মুখে খোনে তুলা !
এদের কি আর হৃদয় আছে ? পাষাণ কবে গলে ?
কথায় যদি ভিজ্‌তো চিড়া, কাজ ছিল না জলে।
যখন তখন আহার বিহার চল্‌ছে রাত্রি দিবা ;
মুখ আছে তাই বেঁচে গেছিস, নয়তো খেতো শিবা।
কলম-পেষা জাত্‌ ব্যবসা, সবাই চাটুকার,
মিট্‌লো কবির পেটের ক্ষুধা, আস্‌বে না সে আর !

(১০)

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
জীবন গেলে ভুলবো না আর এদের অবিচার।
এদের খ্যাতির মূল্য নহে একটি কাণা কড়ি,
ক্ষুধায় ম'লো দেশের কবি, নাই কি গলার দড়ি ?
এরাই আবার মিটিং করে, লক্ষ্মীছাড়ার জাত্‌ !
বক্তৃতাতে স্বর্গে তোলে, দিন্‌কে করে রাত !
চরণ চাটা অপদার্থ এদের মত নাই ;
হা ভগবান্‌, মানুষ পাঠাও—মানুষ কোথা পাই !
এদেশ বাসীর জীবনে ধিক্‌, ধিক্‌ সে কোটিবার !
গোবিন্দ দাস বেঁচে গেছে, আস্‌বে না সে আর !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।"

১৩২৫ সনের "সৌরভ" নামক সাময়িক পত্রে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বড় দুঃখে লিখিলেন ;—

"তিনি দেশের দুর্ব্বল প্রাণে শক্তি জাগাইয়াছেন, জাতীয় বল-বীর্য্যের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন ; মুক্তপ্রাণে, মুক্তহস্তে তাঁহার অফুরন্ত ভাবের সম্পদ বিলাইয়াছেন। আমরা তাঁহার জন্য কি করিয়াছি? অন্ত মুহূর্ত্তে, অন্তিম তৃষায় তাঁহাকে আমরা একটু জলও দিতে পারি নাই। এখন 'কবিবর' বলিয়া কাঁদিবার আমাদের কি অধিকার আছে? অনুতাপের অশ্রুজল আমাদের সম্বল। লজ্জায় অধোবদন আমাদের কলঙ্কের আচ্ছাদন। * * * হৃদয় বড় ব্যথিত ভারাক্রান্ত।"

কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর সমগ্র বঙ্গদেশে বিক্ষোভের স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অগণিত নরনারী নীরবে অশ্রুবারিতে তাঁহার তর্পণ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ 'সারস্বত কবি'র শোকে নীরবে কাঁদিয়াছেন—এখনও কাঁদিতেছেন। বঙ্গদেশে তাঁহার অগণ্য ভক্ত আছেন—যাঁহারা তাঁহাকে নীরবে পূজা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

তিনি নীরব সাধক ছিলেন—নীরবতা ভালবাসিতেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তেরাও তাঁহাকে বিশ্ববন্দিত করিবার দুরাশা পোষণ করিতেন না। ভাওয়ালের বনে যে কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অনাদৃত ভাবে তাহা ঝরিয়া পড়িল! কিন্তু তাহার সৌরভে সমগ্র বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ত।

ভাওয়াল রাজসিংহাসন বহুদিন গত হইল শূন্য হইয়াছে। কোন্ পাপে—কা'র অভিশাপে রাজবংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে, কে তাহার তথ্য নির্ণয় করিবে? এখন ভাওয়ালের সেই রাজা নাই, মন্ত্রী নাই।

ভাওয়ালের উজ্জ্বল দীপাবলি রাজকুমারগণ * অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছেন। এ দুঃখ সহজে দূর হইবার নহে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র জীবিত থাকিতে তাঁহার রচিত "মগের মুলুকের" আলোচনা হইত—কবির মৃত্যুর পরও সে আলোচনা নিভে নাই—যতদিন বঙ্গসাহিত্য আছে, ততদিন থাকিবে। কালের ভেরী বাজিতে আরম্ভ করিলে কে তাহার রোধ করিবে? ভাওয়ালের পতন ও কবি গোবিন্দচন্দ্রের নির্ব্বাসন চিরস্মরণীয়।

---

* ভাওয়ালের মৃতমগ্ন দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ, যিনি দার্জ্জিলিং নগরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,—সন্ন্যাসীবেশে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনা যায়, প্রকৃতই তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু Board of Revenue তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গোবিন্দদাসের কাব্যালোচনা,—তাঁহার উপেক্ষিত হইবার কারণ।

এক্ষণে, আমরা কবি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যসমূহের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এস্থলে তাঁহার রচিত গ্রন্থের, অন্যান্য রচনার এবং অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১) "প্রসুন"—ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। ইহা অধুনা বিলুপ্ত।

(২) "প্রেম ও ফুল"—গীতিকাব্য। ১২৯৪ সনে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পত্নী সারদাসুন্দরীকে ইহা উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছে। ঐ বৎসরের "নবজীবনে" ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছিল।

(৩) "কুঙ্কুম"—গীতিকাব্য। রচনাকাল ১২৯৮ সন। ইহাও প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে উপহৃত।

(৪) "মগের মুলুক"—বিদ্রূপরসাত্মক কবিতা। রচনার কাল ১২৯৯ সন। ইহার আদ্যোপান্ত অতি তীব্র বিদ্রূপের লহরী বিদ্যমান,—ভাষা অনলবর্ষী।

(৫) "কস্তুরী"—গীতিকাব্য। ১৩০২ সনে প্রচারিত হয়। ইহা দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীকে উপহৃত হইয়াছে।

(৬) "চন্দন"—গীতিকাব্য। নির্ব্বাসিত কবির বিলাপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। রচনার কাল ১৩০৩ সন।

(৭) "ফুলরেণু"—সনেটের সমষ্টি। ১৩০৩ সনে প্রচারিত হয়।

(৮) "বৈজয়ন্তী"—গীতিকাব্য। ১৩১২ সনে মুদ্রিত হয়। কবির প্রতিপালক মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর নামে এখানা উৎসর্গ করা হইয়াছে।

(৯) "শোক ও সান্ত্বনা"—কবিতা পুস্তিকা। রচনার কাল ১৩১৬ সন।

(১০) "শোকোচ্ছ্বাস"—একটি শোক কবিতা। ১৩১৭ সনে রচিত।

উপরোক্ত দুইখানি পুস্তিকা ভাওয়ালের রাজকুমারগণের মৃত্যু উপলক্ষে বিরচিত।

(১১) "গীতার কাব্যানুবাদ"—রচনার কাল ১৩২২ সন। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার কবিতায় অনুবাদ। ইহা অদ্যাপি অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

(১২) অপ্রকাশিত কবিতাবলী। ইহাদের কতকগুলি "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল, কতক অমুদ্রিত আছে। সমগ্র একত্র করিলে প্রায় তিন চারিখানি গীতিকাব্য হয়।

গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে ব্যঙ্গ বঙ্গরস, তীব্র দেশভক্তি, নৈসর্গিক দৃশ্য এবং ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ বহু প্রাণোন্মাদক কবিতা রহিয়াছে। তাহা মুদ্রাঙ্কণের যোগ্য হইলেও বিস্ময়কর ঘটনাচক্রে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে! পারি ত সে সকল কুসুমের সৌন্দর্য্য পাঠক পাঠিকা-গণকে একদিন দেখাইব।

এতদ্ভিন্ন ঢাকানগরীর স্বনামধন্য ব্রাহ্ম, অধুনা পরলোকগত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে তাঁহার কয়েকটি দেশভক্তিমূলক এবং সুরাপান নিবারণী গান প্রকাশিত হইয়াছিল। "সঙ্গীত মুক্তাবলী" সম্পাদনকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে, কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার অনুরোধে কবি গোবিন্দদাস জাতীয় সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র গান গাহিতে জানিতেন না, কিন্তু দেশের দুঃখে তাঁহার প্রাণের ভিতর রাগ রাগিণীর আলাপ হইত, নতুবা এমন সুললিত ও মনোহারিণী সঙ্গীত রচনা সম্ভবে না। পাঁচটি জাতীয় সঙ্গীত "সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে সন্নিবেশিত হয়। তাহাদের প্রারম্ভ এইরূপ ;—

(১) অসুরে সুর সাম্রাজ্য ভুগিতেছে নিরাতঙ্কে,
(২) এস ভাই মিলে মিশে এই ত শুভ সময়,
(৩) নয়ন সলিলে মাতঃ কেন গো ভাসিছ আজ ?
(৪) বহুদিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী,
(৫) ভারত সৈরিন্ধ্রীবেশে আছে বিরাটের ঘরে,

গানগুলি বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করিতে আমাদের স্থানাভাব। যাহাদের সমগ্র উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা, তাহারা "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" খানা একটু কষ্ট করিয়া খুলিয়া দেখিবেন। তাঁহার কোন কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাগুলি পরে আর মুদ্রিত হয় নাই।

উক্ত "সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে প্রকাশিত সুরাপান নিবারণী কয়েকটি গান, গোবিন্দচন্দ্র, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। তন্মধ্যে দুইটি গান এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল ;—

রাগিণী পাহাড়—তাল আড়াঠেকা।

"কেমনে ভারতে পাপ সুরাস্রোত প্রবেশিল,
অনল প্লাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল!
শুধু এ অনল নয়, এ বহ্নি গরলময়
অনন্ত প্রবাহ বলে ভারতেরে বিনাশিল!
হায় রে সোণার বঙ্গে, এ পাপ সুরা তরঙ্গে
অঙ্গার করিল সব যা কিছু সম্পদ ছিল!
দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা
ঐশ্বর্য্য বিভবসহ জীবন আহুতি দিল!
পুত্র শোকে অবিরত, কাঁদে জন্মভূমি কত
অবিরল অশ্রুজলে এ অনল না নিভিল!"

আর একটি গান এইরূপ ;—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

"ছি ছি! ওঠ ওঠ ওহে ভাই
আঁখি মেলে দেখ একবার,
কি ছিলে কি হইয়াছ, জানি কি হইবে আর!
বলি না সত্যের কথা, বলি না দ্বাপর ত্রেতা
স্মৃতির সমাধি খুঁজে পাবে না কঙ্কাল তার!
দেখ পূর্ব্ব বর্ষগত, দেখ সে পুণ্য ভারত
মিলাইয়া ভবিষ্যত, দেখ আজি আপনার!
তুমি মোহে মূর্চ্ছাপন্ন, সুরাপানে অবসন্ন,
দেখ দেখি কি বিপন্ন জনমভূমি তোমার।"

গানগুলি সুমিষ্ট অথচ প্রাণস্পর্শী। মনে হয়, ভদ্রশ্রেণীর সুরাপায়ী-দিগকে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলে কোন ফল হইবে না বুঝিয়াই

যেন কবি, মৃদু ভর্ৎসনাচ্ছলে, এ জাতীয় গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতার ভিতর সর্ব্বত্রই তীব্র কষাঘাত উদ্যত হইয়া আছে, কিন্তু সুরাপান নিবারণী কবিতায় তাহা নাই। আছে বুকভরা আক্ষেপ, আর তাহার সঙ্গে সুরাপায়ীদের প্রতি কাতর প্রার্থনা। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা সন্দেহ নাই!

আজ প্রায় সুদীর্ঘ তিন যুগ পূর্ব্বে, কবি গোবিন্দদাস সুরাপানের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেন। সেকালের দেশের অবস্থার সঙ্গে একালের তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। সেকালের রীতি-নীতি একালে কতক পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সারল্যের স্থলে কৌটিল্য, উদারতার স্থলে সঙ্কীর্ণতা, সচ্ছলতার স্থলে অভাব, প্রফুল্লতার স্থলে দুশ্চিন্তা সমাজের সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ সকল পরিবর্ত্তন, পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফলে সৃজিত।

সেকালে ময়মনসিংহ বহুতর সদনুষ্ঠানের কেন্দ্র হইলেও, নাগরিক সভ্যতার বিষাক্ত বাতাস তদুপরি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহে, পানদোষ অবাধ অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল ময়মনসিংহে কেন, বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক সহরেই তখন এই রোগ সংক্রামকরূপে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু সুখের কথা এই যে, তদানীন্তন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থিগণ "সুরাপান নিবারণী" সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উল্লিখিত সভার বাৎসরিক উৎসবের জন্য, কবি গোবিন্দচন্দ্র অনুরুদ্ধ হইয়া, "সুরাসুর বধ" নামে কবিতায় একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন।

পরে অনুষ্ঠাতাগণ তাহা দক্ষতার সহিত একদা উৎসবে অভিনয় কবেন। দর্শকগণেব নিকট সে ক্ষুদ্র অভিনয় বস্তুতঃই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আমরা এস্থলে "সুরাসুর বধ" নাটিকার একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত কবিতেছি।

"সুবার উক্তি।

নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগস্ত্য গণ্ডুষ' কর পিপে সমুদয়।
গ্রামে গ্রামে খোলা ভাঁটি, আছে বেশ পরিপাটী,
জীবন মুক্তির পথ বহুদূর নয়।
খাও ব্রাণ্ডী এক গ্লাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময়।
ভুলে যাও আত্ম পর, দ্বেষ হিংসা পরস্পর,
করহে যোগীর মত উদার হৃদয়।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূশয্যায় পড়ি,
কর দোঁহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়;
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়।"

বলা বাহুল্য যে, তৎকালে ময়মনসিংহের এই সকল অনুষ্ঠানের ফল আশাপ্রদই হইয়াছিল।

কবি গোবিন্দচন্দ্র বহু সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এককালে "বীণা", "নবজীবন", "কৌমুদী", "ভারতমিহির", প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার অঙ্ক তাঁহার কবিতায় সুশোভিত হইত। "বান্ধব", "প্রকৃতি", "জন্মভূমি" কাগজেও তিনি একদা লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আধুনিক বহু সাময়িক পত্রিকা যথা "আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা", "সৌরভ",

"প্রতিভা", "নারায়ণ", নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শন", "মানসী", "ঢাকা রিভিও ও সম্মিলন" প্রভৃতিতে তিনি মাঝে মাঝে রচনা প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ "নব্যভারতের" নিয়মিত লেখক ছিলেন। "নব্যভারতে" তাঁহার বাশি রাশি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৯০ সন হইতে মৃত্যুর বৎসর ১৩২৫ সন পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে "নব্য-ভারতে" লিখিয়া গিয়াছেন।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, বহু সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক-গণ কবি গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁহাদের কাগজে লিখিতে অনুরোধ করিয়া প্রত্যেক কবিতার জন্য কিছু কিছু পাবিশ্রমিক দিতেও স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু, নানাবিধ কাবণে তিনি একমাত্র "নব্যভাবত" ভিন্ন, পরবর্ত্তী জীবনে, অন্য কাগজে বড় বেশী লিখিতেন না।

"নব্যভারতের" জন্য বিরচিত তাঁহার শেষ কবিতা "অসুর পূজা" নামে ১৩২৫ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহা সময়োপযোগী হইয়াছিল। ইহাতেও সেই আগ্নেয়গিরির মত দেশপ্রাণতার অনল-স্রাব,—জাতীয়তাব সম্পর্কে বক্তৃতা,—শৌর্য্য ও বীর্য্যের স্তুতি গান,—মুক্তকণ্ঠে স্বদেশ-প্রীতির প্রশংসা বিদ্যমান। সর্ব্বশেষে প্রবঞ্চক, অবিশ্বাসী, আততায়ী, অবিচারী, ব্যভিচারীর প্রতি কটাক্ষপাত। অসুর শব্দের কদর্থ প্রচলিত থাকিলেও তিনি অসুরকে বন্দনাই করিয়াছেন। অবশ্য কবির উদ্দেশ্য রসজ্ঞের নিকট সহজেই অনুমেয়।

"ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্ব্বিজয়!
শৌর্য্য তোমার, বীর্য্য তোমার, অনন্ত অক্ষয়!
ধন্য তোমার স্বদেশ প্রীতি
ধন্য তোমার অসুর নীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য স্মৃতি বিনাশ করে ভয়।

তোমার ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি
স্বাধীনতার অগ্নি স্ফূর্ত্তি,
মরণ কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ চাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা,
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা
এক নিমেষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্ম্ময়।
তোমার প্রবল স্বদেশভক্তি
ঠেলে উঠ্‌ছে সকল শক্তি
ধবল গিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়!
রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব,
দেখি নাই আর এমন মত্ত
বীরত্বের মহত্ত্বের আর ত এমন অভ্যুদয়!
গুলির মত পণ প্রতিজ্ঞা ধূলির মত নয়।"

* * *

ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত "সৌরভ"এ কবি গোবিন্দদাস প্রায়ই লিখিতেন। "সৌরভ" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে কবি গোবিন্দের প্রণয় ছিল। "সৌরভে"র জন্ম গোবিন্দচন্দ্রের শেষ কবিতা "ঋণ"। একটু উদ্ধৃত করা আবশুক মনে করিতেছি।

"ঋণ।

সাগরের বারিকণা রবি করে ধার,
সে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভার!
দিনে দিনে পলে পলে ধীরে জমিয়া সে,
ভীষণ মেঘের রূপে তাহারেই গ্রাসে!

উগারে সে অবশেষে অশনি অনল,
কাঁপে সে ঋণের ডাকে সারা ধরাতল!
দয়া করি দেবরাজ ধারা বরষণে,
উদ্ধার করেন ঋণে বিপন্ন তপনে।
রবির নিকটে শশি আলো করি ঋণ,
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু কলঙ্কে মলিন!
তবে যে মরিয়া বাঁচে, ঘটে উপচয়,
সুধাব আকর বলি, সুধায় সে নয়।
শবণ দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি
তাই আছে মৃত্যু সাথে কবে' টানাটানি।
দেবতা এমনি যদি ঋণে ম্রিয়মাণ,
মানুষ কেমনে তবে ঋণে পায় ত্রাণ?"

১৩২৫ সনে গোবিন্দচন্দ্র ঋণে জড়িত,—সম্ভবতঃ কবিতাটি তৎকালীন অবস্থার ছায়া অবলম্বনে সৃজিত।

কবি গোবিন্দদাস-বিরচিত প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের শিরোনামের নিম্নে হিতোপদেশের একটি প্রবচন উদ্ধৃত আছে;—

"কিম্যপস্তি স্বভাবেন স্বভাবং ব্যপাসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তস্য সুন্দরং॥"

একদা প্রসঙ্গক্রমে এই বচনটির কথা উল্লেখ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাব্যে সুন্দর কিছুই নাই, যদি পাঠ করিয়া কাহারও আনন্দ হয় তবেই তাহা সুন্দর, এজন্যই শ্লোকটি যোজনা করিয়াছেন। তিনি, উক্ত শ্লোকের একটি সুন্দর অনুবাদ তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এই:—

"স্বভাবতঃ কিবা আছে কুৎসিত সুন্দব
যাতে যাব রুচি তাব সেই মনোহর।"

বাস্তবিকই মনোহর তাঁহাব কবিতার ভাষা,—তাঁহার শব্দ যোজনার অসীম শক্তি। মনোহর তাঁহার ভাবরাশী,—অনাহত জলস্রোতের মত তাহার কবিতার গতি। মনোহর তাঁহার প্রেম,—মনোহর তাঁহার দেশপ্রীতি। তাঁহার কবিতায় art নাই ইহা মানিয়া লইলেও গীতি কাব্যেব আসরে গোবিন্দচন্দ্র মনোহব।

গোবিন্দদাসের কাব্য কয়খানি নানা শ্রেণীর কবিতায় অলঙ্কৃত। রচনাব কাল-হিসাবে তিনি তাহাদিগকে শ্রেণী-বিভাগ কবিয়া সাজাইয়া যান নাই। প্রত্যেকখানি কাব্যেই বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন জাতীয় কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, আমবা তাঁহাব কবিতাবলী নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণী-বিভাগ করিব।—

(১) প্রেমমূলক কবিতা।
(২) শোক সঙ্গীত।
(৩) বিদ্রূপ রসাত্মক কবিতা।
(৪) সামাজিক কবিতা।
(৫) দেশভক্তিসূচক এবং জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা।
(৬) নানাবিষয়িণী কবিতা।

কবি গোবিন্দদাসের রচনায় কোন বৈদেশিক ভাবের ছায়া মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি খাঁটি দেশীয় কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা-সুন্দরীর মূর্ত্তি, অতুল রূপশালিনী বঙ্গললনার সঙ্গে তুলনীয়। নারীভক্তি, পতি-পত্নীর প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি এবং সর্ব্বোপরি দেশাত্মবোধের কবিতাই, ইনি বেশী রচনা

করিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের রচনা সর্ব্বতোভাবে মৌলিক এবং স্বকীয় বৈচিত্র্যে প্রভাবান্বিত।

(১) প্রেমমূলক কবিতা।—

কবি গোবিন্দের প্রেম-কবিতাগুলি সরলভাবে রচিত হইয়াছে। তাহা স্বচ্ছ, অনাবিল এবং জ্যোৎস্না রজনীর মেঘমুক্ত গগনের ন্যায় প্রাণোন্মাদক। গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি যে, গোবিন্দদাস নারী-ভক্ত কবি। পত্নীর নিষ্কলঙ্ক প্রেম তাহার প্রাণ; দুঃখবাদ এবং নিরাশার মর্ম্মন্তুদ করুণ ক্রন্দনে তাহা অভিষিক্ত। ভাগ্যদেবতার কঠোর নিষ্পেষণে পীড়িত, কবি-হৃদয়ে নিরাশার মর্ম্মভেদী যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই সুরই তাঁহার পীযূষবর্ষী কাব্যগ্রন্থে অপূর্ব্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সুর, মানবের হৃদয় আলোড়িত করিয়া অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে। বর্ত্তমান যুগের দুর্ব্বোধ্য কবিতার ন্যায়, তাঁহার কবিতায় পাঠকগণকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হয় না।

এই শ্রেণীর কবিগণের মধ্যে কবিগুরু বিহারীলাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন কবি অক্ষয়কুমার ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও একদিন নারীভক্ত কবি এবং বিহারীলালের শিষ্য ছিলেন। অধুনা তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ ও সর্ব্বতোমুখী।

গোবিন্দদাস প্রচুর প্রেমের কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন পূর্ণ যুবক, তখন বঙ্গসাহিত্যে প্রেমমূলক কবিতার বড় আদর ছিল। ইহা ১২৮৪-৮৫ সনের কথা। বাঙ্গালার সেকালের কবিগণ প্রেমসঙ্গীত গাহিতেই ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা"র তারে প্রেমের রাগিণীই বেশী মাত্রায় ঝঙ্কৃত হইত।

বলিতেছিলাম, কবি গোবিন্দদাসের নারীভক্তিতে একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি বিহারীলালের মত নারীকে এক সময় পূজা করিয়া

গিয়াছেন, অথচ আবার সময় সময় তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছেন। যেখানে নারীভক্তির চিত্র আঁকিয়াছেন, সেখানে সরল প্রাণে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন। নারীভক্তিতে তাঁহার আত্ম-হারা ভাব অপূর্ব্ব!

"সে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী,
সহস্র যোজনে থাকি নিলে তার নাম,
হৃদয় নির্ম্মল হয় শান্ত হয় মতি,
অনায়াসে জয় করি পাপের সংগ্রাম!
স্মরণে অনন্ত পুণ্য, মরণে উল্লাস,
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি,
দগ্ধ বুকে শত মুখে বহে বারো মাস,—
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি—পা দু'খানি!"

আবার একদিন প্রেম-বিহ্বল কবি আবেগের ভাষায় লিখিয়াছিলেন;—

"বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ,
প্রেমের অনন্ত উৎস,—নহে ও পাষাণ!
প্রত্যেক আঘাতে বুকে, এক গঙ্গা শত মুখে
ছুটিছে অনন্ত বেগে বহে না উজান!
বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ।
আজি বুঝিয়াছি হায়, ওই ফল্গু গঙ্গা ধায়,
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত সদা বেগবান,
প্রেমের অনন্ত উৎস—নহে ও পাষাণ!"

গোবিন্দচন্দ্রের নারীভক্তি কৃত্রিমতাশূন্য। নারী-পূজায় তিনি যেন

সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন যোগী ছিলেন। গোবিন্দদাসের প্রেমমূলক কবিতাবলী পবিত্র পত্নী-প্রেমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আবার গোবিন্দদাসের জীবনে যখন নৈরাশ্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখনই তিনি নারীকে বিচিত্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

"দয়া মায়া নাহি যারি, আমি জানি সেই নারী,
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ ;

* * *

আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবন নাশে,
আনন্দে বর্ব্বর ভাসে—বলে আলিঙ্গন!"

আবার এক সময় জীবনের কোন শোকাবহ ঘটনা স্মরণে লিখিয়াছিলেন,—

"কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
বিশ্বাসে তোমার কথা, নিশ্বাসে নিশ্বাসে ব্যথা,
নড়িতে চড়িতে বুকে বিঁধে শতবার!
বিষাক্ত স্বপন সম, জ্বলন্ত জীবনে মম,
জাগিয়া রয়েছে তব ফুল-উপহার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার ?"

আর একদিন লিখিয়াছিলেন,—

'বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ,
সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস!"

এভাবের কবিতায় তিনি নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নারী জাতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের সুর ইহাপেক্ষা উচ্চ গ্রামে উত্থিত হয় নাই।

গোবিন্দদাসের প্রেমের কবিতা নানা ভাবে—নানা মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত।

তাঁহার স্থায় পত্নীপ্রেম-বিহ্বল কবি বঙ্গসাহিত্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্র দাম্পত্য জীবনকে কতদূর শ্রেষ্ঠ আসন দান করিতেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ কবির একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"১৪ই মাঘ ১৩২৪ সন।
৪৭ নং সা সাহেব লেন,
নারিন্দা, ঢাকা।

আপনার পত্রখানা অনেক দিন হইল পাইয়াছি, কিন্তু নানা গণ্ডগোলে ব্যস্ত থাকায় ও আবার অর্শের আক্রমণে কাতর থাকায় যথাসময়ে আপনার পত্রের উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। ক্ষমা করিবেন।

* * *

সংসারে থাকিতে হইলে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে থাকাই সঙ্গত। নতুবা সংসারে থাকিয়া নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী জীবন,—সে ত নিজকে পরকে,—ইহকালকে পরকালকে,—সকলকে ঠকান। অর্থাৎ নিজে সর্ব্ববিষয়ে ঠকা। * * * টাকা পয়সা কম পাইলেও * * সংসার চলিলেই হইল। দুরাশাগ্রস্ত লোকের কেবল টাকার খাই খাই—তাহাদের প্রকৃতই পিশাচ প্রকৃতি। উহাদের দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা কিছু নাই। টাকাই উহাদের সর্ব্বস্ব। হৃদয়শূন্য মানুষ, আর হিংস্র পশু সমান। আমার বিবেচনায় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সুখ স্নেহ মমতা ভালবাসায়,—সংসার জীবনে। নির্ব্বাসিতের সংসার-জীবন নাই। তাহার জীবন অনন্ত মরুভূমি। * * * —অপ্রকাশিত পত্র।

কবি গোবিন্দদাসের পত্নী-প্রেম আদর্শস্বরূপ ছিল। বহু কবিতায় তিনি তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

একবার পত্নী-বিয়োগ-বিধুর কবি "চন্দনে" লিখিয়াছিলেন,—

"সেই নিশি সেই দিবা, নূতন হয়েছে কিবা,
সেই আলো অন্ধকার আগের মতন।
* * *
পুরাতন এই রাজ্যে, প্রতি কথা প্রতি কার্য্যে
সে ত গো হইয়া গেছে অতি পুরাতন।
সকলে ভুলেছে তারে, মনে নাই একেবারে
সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন।
লইয়া দুঃখিনী মেয়ে, গেছে কত দুঃখ পেয়ে
ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন ?"

কারো প্রয়োজন নাই; কিন্তু কবির আছে। আছে বলিয়াই এই করুণ ক্রন্দনের সৃষ্টি। যাহার সঙ্গে স্বর্গে-মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ, এই দুঃখময় মর-জগতে যাহার প্রেম একদিন শান্তির স্নিগ্ধধারা বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাকে পরপারে বিদায় দিয়া মানবের কি হাহাকার! জগতের হিসাবে তাহার বিদায় পুরাতন হইলেও, আত্মার কাছে সে চিরনূতন। পার্থিব প্রেমের সঙ্গে পরলোকের বিশ্বাস একত্রীভূত হইয়া তাহা একটি মনোরম আলেখ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহার পরক্ষণেই কবি গাহিয়াছেন :—

"আছে প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ বাঁচে
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন ?
* * *
রক্ত মাংসে মাখামাখি, সে আকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি,
করে না কামের ক্লেদে কুটু কুটু মন ;

পবিত্র তাহার স্মৃতি, পবিত্র উজ্জ্বল নিতি,
পবিত্র করিয়া দেয় প্রাণ পুরাতন।"

ইহা পার্থিব দেহ সম্পর্কের কথা নহে। দেহাতিরিক্ত আরো কিছুর কথাই কবির প্রতিপাদ্য বিষয়। তারপর কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস কি গভীরতররূপে প্রকাশ পাইতেছে।—

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক-চন্দন,
উষার কদম্ব-কেলি, সাঁজের ফুটন্ত বেলি,
সিক্ত-বেনামূল গন্ধী শীত সমীরণ!
সেই মম প্রিয় নারী, নবীন মেঘের বারি,
অবনীতে শ্যাম শোভা করে আনয়ন,
শিখী নাচে পাখী গায়, আনন্দে চাতক চায়,
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত ভুবন।"

পবিত্র প্রণয়ের একটি মধুস্রাবিনী সঙ্গীত, কবি আমাদিগকে শুনাইয়া গেলেন। আষাঢের প্রথম দিবসে নবজলধর হেরিয়া যক্ষের প্রাণে যে অভাবনীয় বিরহানল জাগিয়া উঠিয়াছিল, নববর্ষে কবির প্রাণে তাহা অপেক্ষা কম দুঃখ জাগে নাই।

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
শুভ চন্দ্র মম তার শুভ চন্দ্রানন,
কি পুণ্য অমৃতযোগ, প্রাণে করি উপভোগ,
একটি মুহূর্ত্ত তারে করিলে স্মরণ।"

অলকার অভিশপ্ত বিরহী যক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই মৃত্যু শোকাচ্ছন্ন কবির অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুইটির মূলেই Pessimism; কিন্তু যক্ষের বিরহে ভবিষ্যৎ

মিলনের ব্যাকুলতা, আর পরবর্ত্তীটি নিরাশামাখা হইলেও, তাহাতে প্রলয় ঝঞ্ঝার আলোড়ন নাই।

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ"

বলিয়া কবি তাঁহার শোকার্ত্ত হৃদয়কে যে সংযত করিয়াছেন, এজন্তই তিনি প্রশংসার্হ।

তাঁহার প্রেমমূলক কবিতা প্রসঙ্গে "বীণা" পত্রিকায় প্রকাশিত "ইহা কিছু নয়" কবিতাটির কতক আলোচনা করিব।

যৌবনোন্মেষে মানুষের শিরায় শিরায় যখন উন্মাদ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যখন তরুণ হৃদয় প্রেমের সুখ স্বপ্নে বিভোর, যখন মানসভৃঙ্গ কল্পনার নন্দনকাননে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন তাহার হৃদয়ের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া যদি তাহাকে বলা যায় যে "ইহা কিছু নয়", তাহা হইলে, হৃদয় কি সে কথা বিশ্বাস করে? তাই. কবি বলিতেছেন,—

"নরেট নির্ব্বোধ প্রাণ করেনি প্রত্যয়
কতবার বলিয়াছি 'ইহা কিছু নয়'!"

হৃদয়ের তখন যে অবস্থা তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মানব প্রকৃতির অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। যে সময় হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রণয়ের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়, হৃদয় তখন সংযমের কঠোর শাসনকে এড়াইতে পারিলে বাঁচে। তখন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে, নিসর্গের প্রতি অণু পরমাণু তখন, প্রাণের ভিতর এক অবর্ণনীয় মত্ততা আনয়ন করে। এইভাবে মানব হৃদয়ে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির পরিস্ফূরণ। একটি পাখীর গানে, একটি পুষ্পে, নদীর জল-কল্লোলে, অথবা হয়ত পবন হিল্লোলে সৌন্দর্য্যের প্রাণারাম চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাণের ভিতর স্বর্গের এক অপার্থিব দৃশ্য বিকশিত হইয়া উঠে। কবি লিখিলেন,—

"সেই চন্দ্র সেই হাসি, যারে বড় ভালবাসি
দেখিলে উছলি উঠে হৃদয়-রুধির,
সেই চন্দ্র সেই হাসি, অজানা ছুইল আসি
হৃদয় আতট পূর্ণ—শোণিত গভীর!
সেই বেলা শেষে নৃত্য নব কৌমুদীর—
সেই সুবঙ্কিম গ্রীবা, হেলান মৃণাল কিবা
সেই যে লাবণ্য লীলা রজত নদীর!
যদি নাহি দেখে থাকো, (দেখিলে বলিবে নাকো)
বল তবে বল শুনি,—এ নহে বিস্ময়;
আর না ঢাকিব কাণ, বল না খুলিয়ে, প্রাণ!
মুখে আসে যত আর যত মনে লয়,
সহস্র জিহ্বায় বল—'ইহা কিছু নয়'।"

কবি মুখে বলিতেছেন "ইহা কিছু নয়", কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিতেছেন না। মানুষে তাহা পারে না।

কবি আর একটি চিত্রে দেখাইতেছেন,—

"মহর্ষি কণ্বের সেই পবিত্র আশ্রমে
বসিয়ে ও শকুন্তলা মলিনা শরমে!
সমীরণ দুলি দুলি, নাচায়ে কুসুমগুলি
উড়া'য়ে পরাগ তার দি'ছে দুনয়নে,
কিংবা কুরুবক-শাখে, বল্কল আটকি থাকে,
নব কুশাঙ্কুর ফোটে চলিতে চরণে!
সে সময় দেখে শুনে
স্বর্গীয় প্রেমের সেই নব অভিনয়,

সে দুষ্মন্ত তুমি হয়ে, তার সেই প্রাণ লয়ে
বল শুনি একবার—'উন্মাদ হৃদয়'
শুনিয়া হাসিব আমি—'ইহা কিছু নয়' !"

হৃদয়-তরঙ্গিণী যখন প্রেমের তরঙ্গে টলটলায়মান—যখন জগতের সমস্ত দৃশ্য অনন্ত সমুদ্রের মত অনন্ত প্রণয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, তখন "ইহা কিছু নয়" বলিলে সংসার তাহা স্বীকার করিবে কেন? কবি তাই বলিতেছেন,—

"সে সময়ে বলিবারে, এ পাষাণ যদি পারে
দ্রবীভূত হয়ে প্রাণ নাহি যায় তার,
পাষাণ পাষাণ প্রাণ রাখে আপনার!
শুনিবে না এ সংসার—প্রেমার্দ্র হৃদয়
শতবার বলে যদি—'ইহা কিছু নয়' !"

ইহা পার্থিব প্রেমের কথা। পৃথিবীতে প্রণয়ের এই প্রকার চিত্র সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা নাই। জোর করিয়া এই কবিতা হইতে আমরা আত্মা পরমাত্মার মিলনের কথা বুঝাইতে যাইতেছি না। ইহা স্বাভাবিক প্রণয় সঙ্গীত, অথচ ইহাতে দুর্নীতি নাই। ইহা অভিসার অথবা পরকীয়া প্রেমের কবিতাও নহে।

বাহুল্য ভয়ে "বীণা" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার রচিত "নীল-জলদ", "সোহাগের আর একটুকু", "বসোরা গোলাপফুল", "সতিনী" কবিতার উল্লেখ করিলাম না।

তাঁহার প্রেমমূলক রচনা প্রসঙ্গে আমরা যে সকল কবিতার উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কয়েকটি এবং "বীণা"য় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কোন কাব্যগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, বিস্মৃতিই ইহার কারণ। কিন্তু

যশোলিপ্সায় বৈরাগ্য ইহার কারণ কি না, তাহা বিবেচনার বিষয় বটে।

তাঁহার প্রেমমূলক কবিতার একটা আভাষ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য—বিস্তারিত ভাবে আলোচনার ইহা স্থান নয়।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় একদা, কবিবর রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া "কাব্যে নীতি" শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সাহিত্যে দুর্নীতি দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট অসহ্য ছিল। উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন, "জননীর স্নেহ, স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার সেবা, বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য, ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা, এই সকল মহিমময়ী কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া "সে কেন চুরী করে চায়" আর "জাগি পোহাল বিভাবরী" এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবু ত সহস্রাধিক খণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন, পতি পত্নীর পবিত্র প্রেম—যাহার মূলে সম্ভোগ নাই, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ,—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে?"

আমাদের বিশ্বাস অথচ প্রমাণ করিয়া দেখাইতেও পারা যায় যে, কবি গোবিন্দদাসের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের এই আক্ষেপ দূর করিবার স্পর্দ্ধা রাখে।

বৈষ্ণব কবিদিগের অনুকরণে এবং অনুসরণে পরকীয়া প্রেমের কবিতাই বঙ্গসাহিত্যে প্রবল। কবি গোবিন্দদাসের কাব্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর রূপে বিজড়িত, তাঁহারা জানেন যে, তথাকথিত পরকীয়া প্রেমের কবিতাগুলি, তাঁহার জীবনের Romance. তাহার একটু ইতিহাস আছে।

পত্নী বিয়োগান্তে, যখন তিনি সেরপুরে হরচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের

নিকট চাকরি করিতেন, তখন মাঝে মাঝে জন্মভূমি জয়দেবপুরে যাইতেন। তৎকালে জয়দেবপুর নিবাসিনী "কুসুমকুমারী" নাম্নী জনৈকা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। কুসুমের সঙ্গে তাঁহাব কতবার যে দেখা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

জয়দেবপুরের রাজশ্মশানের সন্নিকটস্থ জলাশয়েব ঘাটে স্থানীয় রমণিগণ প্রত্যহ ঘটকক্ষে জল ভরিতে আসিত। উক্ত শ্মশানের নাম "তপোবন"। গোবিন্দদাসের বহু কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে। অনেক সময় সন্ধ্যাকালে কবি, সেই তপোবনে গিয়া বসিতেন এবং পল্লীবালিকার দল জল লইতে আসিলে মাঝে মাঝে কুসুমের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত। ইহা ১২৯৮ সনের কথা।

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যক্রমে জানি না, জয়দেবপুর হইতে ১২৯৮ সনে নির্ব্বাসিত হওয়ার পর, কবির সঙ্গে কুসুমের বিবাহ-প্রস্তাব স্থগিত হয়। উক্ত কুসুমের সম্পর্কে কবি গোবিন্দদাস ভাবি প্রণয়ের যে সকল স্বপ্ন রচনা করিতেন, কবি কল্পনায় তাহা তাঁহাব কাব্যের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র কুসুমকে কল্পনায় বিবাহ করিতেছেন,—

"জ্বলিছে অমৃত দীপ চন্দ্র তারকায়,
নীল চন্দ্রাতপ তলে গগনের গায়।
কোকিলা দিতেছে উলু, চিলাইর কুলু কুলু
ললিত পঞ্চমে গায় শ্যামা পাপিয়ায়!
সে পবিত্র মহোৎসবে, জগৎবাসীরা সবে
আতর গোলাপ বায়ু আপনি বিলায়!
কামিনী চামেলি বেলী, এয়ো তারা সবে মিলি,
মন্দিরে মঙ্গল শঙ্খ বাজে উভরায়!

* * * *

হায় সে মাহেন্দ্রক্ষণ, এ জীবনে অতুলন,
সে অমৃতযোগ দৈবযোগে পাওয়া যায়।
নয়নে নয়ন দিয়া, দু'জনে করিনু বিয়া
সেই সন্ধ্যাকালে সেই কদম তলায়।
দিদি ডাকে 'ও কুসুম বাড়ী আয়, আয়'!"

এইভাবে কবির কাল্পনিক উদ্বাহ হইয়াছিল। তিনি ভাবি প্রেমের যে সকল প্রাণোন্মাদক স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ভাষা দিয়া মূর্ত্তিমতি করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কুসুম সম্পর্কান্বিত কবিতাগুলি "কুঙ্কুম" কাব্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "ভুল হয়েছিল" কবিতাও সেই কুসুমের উদ্দেশ্যে বিরচিত। ইহাও তাঁহার স্বপ্নের এক অংশ বিশেষ।

কুসুম সম্পর্কিত কবিতা ভিন্ন তাঁহার কাব্যে আর অধিক পরকীয়া প্রেমের কবিতা নাই। তবে কুরুচি-দোষ-দুষ্ট কবিতা আছে। বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিতে তিনি, অনেক স্থানে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। জগতের অধিকাংশ কবিই এই দোষ হইতে বিমুক্ত নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের অধিকাংশ কবিই এজন্য দায়ী। প্রতিচীর কবিকুলেরও অনেকেই এই দোষে দোষী।

পাশ্চাত্য 'আর্টের' অন্ধ অনুকরণে বিরচিত, আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় প্রেমের বিকট গন্ধে আমাদের রুচি এরূপ কলুষিত হইয়াছে যে, কবি গোবিন্দদাসের সরল, বাস্তব দাম্পত্যপ্রেমের কবিতাগুলিকেও আমরা পরকীয়া প্রেমের কবিতা বলিয়া আখ্যাত করি।

"কুঙ্কুম" কাব্য হইতে আমরা তাঁহার একটি আকুল প্রেমের কবিতাংশ উদ্ধৃত করিব। রুচিবাগীশের দল ইহাকে হয়ত পরকীয়া প্রেমের কবিতা বলিবেন; কিন্তু তাহাই কি?

"কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের রাণী,
হৃদয়-নন্দনে দেবি, যে চরণ নিত্য সেবী,
কই দেখিলাম সেই চরণ দু'খানি!
একমাত্র অদ্বিতীয়, প্রাণের অধিক প্রিয়,
জগতে তোমাবে বই আর নাহি জানি!
কই এলোমেলো চুল, কই সে বকুল ফুল,
কই সে আকুল ভাষা—আধ আধ বাণী।
আধ ঘোমটায় ঢাকা, আধ আধ লাজ মাখা,
কই গো সে দয়াময়ী দেবী বীণাপাণি!
কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের রাণি!"

গোবিন্দদাসের এজাতীয় সঙ্গীতে প্রাণ স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুর চিন্তা-লহরী প্রাণের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া উঠে; আর কবির কথাগুলি বীণাধ্বনির মত হৃদয়ের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে থাকে। গোবিন্দচন্দ্রের এই প্রকার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে কবিগুরু বিহারী-লালের কোন কোন অতুলনীয় সঙ্গীত মনে জাগিয়া উঠে।

কবি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা যে একেবারেই নাই এমন কথা আমরা বলিব না। শ্লীলতা অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করে। একজনের কাছে যাহা অশ্লীল, অপরের কাছে তাহা বিপরীত। যাহাকে আমরা অশ্লীল বলি, ভাষার গণ্ডগোলে, তাহার খানিকটা ঢাকিয়া আর বাকীটুকু খুলিয়া দেখাইবার যে চেষ্টা, তাহাই সাহিত্যে অশ্লীলতা বলিয়া প্রমাণিত হওয়া উচিত। একটি নগ্নমূর্ত্তি দেখিলে, সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইতে হয়। আর অর্দ্ধ অনাবৃত, অর্দ্ধ উলঙ্গ মূর্ত্তি মনের ভিতর দুরাকাঙ্ক্ষার ভাবই জাগাইয়া দেয়। স্থূল কথা এই যে, কবি গোবিন্দদাসের কবিতার যেটুকুকে আমরা অশ্লীল বলি, তাহাতে

বৈচিত্র্য আছে। তিনি কবি-শিল্পী ছিলেন। সত্যকে আশ্রয় করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই খাঁটিভাবে আঁকিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "বৈশাখে" কবিতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সচরাচর সংঘটিত পল্লীচিত্র অবলম্বনে বিরচিত।

একদা বৈশাখ মাসে প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল। ঊর্দ্ধে, কালমেঘে সমগ্র গগন আচ্ছন্ন। যেন প্রলয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্ফীত বক্ষে আকাশে ছুটিতেছিল। নিম্নে, পৃথিবী ঘন মেঘান্ধকারে আবৃত। ভীষণ শব্দে বাতাস বহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। জড় প্রকৃতির প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড—বৃক্ষবাজী দুদোল্যমান—ফল সমূহ ভূপতিত,—বিপর্য্যস্ত কাণ্ড!

এহেন দুর্য্যোগে এক পল্লী তরুণী 'আম কুড়াইতে' বাহির হইয়াছে। পবনের প্রবল বেগে তাহার পরিধেয় বসনখানি বিস্রস্ত। বক্ষঃবাস স্থানচ্যুত হইলেও, ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে দ্রুতপদে দৌড়াইতে লাগিল। আর, গৃহের অলিন্দে বসিয়া তাহার বৃদ্ধপতি সে অম্লান কুসুমের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইতেছিলেন। ইহাই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে।

পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে জল ঝড়ের ভিতর, এইভাবে 'আম কুড়াইতে' যাওয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। বালিকারা এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক যৌবনোন্মুখ তরুণীরাও অতি উৎসাহের সহিত 'আম কুড়াইতে' বাহির হয়। সে সময় তাহাদেব কোমল আননে যে সরলতা এবং উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, তাহা কবির প্রাণস্পর্শী বটে! সরল না হইলে—মনের ভিতর দ্বিধা ও সঙ্কোচ জন্মিলে, কে এমন ভাবে উন্মেষিত যৌবনে, দৌড়াদৌড়ি করিয়া বালিকা-সুলভ চাপল্যে যোগদান করিতে পারে? সহরে, পল্লী বালিকার এই সারল্য, বনের হরিণীর মত একটা স্বাধীনভাব, আশা করা যায় না। পল্লীজীবনের এবম্প্রকার স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করিতে কবি গোবিন্দদাস পরিপক্ক ছিলেন।

তারপর "উলঙ্গ রমণী" কবিতার কথা বলিব। ইহাতে শ্মশানে রমণী দগ্ধা হইতেছেন। ইহাই সে কবিতা-বর্ণিত অন্যান্য চিত্রের মধ্যে প্রধান। রমণী নগ্নদেহ—পৃথিবীর কামনা বাসনা পরিশূন্য—নয়ন স্তব্ধ—সে মুক্তরূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত। পত্নী সারদাসুন্দরীর কথা বুঝি বা কবির মনে জাগিতেছিল। নতুবা এমন অপূর্ব্ব চিত্র ফুটিল কেমন করিয়া? ইহাতে দুর্নীতির নাম গন্ধ নাই, অশ্লীলতা ত দূরের কথা। যিনি ইহার প্রকৃত শিল্প অনুভব করিতে না পারিয়াছেন– কবি-কল্পনায় জগদতীত এক অজ্ঞাত রাজ্যের কথা চিন্তা না করিয়াছেন—মানবের পরিণাম না ভাবিয়াছেন, তিনি এ কবিতার নিন্দা করিবেন আশ্চর্য্য কি?

"সে লাবণ্য অতি মুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত,
চৌদিকে বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্বনি!
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ,
নির্ব্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি।
নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, যৌবনের জ্যোৎস্না তার,
নিত্য বুদ্ধ সত্য শুদ্ধ আনন্দরূপিণী!
সে মুক্ত রূপের কাছে, সৌন্দর্য্য কোথায় আছে?
লাবণ্যে ভাসিয়া গেছে আকাশ অবনী!"

এতদ্ভিন্ন, কবি গোবিন্দদাসের "এই এক নূতন খেলা", "ফুল", "জালিয়া যুবতী", "মাঘে", "কে বেশী সুন্দর?" প্রভৃতি কবিতায় অশ্লীলতার ছায়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনার পর এযুগে এমন লেখা আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোবিন্দদাস স্বভাব-কবি – সামাজিক জীবনের কবি। গোবিন্দচন্দ্র প্রকৃত শিল্পী। সুতরাং তাঁহার কবিতায় পল্লীজীবনের খাঁটি আলেখ্য আবির্ভূত হওয়া আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃত কবি-শিল্পী জগতের সত্য অবলম্বন করিয়া তন্ময়চিত্তে চিত্রাঙ্কণ করিয়া থাকেন। এজন্য, সময় সময় কবি-শিল্পীর রুচি, নীতিজ্ঞের নিকট দূষণীয়। শিল্পী এবং নীতিবেত্তার এইখানেই পার্থক্য!

রমণী সৌন্দর্য্যের যে সকল অভিনব বাস্তব চিত্র, সমাজের সর্ব্বত্র সচরাচব দেদীপ্যমান, তাহার প্রত্যেকটি কবিত্বালঙ্কার-বিভূষিত মধুময়ী ভাষায় বর্ণনা করা অসঙ্গত একথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কবি গোবিন্দদাসেব যে সকল বচনা কাহারও কাহাবও নিকট অশ্লীল এবং কুরুচি-দোষ-দুষ্ট,তাহাই আবাব কাহারও কাহারও মতে মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন। পবিপক্ক লেখক ছিলেন বলিয়া তাঁহাব অশ্লীল বচনাও শ্রুতিসুখাবহ, অথচ বর্ণনাভঙ্গীও কৌশল-পরিপূর্ণ। এস্থলে আমরা তাঁহাব একটি মাত্র কবিতাংশ উদ্ধৃত করিব।

'মাঘের মধ্যাহ্ন মেঘে শুভ্র অন্ধকার,
শীতে যেন পাতিয়াছে শ্বেত সিংহাসন,
দাপটে দক্ষিণে সূর্য্য ঠেলিযে তাহার
নমিযা সহস্র করে বন্দিছে চরণ।
সুকোমল পরিষ্কার শ্বেত শয্যাতল,
আকণ্ঠ আবরি লেপে শুইয়াছে নারী।
ক্ষিরোদে ফুটেছে যেন হেম শতদল,
বিমল উজ্জ্বল গৃহ লাবণ্য তাহারি।
মজ্জাগত লজ্জানত শয্যাগত নারী
শশব্যস্ত রোধে হস্ত মৃদু কম্পমান,
অলকার রত্নাগার যক্ষ রক্ষাকারী
যার জন্য সে ত ধন্য সে ত পুণ্যবান!
দরিদ্রের চির আশা স্থিরদৃষ্টি থাকে
যতনে রক্ষিত রাজ-রতন মন্দিরে,

স্বপনে বাড়ায় হস্ত, কে রোধিবে তাকে,
রাক্ষসে সুবর্ণ-লঙ্কা রাখে যদি ঘিরে!”

যে গোবিন্দচন্দ্রের লেখনীনিঃসৃত প্রবল শোকসঙ্গীত মন উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয়—যাঁহার দেশাত্মবোধের কবিতাবলী ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, শিবাজী প্রভৃতির কীর্ত্তিকথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তাঁহার বিরচিত এজাতীয় কবিতা পাঠ করিতে মনের ভিতর কৌতূহল জাগিয়া উঠে। অশ্লীল হইলেও এ সকল কবিতা লেখকের প্রভূত রচনাশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় দাস-কবি যেন এযুগের ভারতচন্দ্র।

তাঁহার এ শ্রেণীর কবিতা কেহ কেহ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক বলিয়া থাকেন। কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা মনুষ্যহৃদয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ নারীচরিত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে না যে, এই সকল কবিতা কামমূলক নহে; পরন্তু, কবি নারীজাতির কয়েকখানি বিভিন্ন প্রকারের আলেখ্য কাব্যাকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

গোবিন্দদাস তাঁহার কবিতায়, সৌন্দর্য্যের আকর রমণীর অভিনব চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট চিত্রকলার সঙ্গে এ সকল কবিতা তুলনীয়। চিত্রে যাহা রেখায় অভিব্যক্ত, কবিতায় তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশিত। এইরূপ প্রাণময়ী ভাষাই Art.

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা “ঢাকা প্রকাশে” প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে কবি গোবিন্দদাসের প্রতি যে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অতীব বিস্ময়জনক। প্রবন্ধে লিখিত ছিল যে, গোবিন্দদাসের কবিতা যখন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীর নিকট পাঠ করা অসাধ্য, তখন সে কবিতার মূল্য কিছুই নাই এবং তাহা আবর্জ্জনার সঙ্গে তুলনীয়।

আমরা এ মতের ঘোর বিরোধী। কোন কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি এ কথার সমর্থন করিবেন না। মানুষের যত রকম স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, তাহা সাহিত্যে প্রকাশিত হওয়া আপত্তিজনক নহে। সাহিত্যে তাহা অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু, Immorality—বা দুর্নীতিকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দেওয়া সাহিত্যের অনুমোদিত নহে।

গুরুজনের কাছে আবৃত্তি করিতে না পারিলেই সে রচনা মূল্যহীন, এমন কথা বলা অযৌক্তিক।

কালিদাসের "কুমারসম্ভবে"র স্থানবিশেষ কে কবে জনক জননীর নিকট পাঠ করিয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের সমস্ত অংশই কি অবলীলাক্রমে পূজনীয় ব্যক্তিগণের কাছে আবৃত্তি করা যায়? আর, পাঠ করিবার আবশ্যকতাই বা কি? এজন্য কেহ কালিদাস অথবা বঙ্কিমচন্দ্রকে আবর্জ্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করিতে চাহেন, এমন কথা শুনি নাই।

"ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকার এই মন্তব্য যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে জয়দেব, ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কবিগণের কাব্যসমূহের স্থান কোথায় বলা যায় না। যদি গোবিন্দদাসের,

"আজিও দেখিতে তারে হইয়ে অস্থির,
সেই ঘাটে চেয়ে থাকি সেই সরসীর,
তাহার চরণ স্পৃষ্ট তীরের সে ধূলি
দুই হাতে বুকে মাখি আকুলি ব্যাকুলি।"

এই দাম্পত্য প্রেমমূলক প্রেম সঙ্গীতটি অশ্রাব্য এবং অপাঠ্য হয় তবে,

"একটি হাসির তরে ছিল মুখ চেয়ে
একটি ইঙ্গিত পেলে আসিত যে ধেয়ে,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন"

ইহা পাঠকগণ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। আমাদের বিশ্বাস, ইহা একটি খাঁটি প্রেম সঙ্গীত, পবিত্র প্রেমের আকুল উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। ইহার রচয়িতা এ যুগেব বঙ্গসাহিত্যে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন।

আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া,—

"আয় পাখী, আয় বুকে!
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্, নাচ্, নাচ্ সুখে!
বড় দুঃখ মনে বনের বিহগ,
কিছু তুই বুঝিলি না।
এমন কপোল অমিয়মাখা
চুমিলি তবুও ঝপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্ কি না!
প্রতি পাখা তোব উঠেনি শিহরি?
পুলকে হরষে মরমেতে মবি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না!?"

পাঠ কবিতে মনেব অনুভূতি কি ভাবে জাগিয়া উঠে, তাহাও বিবেচনার বিষয়। এ জাতীয় কবিতাকে নবরসের কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে?

কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমের কবিতায় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার কথা

আমরা অস্বীকার না করিয়া পারি না। পতি-পত্নীর মধ্যে যে একটা যৌন সম্বন্ধ আছে, কবি তাহা বাদ দিতে পারেন নাই এবং তাহার পরিণতি কোথায়, তাহাও তিনি এমন স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন, যাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার তরুণ বয়সে বিরচিত "কলঙ্কী শশাঙ্ক" কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"সে সলাজ হাসিমুখ, কিবা লাল টুক্ টুক্!
খেয়েছি স্বর্গের সুধা—প্রত্যেক চুম্বনে,
যতদিন বেঁচে থাকি—রহিবেক মনে।
উন্মত্ত ঝটিকা দিয়া, আস্ফালিয়া—আন্দোলিয়া,
ঢেলে দিল পদ্মবন প্রতি আলিঙ্গনে!
যতদিন বেঁচে থাকি—রহিবেক মনে।"

রুচিবাগীশদের কাছে ইহা সম্ভোগের চিত্র—নিতান্ত অশ্লীল এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা দোষ-দুষ্ট। কিন্তু আমরা বলি, ইহাতে, দাম্পত্য জীবনের যে যৌন সম্বন্ধ আছে, তাহাই কবি সরল ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা ভালবাসার এবং প্রেমের কবিতা। পতির সঙ্গে পত্নীর দেহের যে সম্বন্ধ আছে, কবি গোবিন্দদাস তাহা বাদ দিতে চাহেন না। আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি যে, কবি গোবিন্দদাস বর্ত্তমান যুগের কবিদের মত দুর্ব্বোধ্য কবিতা রচনা করেন নাই। শৃঙ্গার রসের কথা ভাষার অতি সূক্ষ্ম আবরণে ঢাকিয়া প্রকাশ করাটা কবি গোবিন্দদাস অন্যায় মনে করিতেন। "আমার ভালবাসা" কবিতাও একথার নিদর্শন।

গোবিন্দদাসের নৈতিক চরিত্রে কোন বিকলতা ছিল বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং তাঁহার কবিতায় পরকীয়া প্রেমের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার ছায়া পড়িতে পারে নাই। একবার "নব্যভারত" সম্পাদক

তাঁহার মৃত্যুর পর লিখিয়াছিলেন, "আমরা শতকণ্ঠে বলিব তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান ব্যক্তি আমবা অতি অল্পই দেখিয়াছি।"

সামাজিক জীবনের কবি—দাম্পত্য প্রেমের কবি—গোবিন্দদাস, পতি-পত্নীর যৌন সম্বন্ধ লইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা এবং লালসার বীভৎস চিত্র যদি কেহ দেখিতে পা'ন্, তবে তাঁহাদের রুচির প্রশংসা করা যায় না।

১৩১৭ সনের চৈত্র সংখ্যা "নব্যভারতে" কবি গোবিন্দদাসের "কবে মানুষ মরে গেছে" নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সনের "প্রবাসী" ইহার সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন,—

"এই কবিতাটির অর্দ্ধেক বাদ দিয়া, দুই চারিটা কথা বদ্‌লাইয়া দিয়া, প্রকাশ করিলে কবিতাটি অনিন্দ্য হইত; যাহাও আছে তাহাও একখানি করুণ চিত্রের মত সুন্দর।" "প্রবাসীব" সমালোচনা পাঠে অনুসন্ধিৎসু হইয়া আমরা দাস-কবিকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন ;—

"জয়দেবপুরে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। আমাব জিনিস পত্র, পুস্তক প্রভৃতি সেই বাড়ীতেই ছিল। স্ত্রীব যখন মৃত্যু হয় তখন আমি ময়মনসিংহে চাকবি করিতাম। কন্যা মণিকে দেখিতে সময় সময় জয়দেবপুরে গিয়াছি। একদা জয়দেবপুরে গিয়া "কবে মানুষ মবে গেছে" কবিতাটির দেড় ষ্টেঞ্জা মাত্র লিখিয়া, অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াছিলাম। ইহার পর আমি নির্ব্বাসিত হই। কোথায় সে কবিতাংশ রাখিয়াছিলাম, তাহা আর স্মরণ ছিল না। যখন নির্ব্বাসনের পর পুনরায় জয়দেবপুর যাই ও আমার পুস্তকের বাক্‌সে কি কি পুস্তক আছে খুঁজিতে আরম্ভ করি, তখন ঐ অসম্পূর্ণ কবিতাটি পাইয়াছিলাম। পরে উহা সম্পূর্ণ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি।" —অপ্রকাশিত পত্র

ইহাও পরকীয়া প্রেমের কবিতা বলিয়া অভিহিত হইবে কি না বলিতে পারি না। একটু উদাহরণ আবশ্যক ;—

"মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিউরে উঠে কায়।
এইখানে সে শুইত খাটে
পদ্মমুখী রাণার ঠাটে,
হৃদ কোমল পদ্মসম ধবল বিছানায়।
আজো দেখি দিন দুপুরে,
তেম্নি শুযে ভঙ্গিভরে,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা চোখে ভাঙ্গা ঘুমে চায়,
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়!

*　　*　　*　　*

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়।
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল ধবল কমল যেন শরৎ সুষমায়।
আজো আমি দিন দু'পুরে
আয়নাতে তার চাই না ডরে
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়,
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়!"

আমরা আবারও বলি, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাবলী মৌলিক, স্বাভাবিক এবং আবর্জ্জনাবিহীন। স্বতঃপ্রবাহিতা পার্ব্বত্য নির্ঝরের ন্যায় তাঁহার রচনার গতি অপ্রতিহত। তিনি একটিও যে দুর্ব্বোধ্য কবিতা রচনা করেন নাই, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। অথচ, গোবিন্দচন্দ্রের প্রধান গুণ—বর্ণনার দীপ্তি সম্পাদন।

(২) শোক সঙ্গীতঃ—দুঃখবাদ কবি গোবিন্দচন্দ্রের রচনায় মজ্জাগত। দারিদ্র্য, ব্যাধিক্লেশ, নানাবিধ দুঃখ এবং শোক, কবি গোবিন্দদাসের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছে। সুতরাং, নিরাশা ও জীবনে বিতৃষ্ণা, অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপে তাঁহার বহু কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নির্ব্বাসন অনলদগ্ধ, অত্যাচার জর্জ্জরিত কবির প্রাণের হাহাকারে তাঁহার কাব্যের অনেকটা অংশ পরিপূর্ণ হইয়া আছে। শৈশবে পিতার অভাব, যৌবনে পত্নীশোক ও সন্তাননাশ এবং বার্দ্ধক্যে নিরন্ন অবস্থা প্রভৃতি কবি গোবিন্দদাসের দুঃখের মূলীভূত কারণ। এইজন্যই কবি গোবিন্দের কাব্যগুলি, এমন কি সমগ্র জীবন পর্য্যন্ত pessimistic. ইহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে ঋণ করা pessimism নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব। কবি, ইচ্ছা করিয়াও দুঃখবাদের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। স্বভাব-কবির দুঃখ-বাদের ইহাই কারণ বলিয়া আমরা জানি।

কবি গোবিন্দদাসের শোক সঙ্গীত পর্য্যায়ের কবিতাবলী বড় করুণ– বড় মর্ম্মস্পর্শী। পাঠ করিতে করিতে সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া উঠে এবং কোথা হইতে কাতরতা আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া দেয়! উদাহরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সারদা! এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া,
আজি কতদিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে,
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া,
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশান শয্যায় হেন,
অযতনে ছাই ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?

* * *

ওঠ, ওঠ!
এই যে এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া
এই যে এসেছি দেশে, উদাসী বিদেশী বেশে,
তোমারে হৃদয় রাণি, দেখিব বলিয়া!
না শুনে তোমার কথা, না বুঝে তোমার ব্যথা,
বিদেশে গেছি যে দেবি তোমারে ছাড়িয়া,
সেই মানে অভিমানে, পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণে,
ছাইভস্মে চন্দ্রমুখ আছ লুকাইয়া?

* * *

ওঠ, ওঠ, আব কেন—চল যাই ঘরে,
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে?
কে কোথা কুলের নারী, ছেড়ে এসে ঘর বাড়ী,
একা এসে শুয়ে থাকে চিতার উপরে?

* * *

বিদেশে যাব না আর ছাড়িয়া তোমায়,
ওঠ মান পরিহরি, বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ওঠ গো করুণাময়ি স্নেহ মমতায়!
আর না বিদেশে যা'ব, না হয় মাগিয়া খা'ব,
ধিক্ সে দাসত্বে ধিক্ শত ধিক্ তায়!

* * *

ওঠ দেবি দয়াময়ি, চল যাই ঘরে,
ওঠ ভগ্নি, ওঠ ভাই, ওঠ জায়া ঘরে যাই,
লহ জননীর যত্নে পিতার আদরে!

সকলের স্নেহসিন্ধু, উজলিয়া উঠ ইন্দু
তোমার অমৃতময় প্রেমময় করে!
*　　　*　　　*
ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার
প্রীতির প্রসন্ন মুখে, লও সে উদার বুকে,
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা অত্যাচার,
দুঃখীরে করিতে স্নেহ, জগতে নাহি যে কেহ,
কেবল তুমিই আছ প্রেম-পারাবার,
ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার।
*　　　*　　　*
ওঠ দেবি দয়াময়ি সারদা আমার,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই, ওঠ চল, ঘরে যাই,
থাকিবে শ্মশানে শুয়ে কত কাল আর?
দিন দিন প্রতিদিন, ক্রমশঃ হতেছে লীন,
মাটীতে মিশিল প্রায় চিতার অঙ্গার!
তবু কি যায়নি মান, হয়নি প্রসন্ন প্রাণ,
শুনিয়া শোননা কিগো এত হাহাকার?
অঙ্গারের চেয়ে মান এতই অঙ্গার?"

একদিন জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত কবি গোবিন্দদাস, যে নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে করা যায় না। প্রাণের অপরিসীম জ্বালায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল বাড়ী, চিহ্নমাত্র নাহি তারি,
সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হয়ে গেছে ছাই!

রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই!

* * *

যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর
সে দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই।
আমারি—আমারি দেশে, আমারে খেদায় এসে,
আমারি মায়ের কোলে নাহি মোর ঠাঁই!

* * *

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নর নারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর!
আছিল নিঃশঙ্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন্ সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর!

* * *

সে দেশে আছিল ভাই দেব নিকেতন,
ধার্ম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ!
নাহি ছিল অবিচার, নাহি ছিল ব্যভিচার,
নাহি ছিল অনাথার করুণ ক্রন্দন!
যার ক্ষেত সে অবশ্য, পাইত তাহার শস্য,
পারিত না লুঠে নিতে চোর মুন্সিগণ!
সে যে ছিল দেবপুর দেব নিকেতন!

* * *

যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর,
সেখানে ছিল না পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ,
সে দেশে ছিল না ভাই দানব অসুর!
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাঁচিত প্রাণে,—
শ্রাবণের ধারা সম প্রভূত প্রচুর!
বিনা দোষে নির্ব্বাসিত, কারে না করিয়া দিত,
হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত না চুর!

* * *

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নর নারী,
শোকে দুঃখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর!
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন্ সতীত্বহারা করে ধড় ফড়!
হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর!
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর?"

এতদ্ভিন্ন, প্রিয়তমা পত্নীর হৃদয়োদ্ভেদক অকাল তিরোধানে তিনি বহুবিধ শোক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(৩) বিদ্রূপ রসাত্মক কবিতা।—

কবি গোবিন্দদাস বিদ্রূপ রসাত্মক কবিতা রচনায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাগুলি, ইংরেজিতে যাহাকে Stoical Satire বলে সেই পর্য্যায়ের। অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, এই জাতীয় কবিতার কাজ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ভূরি ভূরি এই প্রকারের কবিতা আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের

বিদ্রূপ রসাত্মক রচনা "হুতোম প্যাঁচার নক্সা", "রুচি বিকার" প্রভৃতি অপেক্ষাও কবি গোবিন্দচন্দ্রের ব্যঙ্গ, অনলদনল সদৃশ দুঃসহ।

কবি গোবিন্দদাসের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য "মগের মুলুক"। গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি।

গোবিন্দচন্দ্র একদা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াও কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবির মুখে শুনিয়াছি যে, এজন্য ব্রাহ্মসমাজের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। এমন কি "নব্যভারত" সম্পাদককেও এজন্য একদা বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার নিজের স্বাধীন মতামত, খুলিয়া লিখিতে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না, ফলে তিনি অনেক বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন। যাহা তিনি ভাল মনে করিতেন তাহাই লিখিতেন; লোকে কি বলিবে, সেই ভয়ে তিনি কোনদিনই লেখনীকে সম্বরণ করিতে পারেন নাই। প্রায় ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে "নব্যভারত" সম্পাদক কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে জাগিতেছে। সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন,—

"গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ব্যক্তি, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, এজন্য এক শ্রেণীর হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি রুচি ধরিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাব্য-জগৎ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। রবীন্দ্রনাথের রুচি ধরিয়া ভয়ে কেহ কথা বলিতে সাহসী হন না, কিন্তু দরিদ্র গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা ঘুরাইতেছেন। গোবিন্দচন্দ্র মনের কথা লেখেন, প্রাণ খোলা, ভাব খোলা,—কোন ভাব তিনি মানেন না, উপদেশের কথা শুনেন না। এ বড় বিষম দায়! গোবিন্দচন্দ্রকে পরামর্শ উপদেশ দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, গোবিন্দচন্দ্র কিছুতেই আপন মনের কাহিনী বলিতে ছাড়িবেন না। আমরা গোবিন্দচন্দ্রের এই স্বভাবের বড়ই পক্ষ-

পাতী। তিনি কাহারও কথায় চলিতে চাহেন না। ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে, পাখি গায়, সাগর গর্জ্জন করে, কাহারও কথ মানে না। কবি সেই তানে যখন তান মিশাইয়া জগতের উপরে উঠেন, তখন তিনি কেন জগতের কথা শুনিবেন? গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাব কবি।"

১৩১৮ সনের বৈশাখ সংখ্যা "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় তাঁহার "পদ্ম" শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহাও ব্যঙ্গ কবিতা। এতৎপ্রসঙ্গে সমালোচনায় সুবিখ্যাত সাময়িক "প্রবাসী" লিখিয়াছিলেন, –

'শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "পদ্ম" কবিতায় স্বভাব-কবির মাধুর্য্য ও সা ল্য নাই এবং তাঁহার স্বকীয় বিশেষত্ব দাশুরায়ী ভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ছদ্মবেশী "পদ্মকে" উপলক্ষ করিয়া কবি কোন ছদ্মবেশী মানুষকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"

"প্রবাসী" ঠিকই ধরিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র তদানীন্তন ভাওয়াল রাজের জনৈক কর্ম্মচারীর উদ্দেশ্যে এই বিদ্রূপ কবিতা রচনা করেন।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রূপ রসাত্মক কবিতা আছে। দুইটি কবিতাই "নব্যভারতে" মুদ্রিত হইয়াছিল। একটি "বিক্রমপুরে বসন্ত", অপরটি "বিচিত্রপুর"! কবিতাদ্বয়ে তিনি যে, বিক্রমপুরের কোন দোষকীর্ত্তন করেন নাই, এমন কথা আমরা বলি না। বিক্রমপুর যে কেবল দোষেরই আকর একথা কেহ বলিতে পারে না। শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রতিভায় যে বিক্রমপুর বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে,—যে বিক্রমপুরের অতীত গৌরব কাহিনীর কথা, ইতিহাস উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, তাহার নিন্দা গোবিন্দদাসের মত একজন আশৈশব দেশ-ভক্ত কবির মুখে শোভা পায় না।

তবে তিনি কেন এমন কবিতা লিখিলেন? আমরা বলিব, তিনি

বিক্রমপুরকে কখনই আদর্শ ধরিয়া এ সকল কবিতা লেখেন নাই। তিনি অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া, মর্ম্মজ্বালায় দগ্ধ হইয়াই উক্ত কবিতাদ্বয় রচনা করেন।

তন্মধ্যে "বিক্রমপুরে বসন্ত" নিছক্ ব্যক্তিগত কবিতা। গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে ইহার উৎপত্তির কথা লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কবিতা "বিচিত্রপুর"। কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহাতেও সমগ্র বিক্রমপুরের কুৎসা প্রচার করা হইয়াছে। একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কবিতার প্রারম্ভে "বিচিত্রপুরের" যে ভৌগলিক সংস্থান কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত বিক্রমপুরকে না বুঝাইয়া কবির পল্লীগ্রামকেই দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃত কথাও তাহাই। যাহাদের নিকট অযথা উৎপীড়িত হইয়া তিনি অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে অপ্রীতি-কর দুই চারিটি কথা লিখিয়া কবিজনোচিত প্রশ্রয় অবলম্বন করা, তাঁহার মত মুখর এবং স্পষ্টবাদী কবির পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে—একথা বলা যায় না কি? "সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" এ কথার সমর্থন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, —সম্ভবতঃ তিনি তাহা পারিতেন না। তবে ইহা তাঁহার মত কবির পক্ষে না লিখিলেই ভাল ছিল। সমগ্র বিক্রমপুর তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় না হইলেও, ঐদেশীয় জনসাধারণ "বিচিত্রপুর" পাঠ করিলে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত না হইয়া পারেন না। দুই এক স্থলে কবি এমন তীব্র ও কটু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা নিতান্তই মর্ম্মঘাতী। সেকালের 'কবির দলের' আসরে এইরূপ কবিতা অবাধে চলিয়া যাইত, শ্রোতারা শুনিয়া হয়ত বাহবা দিত। কিন্তু একালের গীতি-কবিতার আসরে ইহার সার্থকতা কম, বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্রের মত মধুবর্ষিণী এবং

প্রাণোন্মাদিনী কবিতা লেখকের পক্ষে এই কবিতাগুলি রচনা করা অশোভনীয় ও অনাবশ্যক।

ভাওয়ালের নির্ব্বাসিত কবি শান্তিতে জীবন যাপন করিতে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল কবিতা রচনার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় পল্লীগ্রামে কি রকম ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহাও অনুসন্ধান যোগ্য। তিনি ঐ দেশে পদার্পণ করিয়াই ত উল্লিখিত কবিতাগুলি লিখেন নাই! বরঞ্চ তাহার জয়গানই করিয়াছিলেন।

যে পল্লীগ্রামে সরোজিনী নায়ডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় অনাদৃত, ঢাকার স্কুল ইন্‌স্পেক্টার মথুরামোহন উপেক্ষিত, তথায় গোবিন্দচন্দ্রও উৎপীড়িত। সেই গ্রামের প্রতি গোবিন্দচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্টই একখানা পত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

১৩১৯ সনের ২৫শে শ্রাবণ জয়দেবপুর হইতে তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মদেশে লিখিয়াছিলেন ;—

"বলিতে কি এবারের ব্যারামে আমার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি আর বেশীদিন বাঁচিবার আশা কিছুতেই করিতে পারিতেছি না। জ্যোতির্ব্বিদের কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। একটু মাথা ধরিলেও যেন আমি ছ' মাসের কাহিল হইয়া পড়ি, এমনি বোধ হয়। এইজন্য অসহায় নাবালক ছেলেদের কথা ভাবিয়া বড় আকুল হইয়া পড়ি, আর বড় কষ্ট হয়। পদ্মা ঘনাইয়া আসিতেছে, এই সময় অন্যত্র একটা বাড়ীর যোগাড় করিতে পারিলে, অনেকটা দুর্ভাবনা দূর হইত। ঢাকায় একটা বাড়ীর জন্য অনেকের খোসামদ করিতেছি, অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না। কেবল পদ্মা বলিয়া নহে, আমার মত অসহায় অবস্থায় শত্রু-

পূর্ণ বামনগাঁয় * বাস করা স্বতঃই বিপদজনক। মরিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করে না, শৈব্যার মত মা মরা সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেও ডোমের অধম ডোমগুলি যেখানে ফিরিয়া চাহে না—বরং বিপন্ন দেখিয়া তামাসা দেখে, সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও বাস করিতে ইচ্ছা নাই।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

কবি গোবিন্দদাসকে, তাঁহার স্বগ্রামবাসী কায়স্থ সমাজের দলপতিগণ একদিন অতি নিদারুণভাবে সমাজচ্যুত করিয়া, নির্ম্মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আভিজাত্যের উৎকট অভিমানে সমাজপতিগণ, দরিদ্র কবি গোবিন্দচন্দ্রকে নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। সম্ভবতঃ কবি গোবিন্দের প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল না।

কবির মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১৭ সনের ৯ই জুলাই, ব্রাহ্মণ গ্রামের কায়স্থ সমাজকর্ত্তাগণ, গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সমাজের তদানীন্তন সভাপতি মহাশয় লিখিত একখানি পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠে, কবি গোবিন্দদাসের লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত অবস্থার কথা উপলব্ধি করা যায়। ঢাকানগরী হইতে আমাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু এই পত্রখানি প্রেরণ করেন। এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

"আপনাদের পত্রানুসারে আমরা জয়দেবপুর নিবাসী গোবিন্দদাসকে সমাজে গ্রহণ করি নাই। ক্রিয়াকর্ম্মের পুরোহিত বন্ধ করিয়াছিলাম— এখনও আমরা তাহাকে গ্রহণ করি নাই। পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগাঁয়ের ঘোষ-দিগের মধ্যে চন্দ্রকান্ত ঘোষের পুত্র প্রভাত ঘোষ, রূপচন্দ্র ঘোষের পুত্র হরনাথ ঘোষ তাহাকে চল্ করিতেছে।

* বামনগাঁ,—ব্রাহ্মণ গ্রাম শব্দের অপভ্রংশ।

তাহার পুত্রকে দেবীপ্রসন্ন বাবু,—যাঁহার বাড়ী উলপুর—তাঁহার জ্ঞাতি এক চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করাইয়াছে। ঐ বিবাহে উক্ত ঘোষদ্বয় বরযাত্রীভাবে কলিকাতায় যাইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। আমাদের পশ্চিম ব্রাহ্মণগাঁয়ের কেহ গোবিন্দদাসকে সমাজে গ্রহণ করে নাই। পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগাঁয়ের কোন ঘোষ, ঢাকাতে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতে না পারে সে চেষ্টা করিবেন। তাহারা সকলেই শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বী।

আমাদের পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গোবিন্দদাসের পুরোহিত হইয়াছে। তাহাকে সারস্বত সভার নিমন্ত্রণ হইতে বাদ দিতে পারিলে ভাল হয়।" * *

যে কথা বলিতেছিলাম। গোবিন্দচন্দ্রের বিরচিত "বিচিত্রপুর" কবিতা প্রকাশিত হইলে, ঢাকাবাসিগণ কবির প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠেন। কিন্তু কেহই প্রকাশ্যে কোন কাগজে কবির বিরুদ্ধে কোন আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই ; তবে তাঁহার নিন্দাকারীর দল এই কবিতা পাঠে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ঢাকার জনৈক সাহিত্যিক, যিনি এককালে কবির অনুরক্ত ছিলেন, তিনিও গতানুগতিকের মত কবির নিন্দাকারী হইয়া উঠিলেন।—

একদা তিনি আমাদের নিকট "বিচিত্রপুর" কবিতা প্রসঙ্গে কবির যথেষ্ট দোষকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার অহেতুকী বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করেন। এবং কবি গোবিন্দদাস যে কবি নামের অযোগ্য তাহাও বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। ঢাকার সাহিত্য সম্মিলনে গোবিন্দচন্দ্রের উপেক্ষার ইহা এক অন্যতম কারণ। কবি গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নিন্দাকারিগণ অন্তর্দাহ ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে প্যারেন নাই,—অমরত্ব ত দূরের কথা !!

(৪) সামাজিক কবিতা ঃ—

গোবিন্দদাসের সামাজিক কবিতায়ও ব্যঙ্গের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সমাজের প্রতি তীব্র সমালোচনাই এই জাতীয় কবিতার উদ্দেশ্য। সামাজিক কবিতা তিনি অতি অল্পই লিখিয়াছেন। যাহাও লিখিয়াছেন তাহা সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার মত ক্ষুরধার।

একদিন বাঙ্গালীর ভীরুতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া লিখিলেন,—

"রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠেলে ফে'লে,
নিলে তার মা বোনেরে চুপ করে রয়।
যুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?
দেও তারে শত গালি,
দেও তারে চুণ কালী,
বেহায়ার তাতে কিবা লোক লাজ ভয়।
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?"

আর একবার পতিতা রমণীদের সম্বন্ধে লিখিলেন এবং তাহাদের মুখ দিয়া বলাইলেন ;—

"ঐই যে উপর ছাদে, গোলাপের তোড়া হাতে
ডাকিছে কমলমুখী আঁখি-ইশারায়,—
'আমি রে বিধবা মেয়ে,
দি'ছ মোর মাথা খেয়ে
পাপিষ্ঠ সমাজ তুমি পাপ-ছলনায়!
তুমিই করেছ নষ্ট,
করিয়া ত্রিদিব ভ্রষ্ট,
হা কি লজ্জা, হা কি কষ্ট, সে কি বলা যায়?

তুমি কিন্তু সাধু হ'লে,
আমি দোষী পাপী বলে',
আমি মরি দিবানিশি কলঙ্কে লজ্জায়!
তুমিই নরকে নিলে,
নারকী করিয়া দিলে,
তুমিই আমারে শেষে ছোঁওনা ঘৃণায়!
কুকুর বিড়াল হায়,
সেও ত আশ্রয় পায়
সেও ত তোমার ঘরে এটো কাঁটা খায়!
আহা এই অবলারে,
অত্যাচারে অবিচারে,
কি দুঃখ না দিযে তুমি করেছ বিদায়?' "

জনসাধারণে যাহা দেখিয়াও দেখেন না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না—কবি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন!

১৩১৭-১৮ সনে বঙ্গদেশে বরপণ গ্রহণের প্রথাটা একটু জোরের সহিত চলিতে থাকে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাশ' করা ছেলেদের অভিভাবকগণ পুত্রের বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়া জাগ্রত অবস্থায় টাকার স্বপ্ন দেখিতেন। অপরদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিয়া অনশনে অনিদ্রায় দিন কাটাইতেন,—কেহ কেহ কন্যার মৃত্যু কামনাও করিতেন। অবশ্য এই প্রথাটা ১৩১৭ সনের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশ ঘোষের "বলিদান" সেই করুণ কাহিনী, সজীব ভাবে রঙ্গমঞ্চে দেখাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, কবি গোবিন্দচন্দ্র ১৩১৭ সনে বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে "থাকুক্ আমার বিয়া!" নামক কবিতা রচনা করেন। ১৩১৮ সনের "প্রতিভা" পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতা

প্রকাশিত হওয়ার পর, বঙ্গদেশের বহু অবিবাহিতা কুমারী কেরোসিন তৈলে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে থাকে। এবং ইহা ক্রমে ক্রমে সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য, গোবিন্দদাসের কবিতা এজন্য দায়ী, এমন কথা আমরা বলি না।

১৩২০ সনে স্নেহলতা নাম্নী এক কুমারী এইভাবে আত্মহত্যা করে,—উদ্দেশ্য, কন্যাদায়ের কঠোর যন্ত্রণা হইতে পিতাকে মুক্ত করা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোবিন্দদাসের উক্ত কবিতায় বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে স্নেহলতার মৃত্যুর সামঞ্জস্য ছিল। মনে হয় যেন কবিতাটি স্নেহলতার আত্মহত্যার ইঙ্গিত। ঐ ঘটনায় সমস্ত বঙ্গদেশে বরপণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ফলে, স্নেহলতার চিত্র সর্ব্বত্রই প্রচুর বিক্রয় হইতে থাকে। চিত্রের নিম্নে কবি গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র কবিতা মুদ্রিত ছিল।

"রাজপুতানী মেয়ের মত, কর্ব্ব না হয় জহর ব্রত
তারাও নারী মোরাও নারী,—নারীর হৃদয় দিয়া।
থাকুক আমার বিয়া!"

স্নেহলতার মৃত্যুতে সর্ব্বত্রই তাহার জয়গান হইতে থাকে, এবং এই আত্মবধের দৃষ্টান্ত আদর্শ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়।

কবি গোবিন্দচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া, স্নেহলতার উদ্দেশ্যে গভীর আক্ষেপমূলক একটি কবিতা লিখেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কবিতাই এরূপ ভয়াবহ শোচনীয় ঘটনার কারণ বলিয়া যেন তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দদাসের সূক্ষ্ম বিচারে স্নেহলতা অব্যাহতি পায় নাই। তিনি এই আত্মত্যাগে স্নেহলতার সাধুবাদ না করিয়া তাহাকে ধিক্কারই দিয়াছিলেন। স্নেহলতার প্রতি দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি দেখিয়া এবং প্রশংসাবাদ শুনিয়া ন্যায়পরায়ণ গোবিন্দচন্দ্র

স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি এই প্রণালী অবলম্বনে আত্মহত্যা করা আর নরকের পথ পরিষ্কার করা যে একই কথা, তাহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। দেশের লোকের প্রশংসা তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া লিখিলেন ;—

"কল্লি কিরে হতভাগী কেরোসিনে পুড়ে
নারীর মড়ক লাগাইলি বাঙ্গলা মুলুক জুড়ে !
মনে যদি জেদ্ ছিল তোর কর্ব্বি না তুই বিয়া
কে নিছিল কলাতলায়, গলায় গাম্‌ছা দিয়া ?
আর্য্য নারীর কার্য্য নয় এ আত্মহত্যা করা
ইহকালের পরকালের নিন্দা নরক ভরা !

* * *

এত নয় সে জহর ব্রত, এ যে বিষম পাপ
নিনিমিত্তে আত্মহত্যা বিধির অভিশাপ !
লোকের হিতে, দেশের হিতে সমর্পিলে প্রাণ
সে ত নয়রে আত্মহত্যা সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা স্বর্গ নরক ভেদ,
বুঝলি না তুই বোকা মেয়ে অই যে বড় খেদ !

* * *

হিন্দুর মেয়ে কেউ কি কখন এমন মরণ মরে ?
চিরকুমারী ম্লেচ্ছনারী পরের সেবা করে !
সফ্‌রেগেটী মর্দ্দাবেটী বরং ভাল তারা
এমনতর মর্দ্দানীতে নয় যে আত্মহারা।
তাদের চেয়ে অধম তুইরে তাদের চেয়ে হীন
হতভাগী এমনি করে মাখ্‌লি কেরোসিন ?"

একদা ১২৯২ সনে গোবিন্দচন্দ্র বাল্য বিবাহ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া, বড় দুঃখে—ভগ্ন হৃদয়ে—অশ্রুপূর্ণ নয়নে লিখিয়াছিলেন ;—

"বৃথা দোষি বিধাতায়—দেশের এ দোষ—
সমাজের দোষ এই, নহে বিধাতার,
হেন মূর্খ আছে কে হে যে হয় সন্তোষ
প্রতপ্ত গরল বক্ষে মাখি আপনার ?
নির্ব্যূঢ় অজ্ঞান সেই এ বঙ্গ সমাজ
তাহার(ই) প্রীতির কার্য্য বাল্য পরিণয়,
সেই পূর্ণ নির্ব্বোধের বিষময় কাজ
অচিরে প্রসবে এই ফল বিষময় !
বক্ষে করি এই বিষ নবক অনল
প্রবেশে সংসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী দুর্ব্বল !

*　　*　　*

না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন,
রে পাপিষ্ঠ দুরাচার সমাজ নিষ্ঠুর,
সংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কাননে
প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অসুর !"

ইহা পাঠ করিলে সুকবি ঈশানচন্দ্রের বিরচিত বঙ্গ বিধবাগণের দুঃখে সহানুভূতি পূর্ণ কবিতার কথা মনে জাগে।

দাস-কবি সামাজিক কবিতা বেশী না লিখিয়া থাকিলেও, যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

(৩) দেশভক্তি-সূচক কবিতা।—

গোবিন্দচন্দ্র দেশাত্মবোধের কবি ছিলেন,—তাঁহার দেশভক্তি বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, তাঁহার

কাব্যসমূহকে একটি বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়াছে। স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ার অন্যতম কারণ, প্রবল দেশাত্মবোধ এবং দেশভক্তি। ভাওয়ালের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার পর, যখন তিনি ১২৯১ সনে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রবাসী, তখন জীবনের বিগত বৎসরসমূহের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"পুণ্যযোগ গত বর্ষ আমার জীবনে
আমি ভারতের পুত্র আর্য্য কুলাঙ্গার,
স্বদেশ, স্বজাতিপ্রেম মৃত সঞ্জীবনে,
এতদিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার।
জন্মিয়াছে ব্যথা বোধ জাতীয় পীড়নে,
পক্ষাঘাত বক্ষ আজ হতেছে স্পন্দিত,
আমূল স্নায়ব-যন্ত্র ঘোর বিকম্পনে,
কি এক দৈবীয় বলে হতেছে কম্পিত।
জাতীয় শকতি প্রাণে হয়েছে সঞ্চার,
পুণ্যযোগ গত বর্ষ জীবনে আমার!
যে জাতীয় উদ্দীপনা, জাতীয় সম্মান,
মহান্ জাতীয় সত্ব ভিক্ষা দি'ছ তুমি
ভুলিব না সেই আত্ম অধিকার জ্ঞান,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রিয় জন্মভূমি।
নহে যোগ্য পূর্ণ প্রাণ বিনিময় তার
পুণ্যযোগ গত বর্ষ জীবনে আমার!"

আমাদের দেশে এক জাতীয় দেশভক্ত আছেন, যাঁহারা বক্তৃতায় গগন বিদীর্ণ করিয়া,—নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, দেশভক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাঁরা ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনায়, প্রকাশ্য সভায়

আত্মোৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। যাঁহারা স্বীয় জন্মভূমির প্রতি উদাসীন, তাঁহারা ভারতভূমিব প্রতি কি করিয়া অনুরক্ত হইতে পাবেন? আমরা ইহা বুঝি না।

কবি গোবিন্দচন্দ্র এই জাতীয় দেশভক্ত ছিলেন না। তাঁহার দেশ ভক্তির কবিতা অদ্বিতীয়—অনবদ্য। জন্মভূমির প্রতি আবাল্য অনুরাগ ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার প্রাণে প্রবল দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। কবি তাঁহার যৌবনে, জন্মভূমি বন্দনায় ইহাব আভাষ দিয়া গিয়াছেন।

তিনি কপটাচারী ছিলেন না। প্রাণের কথা তিনি, সবল ভাষায় সর্ব্বত্রই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পুরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা,
নাহি মোর পুত্র কন্যা, ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী!
তথাপি জনমভূমি আছিলে আমার,
ভার্য্যা সমা অতি প্রিয়,
মাতৃসমা অদ্বিতীয়
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃ দেবতার,
স্নেহের পবিত্র মূর্ত্তি কন্যা করুণার।

* * *

প্রাণের গভীর এই ভক্তি, প্রেম, স্নেহ,
সামান্য পল্লীতে বাস,
করিয়াছি বার মাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ,

শত মুখে বাগ্মীবেশে
বলি নাই দেশে দেশে
তোমারে করেছি যত ভক্তি, প্রেম, স্নেহ
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।"

এই পবিত্র স্বভাব-কবির হৃদয়ে কি অপরিমেয় দেশাত্মবোধের বীজ গুপ্তভাবে নিহিত ছিল তাহা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেন নাই। আপনার ক্ষুদ্র পল্লীকে—স্বীয় জন্মভূমিকে যিনি প্রাণের মত এমন করিয়া ভালবাসিতে পারেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে ভক্তি করিতে—ভালবাসিতে কতদূর অধিকারী তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেশভক্ত বলিয়া ঢকা নিনাদ করিতে পারিলে তিনিও এ যুগে একজন 'কেষ্ট বিষ্টু' হইতে পারিতেন ও প্রকাশ্য সভায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া বিজয়মাল্য প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু হায় কবি! সে সৌভাগ্য তোমার অদৃষ্টে ঘটে নাই!

গোবিন্দচন্দ্র নীরব সাধক ছিলেন—নীরবে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধের এই নীতি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া একবার কবি লিখিলেন;—

"পাঁচটী বছর যায়, যদিও দেখি না তায়
যদিও অনেক দূরে আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।"

স্বভাব-কবির এই প্রকার দেশভক্তি দেখিয়া স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য যে একতা

অত্যাবশ্যকীয়, এ কথা দরিদ্র কবি গোবিন্দদাস প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এক অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে বসিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

"এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহাপাপে, জননীর অভিশাপে,
নয়নের অশ্রুজল ঘোচেনা কাহার,
শুধু এই ভ্রাতৃভেদে, দুঃখিনী জননী খেদে
জীবনে পড়িয়ে আছে মৃতের আকার,
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য,
বীর জাতি বীরভূমি রাজপুতানার,
শুধু এ পাপের জন্য দুর্দ্দশা সবার।"

* * *

মাদকতায় আচ্ছন্নবৎ আত্মবিস্মৃত জাতির চৈতন্য সম্পাদনে কবি গোবিন্দদাস আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মৃতকল্প বাঙ্গালীকে উদ্বোধিত করিতে তাঁহার আহ্বান শত ধিক্কারে পরিপূর্ণ—বজ্রকঠোর অথচ, দৈববাণীর মত আশাপ্রদ। গোবিন্দের সে শঙ্খধ্বনি এ জাতির সুপ্ত হৃদয়ে কি পশিবে না ?

একবার রথযাত্রার সময় কবি লিখিলেন,—

"আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর
সহদেব কোথা সে নকুল,

আজিও অজ্ঞাতবাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল ?
কোথা বীব ধনঞ্জয়, বহিয়াছে এ সময়
কেন সে হয় না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর ?”

স্বভাব-কবি বহু দেশভক্তির কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন। কৈশোরে তাঁহার প্রাণে খাঁটি দেশভক্তির অঙ্কুর লুক্কায়িত ছিল। ১২৮৫ সনে তিনি যখন “বীণা”য় কবিতা লিখিতেন তখনও তাঁহার হৃদয়ে অতি-প্রবল, প্রাণোন্মাদকারী দেশাত্মবোধ! সে কি আজিকাব কথা ? “বীণা”য় প্রকাশিত তাঁহার “দুর্গোৎসব”, এবং “নিরন্ন কবি” প্রভৃতি এক জাতীয়। তাঁহার “বসন্ত পূর্ণিমা”, “বাসন্তীপূজা” প্রভৃতি কবিতাও এই পর্য্যায়ের।

“কি করে কঠিন এত হলে শশধর ?
আহা হা ভারতভূমি !
কি করে দেখিয়া তুমি
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর ?”

যে দুঃখে হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—“আর কি সেদিন হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত ?” যে দুঃখে মনো-মোহন, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া লিখিয়াছিলেন—“দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।” ইহাও সেই দুঃখেরই গান। এ রকম কত আছে, কত দেখাইব ? তাঁহার অমৃত তুলা কাব্যগুলি এবং অনেক অপ্রকাশিত রচনা পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি হইবে।

আজ যে জাতীয়তা লইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ প্রমত্ত, প্রায় চল্লিশ বৎসর

পূর্ব্বে তাহা একজন অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীর দরিদ্র কবি-হৃদয়ে কেমন করিয়া জাগিয়াছিল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব অপরিসীম। আবার অনলবর্ষী প্রদীপ্ত ও জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করিয়াও তিনি আশ্চর্য্য ক্ষমতাব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের বন্ধুবর্গ অবশ্যই জানেন যে, তাঁহার প্রাণ অকৃত্রিম দেশভক্তিতে কতদূব অনুপ্রাণিত ছিল।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি "নব্যভারতে" দেশভক্তিমূলক বহু কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "তাড়কার বন", "জন্মাষ্টমী", "স্বাধীনতা", "স্বদেশ" প্রভৃতি কবিতা দেশবাসিগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন।

তাঁহার দেশাত্মবোধ কথার কথা নহে। যিনি স্বীয় জন্মভূমির জন্য সারাজীবনটা যুদ্ধ করিয়া, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গেলেন—তাঁহার দেশাত্মবোধ কত বড় জিনিস তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, একদিনেই হঠাৎ ভারতবর্ষটাকে 'মা' বলিয়া চিনিয়া ফেলার দাবী গোবিন্দদাস করেন নাই। স্বীয় জন্মভূমিকে না চিনিয়া সমগ্র দেশের জন্য বিলাপ করিতে যাওয়া, তিনি ধৃষ্টতা মনে করিতেন। আমাদের মনে হয়, তিনি পাশ্চাত্যদেশে জন্মিলে যেরূপ আদরণীয় হইতেন, তাহা এতদ্দেশে প্রত্যাশা করা যায় না। এ দেশের যে কোন খ্যাতনামা কবি অপেক্ষা দাস-কবির শক্তি ন্যূন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কবি গোবিন্দদাসের দেশভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে। পরিশেষে তাঁহার সুদীর্ঘ "স্বদেশ" কবিতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া অপর বিষয়ের আলোচনা করিব। কবি লিখিয়াছিলেন ;—

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোমার নয়
কার স্বদেশে কাদের খেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর সাড়ী কেড়ে লয়?

নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা, জন্ম অন্ধ কাণা খোঁড়া
ভিস্তিওয়ালা পাখা কুলী—পীলা কাটার ভয়
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয় ?
সোনার বাঙ্গলা সোনার ভূমি, হীরায় ভারত বল্লে তুমি
ভারত তোমার আস্‌বে কোলে এই কি মনে লয় ?
সোনার যাদু মিষ্টিভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নাবাজ, চাহে কাজের পরিচয়
কবির কথায় তুষ্ট নহে ভবি মহাশয় '

*   *   *

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এ দেশ তোদের নয়
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য্য, অসীম স্থৈর্য্য অসীম ধৈর্য্য
কই বা উগ্র সে তপস্যা ইন্দ্রে লাগে ভয় !
কোথায় বা সে শৌর্য্যে বীর্য্যে অসুর পরাজয় ?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চম্‌কে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিপ দেখে তোদের শিবির বলে' ভয় !
প্রতিজনের প্রতি পক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয় ?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু
স্পর্শ থাকুক্ দর্শনে তার শত্রুকুল ক্ষয় !
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্তবীরের মাংস রক্ত
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয় ।
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি, তাইত তারা দৈত্য নাশি'
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয়,
তাদের স্বদেশ ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয় !"

(৬) **নানাবিষয়িণী কবিতা** :—স্বভাব-কবি গোবিন্দ-দাসের বিবিধ কবিতার মধ্যে বাঙ্গালী রমণীর চিত্র, বাঙ্গালীর পল্লী-

জীবনের নিখুঁত ছবি, তাঁহার হাতে অত্যন্ত খাঁটিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নৈসর্গিক দৃশ্যেও কবি গোবিন্দদাস আত্মহারা,—তিনি যেন সৌন্দর্য্যের আত্মবিস্মৃত উপাসক। একটি "ঝিঙ্গাফুল", দুইটি "গোদাজামের গাছ"; আসন্ন সন্ধ্যা; নির্জ্জন নদীতীর, 'সন্ধ্যায় শূন্যমাঠ'; নদীতটের শ্মশান; ভাওয়ালের গজারী বন, * ক্ষুদ্রতোয়া চিলাই নদী; পদ্মার বিশাল দৃশ্য হেরিয়া কবির প্রাণের ভিতর যে সুর বাজে তাহাতে কৃত্রিমতা নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন। তিনি সম্পদে বিপদে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেন।

তিনি কাহারও অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার স্বকীয় বিশেষত্ব ছিল। একমাত্র কবিবর নবীনসেনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভাব অপহরণ করেন নাই। তাঁহার দুই একটিমাত্র কবিতার কথা আমরা জানি যাহাতে নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের ছন্দ এবং ঝঙ্কার স্মরণ করাইয়া দেয়। তন্মধ্যে, একটি কবিতা "দুর্গোৎসব" নামে ১২৮৬ সনের "বীণা"য় মুদ্রিত হয়।

একটু উদাহরণ আবশ্যক :—

"ভারতে শারদ-শুক্লা ষষ্ঠি-নিশি শেষ,
ধীরে ধীরে তারাগুলি লুকাইলে সব,
দম্পতী নয়নে আছে ঘুমের আবেশ,
ডাকেনি এখনো পাখী প্রকৃতি নীরব!
কেন আজি শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর মহারোলে
কাঁপাইয়া ভারতের প্রদোষ অম্বর

---

* পূর্ব্ববঙ্গে শালবৃক্ষ, গজারী নামে অভিহিত।

মুহূর্ত্তে,—প্রকৃতি সুপ্ত—ভীম গণ্ডগোলে
জাগাইল ? কি আনন্দে প্রমত্ত অন্তর ?
কি আনন্দ সঞ্চারিল বাঙ্গালীর ঘরে
হৃদয়ে উন্মাদ রক্ত আছাড়িয়া পড়ে !"

বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের রবীন্দ্রীয় স্রোতের মুখে অনেক কবিই ভাসমান, কেবল গোবিন্দদাস, অক্ষয়কুমার এবং দেবেন্দ্র সেন স্বাধীন-ভাবে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে আবার কবি গোবিন্দচন্দ্রেই সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়, কারণ ইংরেজি ভাষার দ্বারা তিনি একেবারেই প্রভাবান্বিত নহেন।

তিনি আজিকার কবি নহেন। রবীন্দ্রনাথ যখন "কবি কাহিনী" লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, গোবিন্দচন্দ্রের দেশাত্ম-বোধের ও প্রেমের কবিতাগুলি তখন তৎকালীন সাময়িকের অঙ্ক সুশোভিত করিয়া সাহিত্যিকদের কাছে সমাদৃত। সে সকল রচনা, অর্থাভাবে তখন বিস্তৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন, স্কট্‌লণ্ডের কবি বার্ণসের (Robert Burns) সহিত কবি গোবিন্দচন্দ্রের সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমরা একথা খুব সত্য বলিয়া মনে করি। বাস্তবিকই বার্ণস্ ও গোবিন্দচন্দ্র দুইজনেই প্রেমের কবি—দুইজনেই গ্রাম্যকবি। বার্ণস্ কৃষক-কবি নামে অভিহিত —আর গোবিন্দদাস ময়মনসিংহে সারস্বত কবি। ইহাঁদের গীতি-কবিতা-বলীর মধুর ভাষা এবং গভীর অথচ সরলভাব দেখিয়া মনে হয় যেন ইহাঁরা স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কবি হওয়াই যেন ইহাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

মনে হয়, প্রতীচ্যের পরলোকগত বার্ণস্ যেন প্রাচ্যের এই গোবিন্দ-দাসে প্রকটিত। কবিতার ভাবে—মাধুর্য্যে—সরলতায়—ঝঙ্কারে দুই

জনেই এক পর্য্যায়ের। দুইজনেই অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীন বন বিহঙ্গের মত, সুস্বর-লহরীতে এককালে সমগ্র দেশকে মাতাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বার্ণস্ প্রতীচ্যে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের নিকট তাহা সুদূরপরাহত! আশ্চর্য্য।

কবি গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। "বর্ত্তমান জগৎ" প্রণেতা মনস্বী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় উক্ত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"আমাদের আধুনিক কবিগণের মধ্যে বিক্রমপুরের গোবিন্দদাসকে পণ্ডিতপ্রবর অতি উচ্চস্থান দিলেন। ইঁহার মতে গোবিন্দদাস শক্তিমান কবি,-জনসাধারণের হৃদয়ে আশা ধ্বনিয়া তুলিতে পারেন,—জ্বলন্ত ভাষায় মনের আবেগ বুঝাইতে পারেন। স্থানে স্থানে গোবিন্দদাস কিছু অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক আজ কালকার অন্যান্য কবি প্রায়ই হৃদয়হীন, আবেগহীন, শক্তিহীন।"

বাস্তবিক, যে কাব্য পাঠে মনের অনুভূতি জাগিয়া উঠে—হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত কাব্য। আমাদের ইহাই বিশ্বাস। আবার যে কাব্যে অধ্যয়ন-সুখ নাই, কি পড়িলাম চিন্তা করিয়াও অননুভূত,—যাহাতে মানব হৃদয়ের সুপ্ত বেদনা, সুপ্ত আশা, বিস্মৃত বাসনা ও অতীতের চিন্তাধারা ছায়া-চিত্রের মত মানসপটে ফুটিয়া না উঠে, তাহাকে কাব্য বলিব কেমন করিয়া?

সুকাব্য পাঠে দগ্ধ-হৃদয় শান্ত হয়। সুষ্ঠু কাব্য, হৃদয়-সাহারায় নন্দনের অমৃত-বর্ষণ।

স্থূল কথা, মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চবৃত্তি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, দেশপ্রাণতা প্রভৃতি ভাব সম্বলিত কবিতাবলী, প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ ও জন-সমাজেও আদরণীয়।

Tennysonএর "In Memoriam", ঈশানচন্দ্রের "যোগেশ", বড়াল-কবির "এষা", রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরী", "গীতাঞ্জলী" গোবিন্দচন্দ্রের "প্রেম ও ফুল" পাঠে মনুষ্য সমাজ বিমুগ্ধ হয়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলী" আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বলিয়া কাব্য-সাহিত্যে বরেণ্য। তবে আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে অনেক সময় উত্তর-সাধকের দল, কবির কাব্যের অর্থকে সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া থাকেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার এই প্রকার বিকৃত অর্থ করিয়া অন্ধ ভক্তেরা, তাঁহার নিন্দাকারীর দল বাড়াইয়া দিয়াছেন।

দরিদ্র গোবিন্দদাসের জন্য বঙ্গদেশে কোন উত্তর-সাধকের দল ছিল না, অথবা তাঁহাকে জন সমাজে তুলিয়া ধরিবার জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। অথচ এই অবস্থায় তিনি স্বীয় কৃতিত্বে যতটুকু পরিচিত, অন্যান্য অনেক সুবিখ্যাত কবিগণের পশ্চাদ্দেশে অন্ধ ভক্ত বা স্তাবকের দল না থাকিলে তাঁহাদের ভাগ্যে ততটুকু সম্মান বোধ হয় জুটিত না।

১৯২০ সনের নভেম্বর মাসের একদা প্রভাতে সৌভাগ্যবশতঃ পরলোকগত সুকবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল। গোবিন্দ-প্রসঙ্গে তিনি বড়ই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখুন! গোবিন্দদাসের প্রতিভা যত বড়ই হউক না কেন, তাঁহার ভাগ্যে উপযুক্ত সম্মান লাভের কোনই আশা নাই, কারণ তাঁহাকে তুলিয়া ধরিবার কেহ নাই। আপনারা যদি তাঁহার নামে ঢাক বাজাইতে পারেন, তবে কিছু আশা করা যায়।"

এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগে, অক্ষয়কুমারের উল্লিখিত কথা আমরা চাণক্য-নীতির মত মানিয়া লইয়াছি!

কবি গোবিন্দদাস অপরিজ্ঞাত কবি, একথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত

অন্যায় হইবে না। বঙ্গদেশের নানাস্থানে কবি গোবিন্দচন্দ্রের বহু ভক্ত এবং বন্ধুও আছেন, তথাপি তিনি অপরিজ্ঞাত। তিনি জীবিতকালে আশানুরূপ সমাদর লাভ করিয়াছেন কেমন করিয়া বলিব? তাঁহার কাব্যগ্রন্থও বিক্রয় হয়; কিন্তু তাহা কি আশানুরূপ? আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না।

তাঁহার গুণমুগ্ধ বহু বন্ধু, বহু ভক্ত আছেন, একথা সত্য। অনেক পল্লী রমণীও তাঁহার কবিতার পক্ষপাতিনী। আমরা উত্তর বঙ্গে অবস্থানকালে তথাকার পল্লীগ্রামেও গোবিন্দচন্দ্রেব ভক্ত দেখিয়াছি। আবার প্রাচ্য ভূখণ্ডে—সুদূর ব্রহ্মদেশেও বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার গুণমুগ্ধ বহুব্যক্তির সঙ্গে আমাদের আলাপ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণিত হয় যে, তিনি বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট সমভাবে পরিচিত ছিলেন?

তাঁহার মত একজন স্বভাব-কবির পক্ষে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হওয়াটা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। তবে তিনি অর্থাভাবে কষ্ট পাইয়া গেলেন কেন? জীবিতকালে তাঁহার একটা সম্বর্দ্ধনা হইল না কেন? তবে তিনি "আমার চিতায় দিবে মঠ" কবিতা লিখিলেন কেন?

তিনি অপরিজ্ঞাতই ছিলেন, এবং তাহার প্রচুর কারণও আছে। কবি বিহারীলাল এবং ঈশানচন্দ্র যে সময়ের লোক তখন তাঁহাদিগকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিত, এমন পাঠক তৎকালে অতি অল্পই ছিল। কিন্তু এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্যে সে কথাটা খাটে কি?

ঢাকা হইতে প্রকাশিত,—অধুনা লুপ্ত "ধূমকেতু" পত্রিকায় একজন অজ্ঞাত লেখক লিখিয়াছিলেন,—

"বিরহ বিধুর মধুর কবি
এনেছেন "চন্দন", "কস্তুরী"

কাঙ্গাল কবি তাই বুঝি গো
নাম পা'ন নাই যুগান্তরী।"

আমাদের বিশ্বাস, দারিদ্র্য এবং যশোলিপ্সায় বৈরাগ্যই কবির উপেক্ষিত হইবার প্রধান কারণ! আরও একটা কারণ আছে। তিনি অত্যন্ত উচিতবক্তা, এবং কঠোরভাষী লোক ছিলেন। যেমন লোকই হউন না কেন, তিনি কাহারও দোষ দেখিলে বলিতে ত্রুটী করিতেন না। যাহাদের দ্বারা তাঁহার নাম দেশে সমধিক প্রচারিত হইতে পারিত,—অর্থাৎ তাঁহার জন্য ঢাক বাজাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না এমন সকল লোককে তিনি স্বপক্ষে আনিতে পারেন নাই। তিনি চাটুকাবিতা জানিতেন না এবং তাহা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সর্ব্বোপরি, তিনি একজন নীরব সাহিত্য-সেবক ছিলেন। তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির অঙ্গ-সৌষ্টবের দিকে কখনই দৃক্‌পাত করেন নাই, এমন কি তাহাদের সমধিক প্রচারের জন্য নানা কাগজে কোনদিনই বিজ্ঞাপন দিতে পছন্দ করিতেন না। একমাত্র তাঁহার "প্রেম ও ফুল" গীতিকাব্য ভিন্ন অন্য কাব্য কয়খানি কোন কাগজে সমালোচনার্থ পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি কোন সভা সমিতিতে যোগদান করিতেও ভালবাসিতেন না। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ নগরে "বঙ্গীয় শাখা সাহিত্য পরিষদের" একটি সভায় তিনি সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন, "সৌরভ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি সেই সভায় যোগদান করেন। আমরাও তখন কবির সঙ্গে সেই সভাগৃহে উপস্থিত ছিলাম। শ্রীযুক্ত কামিনী-কুমার সেন মহাশয়ের গৃহে অদ্যাপি সেই সভার ফটোচিত্র বর্ত্তমান আছে। তিনি অনিচ্ছায় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং অতি অল্প

কথায় তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন। সেখানে তিনি কোন অভিভাষণ পাঠ করেন নাই। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না—তাঁহার জীবনে তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। উক্ত সভা ভঙ্গের পর তিনি, আমাদের নিকট একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, জোর করিয়া তাঁহাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া দেওয়া অনুষ্ঠাতাদিগের পক্ষে নিতান্তই অন্যায়। স্থূলকথা, আত্মপ্রকাশ করিতে—নিজের গুণ-কাহিনী নিজ মুখে ব্যক্ত করিতে—কৃত্রিমতার সাহায্যে স্বীয় প্রকৃত মূর্ত্তি, খুব বড় করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে, তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। এ সকল নানা কারণেই কবি গোবিন্দদাস অপরিজ্ঞাত।

১৩১৮ সনের আষাঢ় সংখ্যা "নব্যভারত" কবির উপেক্ষার নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন ;

"পশ্চিমবঙ্গ কি, পূর্ব্ববঙ্গকে বাদ দিয়া সাহিত্যের গৌরব করিতে পারেন? মাইকেল, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার, কালীপ্রসন্ন, দুই দীনেশ, দুই রজনীকান্ত, গৌরগোবিন্দ, গোবিন্দচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, গিরিজাপ্রসন্ন, শশধর, কাঙ্গাল হরিনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, দেবকুমার, প্রমথ, শশাঙ্কমোহন, কামিনী ও মানকুমারী, কৈলাশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভৃতিকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বাদ দেওয়া চলে কি? * * * কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন সহ্য হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল দলাদলিতে পড়িয়া উপেক্ষিত, গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতি দরিদ্র বলিয়া হতমান।" *

---

* "নব্যভারত" সম্পাদক পরলোকগত শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় এই প্রবন্ধ রচনা করেন, কাজেই তাঁহার নাম ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। কালীপ্রসন্নের পর তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে একজন বিশিষ্ট সুলেখক ছিলেন। তাঁহার দেশভক্তিও অপরিমেয় ছিল।

আর একবার ১৩২৪ সনের বৈশাখ সংখ্যা ,"নব্যভারত" লিখিলেন ;—

"সাহিত্যসেবিগণ কোন্ দেশে না জীবিতকালে উপেক্ষিত হইয়াছেন ? মাইকেল, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি দুঃখ দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হইতেছেন, ভাবিলে দারুণ কষ্ট হয়।"

আবার ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "নব্যভারত" লিখিয়াছিলেন ;—

"যাঁহাদের হাতে তিনি অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশের পূজ্য, কিন্তু নির্য্যিত গোবিন্দচন্দ্র উপেক্ষিত, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই।"

কবি গোবিন্দচন্দ্রের উপেক্ষিত এবং অপরিজ্ঞাত হইবার ইহাই কারণ। আমাদেরও সেই একই কথা – যাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলিতেছি ! তন্মধ্যে যশোলিপ্সায় বৈরাগ্যই সর্ব্বপ্রধান।

উপসংহার।

—:•:—

যাহা যায় তাহা আর হয় না। এই মরজগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে—মনুষ্যের জীবনও ক্ষণস্থায়ী। জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধানে অনিত্য জীবন লইয়া পৃথিবীতে যাঁহারা জীবন-স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারাই বরণীয়—বন্দনীয়। যাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি দেহান্তেও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় না, তাঁহারা মৃত হইয়াও অমর। স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস আজ পরলোকে, কিন্তু, তাঁহার স্মৃতির সৌরভে বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ আমোদিত। গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অমর—তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনীও অমর।

বঙ্গভাষার অকৃত্রিম—একনিষ্ঠ সেবক কবি গোবিন্দদাসের তিরোধানে বঙ্গ-সাহিত্য-কাননের একটি কলকণ্ঠ কোকিলের সুমধুর রব চিরতরে নীরব হইয়াছে।

তিনি বাঙ্গালীর খাঁটি কবি ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় প্রভাবান্বিত না হওয়ার বিশেষত্ব, একমাত্র কবি গোবিন্দদাস ভিন্ন আর কাহারও আছে কি না জানি না। বাঙ্গালীর মনের কথা—হৃদয়ের ব্যথা—সুখ দুঃখের কাহিনী—পল্লীজীবনের আলেখ্য—জাতীয় উদ্দীপনা ও স্বদেশ-প্রেম অবলম্বনে তাঁহার সুমধুর গীতি-কবিতা বিরচিত।

গোবিন্দদাস কাল্পনিক অবাস্তব ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন্ জীবনের ঘটনা লইয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার প্রতিভা অসামান্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পর্ক-শূন্য এবং বৈদেশিক ভাষা ও ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত; কবি গোবিন্দদাসের রচনা পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

বঙ্গসাহিত্যাকাশে কত কত উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজী ক্ষণতরে উদিত হইয়া মধুর জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া—কালে ও অকালে অস্তমিত হইয়াছেন! তাঁহাদেব অভাব আব দূরীভূত হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, যাহা যায় তাহা আর হয় না।

কবি গোবিন্দদাস ভাগ্যদেবতার কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত ছিলেন। বড়ই পবিতাপের কথা, তাঁহার মত একজন বরেণ্য কবি দারিদ্র্যেব দারুণ আতপ তাপে আমবণ ক্লিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অথচ, দুঃখ ও দৈন্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াও, সাধকের ন্যায় তিনি তাঁহার চির আরাধ্যা বাগ্দেবীর আরাধনা পরিত্যাগ করেন নাই। ইহা তাঁহার জীবনের বৈচিত্র্য।

তিনি এমনই ভাগ্যহীন ছিলেন যে, অনেক সময় অকাবণে উপেক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহাব কাব্যপিপাসুগণের নিকট হইতেও তিনি সমধিক সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই।

দুরদৃষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া, দুইখানি পত্রে, বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১)

"জয়দেবপুর—ঢাকা,
১৫ই ভাদ্র ১৩২৪।

প্রিয়—

* * * সম্পাদক * * বাবুকে আমার আত্মীয় বলিয়াই জানি, তবে আমার অদৃষ্ট গতিকে কবিতা দিতে না পারায় অনেকে আমার

উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। আমার যে অবসর নাই, পেটের চিন্তায় যে আমি ব্যস্ত, তাহার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। তাহার প্রতিবিধানে কেহ যত্নবান নহেন, কিন্তু কবিতা দেই না, তাহাই আমার অপরাধ। গাইটা কি খায়, সেদিকে কেহ চাহিবে না, কিন্তু কামধেনুর মত যে সর্ব্বদা দুধ দেয় না, এটা উহার নিতান্ত বজ্জাতি! এ দোষ উহার কেহ মাপ করিবে না। * * * বাবুর সহিত কি আলাপ হইয়াছিল? * * *

আপনার

গোবিন্দ।"

(২)

"ঢাকা,

২৯শে ভাদ্র ১৩২৪।

* * * বাবু 'বিচিত্রপুর' কবিতার জন্য আমার উপর বিরক্ত বটে, কিন্তু আসল বিরক্ত কবিতার জন্যই। কিন্তু তাহা ত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না! কেদার মজুমদারের "সৌরভে" যে মাঝে মাঝে দুই একটি কবিতা দেই, * * * দেই না, এই জন্যই তিনি প্রকৃত বিরক্ত। * * * বাবু আমাকে আটকাইয়া কবিতা আদায় করেন। আমি তাঁহার নিকট নানা কাজে ঠেকিয়া যাই। * * * কি করি।

'সুবর্ণের পরীক্ষক অনল যেমন,
বান্ধবের পরীক্ষক বিপদ তেমন।'

দেবীবাবু পর্য্যন্ত কবিতার জন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সত্যেন্দ্র ভদ্রও ঐ জন্য অসন্তুষ্ট। আমার দুর্ভাগ্য!"

মাতৃভাষার সেবায় তিনি নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কখনও প্রেমিক—কখনও সন্ন্যাসী—কখনও বা ত্যাগী স্বদেশভক্তরূপে গোবিন্দ

চন্দ্র অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বাঙ্গালীর কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। দেশাত্ম-বোধ এবং জাতীয় ভাব উদ্বোধক কবিতা রচনায় তিনি আশ্চর্য্য যোগ্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন। পরাধীনতায় ও পরপীড়নে জীবন্মৃত হইয়াও, একতাহীন, উৎসাহহীন জাতিকে, তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল আশার বাণী শুনাইয়াছেন। অবশেষে জীবন-সায়াহ্নে দেশহিতব্রতের গান গাহিয়া অনাদৃত উপেক্ষিত ভাবে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গের দুইজন স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী, তাঁহাকে বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে—নিরালম্ব অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, পিতৃহীন অবস্থায় ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী কৃপা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। আবার, জীবনের অপরাহ্নে, অবলম্বহীন অবস্থায় মুক্তাগাছার মহারাজ জগৎকিশোর করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুইজন নরদেবতার কৃপা না হইলে বঙ্গসাহিত্যে গোবিন্দদাসের নাম কীর্ত্তিত হইত কি না কে বলিবে? ইঁহারা পুণ্যশ্লোক—বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় এবং সমগ্র বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই।

কবি গোবিন্দদাসের তুলনা গোবিন্দদাস স্বয়ং। সেকালের বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাস যেন একালের স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসে পুনরাগত। তাঁহার কবিত্ব ঝঙ্কারে, সময় সময় ভারতচন্দ্রের কথাও মনে জাগিয়া উঠে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র গিয়াছেন। তাঁহার শোক-তাপ-দগ্ধ জীবন-যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। অভাবের সর্ব্বগ্রাসী তাড়নায় হস্ত হইতে কবি এতদিন পর নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

জীবন-প্রভাতে—১২৮৬ সনে লাঞ্ছিত কবি লিখিয়াছিলেন—

"সবাই আমারে করে নাথ ঘৃণা
অনেক সয়েছি, আর ত পারি না
দেও হে আশ্রয়, প্রাণেশ আমার—"

তাঁহার সেই সকাতর প্রার্থনা সুদীর্ঘকাল পর জগদীশ্বর পূর্ণ করিয়াছেন।

প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে সুকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় কবি গোবিন্দদাসের জীবদ্দশায় লিখিয়াছিলেন,—

'সুজনের পরপারে যাইব সকলে যবে
দেবগীতি হয়ো তুমি ভাই,
জনমে জনমে যেন সুরগে মরতে আসি
কবিবর, তব দেখা পাই।"

যাও কবি, পৃথিবীর বিষাক্ত বাতাস যেখানে প্রবাহিত হয় না—যেখানে দ্বেষ-হিংসা-কপটতা নাই—সেই দিব্যধামে যাইয়া চিরশান্তি লাভ কর। জানি না—

কোন্ দেবতার শাপে—কি বলিব তায়।
জনম লভিয়া তুমি এ পাপ ধরায়,
সহিয়াছ অত্যাচার অশেষ লাঞ্ছনা,
মৃত্যুসম নির্ব্বাসন,—কঠোর গঞ্জনা।
পর্ব্বতের মত রহি' নিষ্কম্প অটল
আজীবন ছিলে মগ্ন সত্যে অবিচল।
স্বদেশ, স্বজাতিস্বত্ব, স্বাধীনতা তরে
উৎসৃষ্ট করিয়াছিলে প্রাণ অকাতরে।
প্রেমে পিণাকীর মত ছিলে মূর্ত্তিমান,
অবিচল প্রতিজ্ঞায় ভীষ্মের সমান।

উপসংহার।

অনশনে, অর্দ্ধাশনে—বাণীর সেবায়
ছিল মূর্ত্তি তপঃক্লিষ্ট মহাযোগী প্রায়।
অবিরাম দুঃখ ক্লেশ সহিয়া জীবনে
সাজাইলে বঙ্গভাষা বিবিধ রতনে।
গোবিন্দ! তোমার নাহি পাই সমতুল
তুমি বুঝি নন্দনের পারিজাত ফুল!

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের অন্তর্দ্ধানের পর, তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত কয়েকটি ছত্র আমাদের মনে জাগিতেছে।

"সত্যই কবি কি মরে? বোঝে না অবোধ নরে
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।"

সমাপ্ত।*

---

*আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথায়—অবসন্ন হৃদয়ে এই গ্রন্থের 'প্রুফ' সংশোধিত হইয়াছিল, এজন্য স্থানে স্থানে হয় ত বর্ণাশুদ্ধিও রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।—গ্রন্থকার।